কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫
রকিব হাসান
সেবা

ভীতু সিংহ

প্রথম প্রকাশঃ মে, ১৯৮৯

'এঞ্জিনের শব্দে মুখ ফিরিয়ে চেয়েই গুঙিয়ে উঠলো কিশোর পাশা। 'সর্বনাশ! ট্রাক বোঝাই করে এনেছে চাচা!'

তার দুই বন্ধু মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ডও ফিরে তাকালো। বিশাল লোহার গেট দিয়ে ঢুকছে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ছোট লরিটা। ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, বোরিস চেকোমাসকি গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে বসে আছেন ছোটখাটো একজন মানুষ, ইয়া বড় পাকানো গোঁফ, দাঁতে চেপে রেখেছেন পাইপ। তিনি কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা।

লরি থামলো। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামলেন রাশেদ পাশা।

কিশোর আর তার বন্ধুরা দেখলো, পুরনো মরচে ধরা মোটা লোহার শিকে বোঝাই লরির পিছনটা।

কাঁচে ঘেরা ছোট অফিস ঘরের বাইরে গার্ডেন চেয়ারে বসে ছিলেন মেরিচাচী, উঠে এলেন। 'রাশেদ!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? এগুলো কেন এনেছো?'

'নো, মাই ডিয়ার,' হাসিমুখে বললেন রাশেদ পাশা, 'যা বুঝেছো, তা না। তলায় খাঁচাও আছে কয়েকটা।'

'খাঁচা!' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'আমাদের সবাইকে ধরে ভরবে নাকি ওগুলোতে?'

'আরে না,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন রাশেদ পাশা। 'ওগুলো জানোয়ারের খাঁচা। কিশোর, দেখতো ভালো করে। বিক্রি হবে?'

উঁকি দিয়ে যতোটা সম্ভব দেখলো কিশোর। ধীরে ধীরে বললো, 'মেরামত লাগবে। তবে, বিক্রি হবে…পড়ে থাকবে না। কিন্তু কার কাছে বেচবো?'

'কার কাছে মানে? ওদের কাছে।'

'কাদের কাছে?'

'সার্কাস। প্রতি বছরই তো আসে। তখন দেবো ওদের কাছে বিক্রি করে।'

'কিনবে?' কিশোরের কণ্ঠে সন্দেহ।

'কেন কিনবে না? এরকম খাঁচাই তো ওদের দরকার। তুই ভুলে যাচ্ছিস, কিশোর, সার্কাসের দলে ছিলাম আমি একসময়। ওদের কি কি লাগে, ভালো করেই জানি।'

মুচকি হাসলো কিশোর। 'হ্যাঁ, চাচা।' ছেলেবেলায় একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে সার্কাসের দলে চলে গিয়েছিলেন তিনি, সুযোগ পেলেই গর্বের সংগে বললেন সেকথা।

মেরিচাচীর মুখ থমথমে। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন চাচা, 'বোরিস, রোভার, দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি নামাও।'

লরি থেকে মাল নামাতে শুরু করলো দুই ভাই।

পাইপ নিভে গেছে। দিয়াশলাইয়ের জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন রাশেদ পাশা। 'বুঝলেন মেরি, ধরতে গেলে বিনে পয়সায়ই পেয়েছি ওগুলো, পানির দাম। কতগুলো ভাঙা গাড়ির কাছে পড়েছিলো। দেখি, আবার যাবো। আরও আছে, নিয়ে আসবো।' নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি।

'কিশোর,' নিচু কণ্ঠে বললেন মেরিচাচী, 'তোর কি মনে হয়? বিক্রি হবে?'

'তা হবে। তবে একটু সময় লাগবে আরকি। লাগুক। কম দামে যখন পেয়েছে, না আনাটাই বরং ভুল হতো। ভেবো না, ভালো লাভ হবে।'

কিশোরের ওপর মেরিচাচীর অগাধ বিশ্বাস। সে যখন বলছে, হবে, নিশ্চয় হবে। মেঘ কেটে গেল তাঁর মুখ থেকে। বোরিস আর রোভারকে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ দিয়ে অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

দুই ভাইয়ের সঙ্গে তিন গোয়েন্দাও হাত লাগালো। ওগুলো নিয়ে জমা করে রাখতে লাগলো একটা ছাউনির নিচে।

লরির ওপর থেকে ছোট একটা শিক কিশোরের হাতে দিতে দিতে বললো মুসা, 'এটাই শেষ।'

শিকটা হাতে নিয়ে দ্বিধা করলো কিশোর। ওজন আন্দাজ করছে। 'এরকম একটা কিছুই খুঁজছিলাম।'

'কেন?' অবাক হলো রবিন। 'তিন গোয়েন্দার নিজস্ব জাংকইয়ার্ড করবে?'

'দরজার লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। মোবাইল হোমের দরজা খুলে দেবো। দুই সুড়ঙ্গের পাইপের ভেতর দিয়ে যাওয়া অনেক কষ্ট, সব সময় ভাল্লাগে না।'

মুসা খুশি হলো সব চেয়ে বেশি। তার স্বাস্থ্য অন্য দু'জনের চেয়ে ভালো, বেশি লম্বা-চওড়া, পাইপের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে তারই বেশি অসুবিধে হয়। লাফ দিয়ে নেমে এলো সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছলো। 'উফ, মেলা কাম করেছি। ঘাম ছুটে গেছে।'

'তো, এখন...,' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে, পুরনো ছাপার মেশিনটার ওপরে লাল আলোটা জ্বলতে–নিভতে শুরু করেছে।

'ফোন!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'নিশ্চয় কেউ রহস্যের সমাধান করাতে চায়।'

'তাহলে তো ভালোই,' উত্তেজিত হয়ে উঠলো কিশোর। 'অনেক দিন কোনো রহস্য পাচ্ছি না।'

তাড়াতাড়ি এসে দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালো কিশোর। স্পীকারের লাইন অন করে দিলো। একসংগে এখন তিনজন শুনতে পাবে ওপাশের কথা।

'কিশোর পাশা বলছি।'

'ধরে রাখো, প্লীজ,' মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল স্পীকারে। চিনতে পারলো ওরা, কেরি ওয়াইল্ডার ওরফে মুরুব্বী কেরি ("তিন গোয়েন্দা" দ্রষ্টব্য)। 'মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা বলবেন।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তিন কিশোরের চেহারা। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার, তার মানে আরেকটা রোমাঞ্চকর রহস্য।

'হ্যালো,' গমগম করে উঠলো একটা ভারি কণ্ঠ, 'কিশোর।'

'বলুন, স্যার।'

'ব্যস্ত?'

'না, স্যার। কোনো কাজ নেই হাতে।'

'ভেরি গুড। আমার এক বন্ধু একটা সমস্যায় পড়েছে। আমার কাছে এসেছিলো।'

'কি সমস্যা, স্যার? বলা যায়?'

'নিশ্চয়ই। কাল সকালে আমার অফিসে আসতে পারবে?'

'পারবো।'

'বেশ। তখনই বলবো সব।'

দুই

ইশারায় তিন গোয়েন্দাকে বসতে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

বিশাল ডেস্কের এধারে বসলো ছেলেরা।

সামনে টেবিলে রাখা ফাইলের গাদা ঠেলে একপাশে সরালেন চিত্রপরিচালক। মুখ তুলে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালেন ছেলেদের দিকে। তারপর হঠাৎ যেন ছুঁড়ে দিলেম প্রশ্নটা, 'বুনো জানোয়ার কেমন লাগে তোমাদের?'

অবাক হলো ছেলেরা।

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো কিশোর, 'সেটা কোন ধরনের জানোয়ার তার ওপর নির্ভর করে, স্যার।'

'এমনিতে তো ভালোই লাগে,' মুসা বললো। 'তবে মানুষখেকো বাঘ-সিংহ হলে আলাদা কথা।'

'কোনো রহস্যের কথা বলছেন, স্যার?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'হয়তো,' ধীরে ধীরে বললেন পরিচালক। 'না-ও হতে পারে। তবে তদন্ত বোধহয় একটা করা দরকার।' এক মুহূর্ত থেমে বললেন, 'জাঙ্গল ল্যাণ্ডের নাম শুনেছো?'

'শ্যাটউইকের কাছে একটা উপত্যকায়,' রবিন বললো। 'বুনো জানোয়ারের খামার। ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানাও বলা যেতে পারে। নানারকম জন্তুজানোয়ার আছে। সিংহও আছে। ভালো টুরিস্ট স্পট।'

'হ্যাঁ,' বললেন পরিচালক। 'মালিকের নাম উইলবার কলিনস। আমার পুরনো বন্ধু। একটা বিপদে পড়েছে। সেজন্যেই তোমাদের ডেকেছি।'

'কি বিপদ, স্যার?' জানতে চাইলো কিশোর।

'ভীতু সিংহ।'

চট করে একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।

'জাঙ্গল ল্যাণ্ড সবার জন্যেই খোলা,' আবার বললেন পরিচালক। 'সাধারণ দর্শক তো আছেই, মাঝে মাঝে সিনেমা কোম্পানিও ভাড়া নেয় জায়গাটা। উপত্যকা আছে, ঘন জঙ্গল আছে—ওয়েস্টার্ন আর আফ্রিকান পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। মাঝে মাঝে জানোয়ারও ভাড়া দেয় উইলবার। তার নিজের ট্রেনিং দেয়া। তার প্রিয় জানোয়ার-গুলোর মধ্যে একটা সিংহ আছে। টিভি আর সিনেমায় অনেক অভিনয় করানো হয়েছে ওটাকে দিয়ে। উইলবারের একটা বড় অ্যাসেট ছিলো।'

'তারমানে এখন আর নেই?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

'অনেকটা সেরকমই। ইদানীং একটা সিনেমা কোম্পানি জাঙ্গল ল্যাণ্ড ভাড়া নিয়েছে শূটিং করার জন্যে। ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সিংহটা। অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে। যে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই অবস্থায় শান্তিতে শূটিং চালানো সম্ভব নয়। তার জায়গার বদনাম হোক, এটাও চায় না উইলবার।'

'সিংহটা কেন এরকম করছে, মানে, ভীত হয়েছে,' কিশোর বললো, 'তা-ই তদন্ত করে দেখতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। খুব দ্রুত আর চুপচাপ কাজটা সারতে হবে। বাইরের কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে।'

শুকনো ঠোঁট চাটলো মুসা। 'জানোয়ারটার কত কাছে যেতে হবে, স্যার?'

মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'তদন্ত করতে হলে যতোখানি যেতে হয়। তবে এতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উইলবার তোমাদের সাহায্য করবে।'

'কিন্তু, স্যার, যতোটা জানি, যে কোনো নার্ভাস জানোয়ার বিপজ্জনক···মানে, খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে···,' বললো রবিন।

'ঠিকই জানো।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'তাহলে আপনার বন্ধুকে বলে দিতে পারেন, স্যার, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আরও তিনটে ভীতু প্রাণী শিগ্রী যোগ হতে যাচ্ছে।'

গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে ফিরলেন পরিচালক। 'কিশোর, তোমার কিছু বলার আছে? তোমরা যাচ্ছো, একথা বলবো উইলবারকে?'

'বলুন।'

হেসে রিসিভার তুলে নিলেন পরিচালক। 'বলে দিচ্ছি। খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট আশা করছি তোমাদের কাছ থেকে, সুখবর। গুডবাই অ্যাণ্ড গুডলাক।'

বিদায় নিয়ে মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

তিন

শেষ দুপুর। সরু একটা পাহাড়ী পথ ধরে নামছে তিন গোয়েন্দা। নিচের উপত্যকাটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের সারি। রকি বীচ থেকে গাড়িতে আসতে এখানে মিনিট তিরিশেক লাগে। শ্যাটউইকের কাছে কি একটা কাজে এসেছে বোরিস, রাশেদ পাশা পাঠিয়েছেন। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা নিয়ে এসেছে বোরিস,নামিয়ে দিয়ে গেছে তিন গোয়েন্দাকে।

দূর থেকেই চোখে পড়েছে জাঙ্গল ল্যাণ্ডের মস্ত সাইনবোর্ডঃ

'ওয়েলকাম টু জাঙ্গল ল্যাণ্ড'

'বনভূমিতে স্বাগতম,' বিড়বিড় করে ইংরেজিটার বাংলা অনুবাদ করেছে কিশোর। বোরিসের বাহুতে হাত রেখেছে, 'রাখুন এখানেই।'

'হোকে (ওকে),' ব্রেক চেপেছে বোরিস। ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেছে পুরনো ট্রাক।

নামছে ছেলেরা। কানে আসছে নানারকম কিচিরমিচির, কোলাহল। দূর থেকে ভেসে এলো হাতির বৃংহণ, প্রতিধ্বনি তুললো চারপাশের পাহাড়ে। তার জবাবেই যেন আরেকদিকে মেঘ ডেকে উঠলো, বুকের ভেতর কাঁপুনি তুলে দেয়া ভারি গর্জন।

'সিংহ!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা।

'ভয়ের কিছু নেই,' নিচু কণ্ঠে আশ্বাস দিলো কিশোর, যেন নিজেকেই, 'ওটা

পোষা সিংহ।'

আরও খানিকটা এগিয়ে প্রধান ফটক চোখে পড়লো। বড় নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ আজ বন্ধ।

'অ, এজন্যেই,' বললো রবিন। 'তখন থেকেই ভাবছি, টুরিস্ট স্পট, অথচ কাউকে দেখি না কেন?'

'হয়তো শুটিঙের জন্যেই বন্ধ রাখা হয়েছে,' অনুমান করলো কিশোর।

গেটের কাছে এসে উঁকি দিয়ে এদিক ওদিক তাকালো রবিন। 'মিস্টার কলিনস কোথায়? আমাদের নিতে আসেননি কেন?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বিড়বিড় করলো মুসা। 'সিংহটাকে বোঝাচ্ছেন আরকি, যাতে খাওয়ার তালিকা থেকে আমাদেরকে অন্তত বাদ দেয়।'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল গেটের পাল্লা, হুড়কো লাগানো নেই। 'বাহ্, খোলাই রেখেছে দেখছি। সিনেমার লোকদের আসা যাওয়ার জন্যেই বোধহয়।'

ভেতরে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

কিচিরমিচির আর বিচিত্র কোলাহল বাড়ছে।

'বানর। পাখি।' ডালের দিকে তাকিয়ে বললো কিশোর। 'নিরীহ প্রাণী।'

'ভেবো না,' ভয়ে ভয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে তাকালো মুসা, 'হারামীটাও নিশ্চয় ধারেকাছেই কোথাও আছে।'

আঁকাবাঁকা সরু পথ। দু'ধারে বড় বড় গাছ, ঘন জঙ্গল। ডাল থেকে নেমেছে লতার দঙ্গল, কোথাও সোজা, কোথাও প্যাঁচানো, কোথাও বা কোঁকড়া চুলের মতো।

'একেবারে আসল বনের মতো,' মুসা বললো।

অন্য দু'জনও একমত। ধীর গতি। সন্দিহান চোখে দেখতে দেখতে চলেছে। ভয়—যেন ঘন ঝোপের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে ভীষণ জানোয়ারটা, যে কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে এসে পড়বে ঘাড়ে। কলরবের কমতি নেই। আবার শোনা গেল ভারি গর্জন।

এক জায়গায় এসে দু'ভাগ হয়ে গেছে পথটা। সাইনপোস্ট রয়েছে।

'ওয়েস্টার্ন ভিলেজ অ্যাণ্ড গোস্ট টাউন,' পড়লো রবিন। বাঁয়ের পথটা দেখিয়ে বললো, 'তাহলে ওদিকে কি আছে?'

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো কিশোর, 'হয়তো জানোয়ারের দল।'

ডানের পথটা ধরলো ওরা।

কয়েকশো গজ এগিয়ে হাত তুলে দেখালো মুসা। 'বাড়ি। মিস্টার কলিনসের অফিস বোধহয়।'

'আমার কাছে তো মালগুদামের মতো লাগছে,' এগোতে এগোতে কিশোর বললো। 'দেখো, একটা কোরালও আছে।'

হঠাৎ, জোরে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো কি যেন। জমে গেল ছেলেরা। পাশের ঘন ঝোপে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

আরেকবার চিৎকার হতেই মস্ত এক ব্যারেল পামের আড়ালে লুকালো ওরা। বুকের ভেতর দুরুদুরু করছে। আবার শব্দ হয় কিনা সে-অপেক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু হলো না। যাদুমন্ত্রে যেন নীরব হয়ে গেছে সমস্ত বন।

'কী ওটা?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'ঠিক বলতে পারবো না। বোধহয় চিতা।'

'কোনো ধরনের বানরও হতে পারে,' রবিন বললো।

যা-ই হোক, আড়াল থেকে বোরোলো না ওরা।

'আল্লাহরে, কি কাণ্ড!' তিক্তকণ্ঠে বললো মুসা। 'এলাম ভীতু সিংহের খোঁজে। এখানে যে ভীতু চিতা আর বানরও আছে, তাতো কেউ বলেনি! নাকি জিনভূতের কারবার!'

'তোমার মাথা,' কিশোর বললো। 'এটা জাঙ্গল ল্যাণ্ড। জন্তুজানোয়ারের খামার। এসব চেঁচামেচি তো হবেই। আমরাই গাধা। এরকম ডাকাডাকি হওয়াই তো স্বাভাবিক। চলো, বাড়িটাতে গিয়ে দেখি।'

আগে আগে চলেছে কিশোর, পেছনে সাবধানে হাঁটছে অন্য দু'জন।

'ওদিক থেকে এসেছে চিৎকারটা,' ভয়ে ভয়ে একটা দিকে দেখিয়ে বিড়বিড় করলো মুসা।

'আটকে রেখেছে হয়তো ওটাকে,' মন্তব্য করলো রবিন, 'তাই ওরকম চেঁচাচ্ছে।'

'বকবক না করে একটু পা চালাও তো,' ধমক দিলো কিশোর।

বাড়িটা পুরনো, রঙচটা দেয়াল। বালতি, গামলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অযত্নে। জানোয়ারকে খাবার দেয়া হতো ওগুলোতে করে। পথের ওপরে ভারি গাড়ির চাকার দাগ, গভীর হয়ে বসেছে। কাত হয়ে ভেঙে পড়েছে কোরালের বেড়া।

শান্ত, নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা, যেন ওদেরই অপেক্ষায়।

'এবার কি?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

পা বাড়ালো কিশোর। 'দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি। মিস্টার কলিনসকে জানানো দরকার, আমরা এসেছি।'

দরজায় থাবা দিলো কিশোর।

সাড়া নেই।

আবার থাবা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'মিস্টার কলিনস, আমরা এসেছি।'

মাথা চুলকালো রবিন। 'বোধহয় এখানে নেই...'

'চুপ! ঠোঁটে আঙুল রাখলো মুসা। 'কিসের যেন শব্দ...'

শব্দটা সবাই শুনতে পেলো। বিচিত্র কটকট। এগিয়ে আসছে। শুকনো পাতায় সাবধানে পা ফেলছে কে যেন।

বড় বড় হয়ে গেছে ছেলেদের চোখ। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার কথা ভাবছে।

বেরিয়ে এলো ওটা। মানুষ দেখে থমকে গেল। তারপর মাথা নিচু করে দৌড়ে এলো, হলদে পা দিয়ে ধুলোর খুদে ঝড় তুলছে বালিতে।

চেয়েই আছে তিন গোয়েন্দা।

চার

'বেশি ভয় পেলে এই অবস্থাই হয়,' মুখ বাঁকালো কিশোর। 'শুরু থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি আমরা। তাই যা শুনছি, তাতেই চমকে উঠছি। সাধারণ একটা মোরগও আমাদের কলজে কাঁপিয়ে দিলো। ধ্যাত্তোর!'

'হারামজাদা!' মোরগটাকে তাড়া করলো মুসা। 'শয়তানীর আর জায়গা পাওনি?'

'ওটার কি দোষ?' পেছন থেকে বললো রবিন। 'ভয় পাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছি আমরা, তাই ভয় পাইয়েছে। পাগলামি করো না, এসো।'

কঁককঁক করে একটা ঝোপে লুকালো বনমোরগটা।

ধাক্কা দেয়ার জন্যে আবার দরজার দিকে হাত বাড়ালো কিশোর।

'কিশোর, ওই দেখো,' রবিন থামালো তাকে।

দেখলো তিনজনেই। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে নড়াচড়া। খাকি পোশাক পড়া একজন মানুষ বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে।

'মিস্টার কলিনস!' চিৎকার করে ডাকলো কিশোর।

থেমে, ফিরে তাকালো লোকটা।

ছুটে গেল তিন গোয়েন্দা।

'আপনাকে সেই কখন থেকে খুঁজছি,' মুসা বললো।

ছেলেদের দেখছে লোকটা। চোখে প্রশ্ন। বেঁটে, চওড়া বুক, রঙজ্বলা সাফারি শার্টের গলা থেকে নিচের অর্ধেকটার বোতাম খোলা। মুখের রোদেপোড়া তামাটে চামড়ার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান উজ্জ্বল নীল চোখের তারা। লম্বা নাকের একটা ফুটো আরেকটার চেয়ে চাপা। মাথায় পুরনো একটা হ্যাট, চওড়া কানার একদিকের প্রান্ত বাঁকা হয়ে ঝুলে প্রায় ঢেকে দিয়েছে এক কান।

ছেলেদের এগিয়ে আসতে দেখে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো লোকটা। ঝিক করে

উঠলো হাতের জিনিসটা। আলগোছে ধরে রেখেছে লম্বা, তীক্ষ্ণধার একটা ভোজালি।

ছুরিটার দিকে তাকিয়ে দ্রুত বললো কিশোর, 'আমরা তিন গোয়েন্দা, মিস্টার কলিনস। মিস্টার ক্রিস্টোফারতো ফোনে জানিয়েছেন আপনাকে। জানাননি?'

অবাক মনে হলো লোকটাকে। চোখ মিটমিট করলো। 'অ্যাঁ... ও, হ্যাঁ, মিস্টার ক্রিস্টোফার। কি যেন বললে? তোমরা তিন গোয়েন্দা, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার কলিনস।' পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

পড়লো লোকটা।

'ও মুসা আমান,' পরিচয় করিয়ে দিলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'আর ও রবিন মিলফোর্ড। আপনার ভীতু সিংহটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এলাম।'

'তাই?'

'মিস্টার ক্রিস্টোফার তো তাই বললেন। আপনার সিংহটা নাকি নার্ভাস।'

মাথা ঝোঁকালো লোকটা। কার্ডটা পকেটেই রাখলো। দূরে হাতির চিৎকার আর সিংহের গর্জন হতেই ভ্রূকুটি করে তাকালো সেদিকে। হাসি ফুটলো মুখে। 'বেশতো, ভয় না পেলে এসো আমার সঙ্গে। সিংহটাকে দেখবে তো?'

'সেজন্যেই তো এসেছি।'

'এসো তাহলে।'

আচমকা ঘুরে বনে ঢুকে পড়লো আবার লোকটা। সরু একটা বুনোপথ ধরে এগোলো। পেছনে চললো ছেলেরা।

'ব্যাপারটা খুলে বলবেন, মিস্টার কলিনস?' চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

ঝিলিক দিয়ে উঠলো আবার ধারালো ভোজালি। খুব সহজেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল শক্ত মোটা লতা। 'কি জানতে চাও?' গতি সামান্যতম কমালো না লোকটা।

ওর সঙ্গে তাল রেখে চলতে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে কিশোরকে। 'ওই সিংহটার কথা আরকি। সিংহের ভীতু হওয়া, কেমন অস্বাভাবিক না?'

মাথা নোয়ালো শুধু লোকটা। চলার গতি আরও বাড়ালো। একনাগাড়ে কুপিয়ে কাটছে লতা, ঘন ঝোপঝাড়ের ডালপাতা, পথ করে নিচ্ছে। 'মোটেও অস্বাভাবিক নয়। সিংহের চালচলন জানো কিছু?'

অবাক হলো কিশোর। 'না, স্যার। সেটাই তো জানতে চাইছি। আজব কাণ্ড, তাই না? মানে সিংহের ভীতু হওয়া...'

'হ্যাঁ।' কাটা জবাব দিলো লোকটা। হাত তুলে চুপ করতে বললো। মৃদু কিচমিচ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বোম ফাটলো যেন কানের কাছে। হাসলো লোকটা। 'এই, সামনেই রয়েছে! কেমন লাগলো? ভীতু?'

'আ–আমি জানি না। স্বা–স্বাভাবিকই তো লাগলো,' ভয় পেয়েছে যে, এটা বুঝতে দিতে চাইলো না কিশোর।

'ঠিক,' বেরিয়ে থাকা একটা ডালে কোপ মারলো লোকটা। 'মোটেও ভীতু নয় সিংহ।'

'কিন্তু…,' বলতে গিয়েও বাধা পেয়ে থেমে গেল কিশোর।

'যদি না,' আগের কথার খেই ধরে বললো লোকটা, 'তাকে নার্ভাস হতে সাহায্য করা না হয়, মানে, হয়ে থাকে। বুঝেছো কিছু?'

মাথা ঝাঁকালো ছেলেরা।

'কিন্তু কিসে বাধ্য করলো?' প্রশ্ন করলো রবিন।

জবাব না দিয়ে ঝট করে একপাশে সরে গেল লোকটা। 'চুপ! নড়বে না। কাছেই আছে।' ছেলেরা কিছু বুঝে উঠার আগেই পাশের লম্বা ঘাসবনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল তার পদশব্দ, গায়ের সঙ্গে ঘাসের ঘষা লাগার আওয়াজ। তারপর কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল।

মাথার ওপর কর্কশ চিৎকার করলো একটা পাখি। চমকে উঠলো ছেলেরা।

'ভয় পেও না,' সত্যিকার ভয়ের মুহূর্তে আশ্চর্যরকম সাহসী হয়ে ওঠে স্বভাবভীতু মুসা আমান। 'ওটা একটা সাধারণ পাখি।'

'শকুন–টকুন কিছু,' রবিন বললো।

আরও কয়েকটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেরা। ঘড়ি দেখলো কিশোর। 'আমার মনে হয়, শকুনটা কিছু বোঝাতে চেয়েছে।'

'কী?' রবিনের প্রশ্ন।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কিশোরের চেহারা। শুকনো ঠোঁট চাটলো। 'মনে হচ্ছে আর ফিরে আসবে না মিস্টার কলিনস। আমাদের কোনো ধরনের পরীক্ষায় ফেলে গেছেন। হয়তো আমাদের স্নায়ুর জোর দেখতে চাইছেন। জন্তুজানোয়ারকে কতোখানি ভয় পাই আমরা, তদন্ত করতে পারবো কিনা…'

'কিন্তু কেন?' বাধা দিলো মুসা। 'কি কারণ থাকতে পারে? এখানে তাঁকে সাহায্য করতেই এসেছি আমরা। কেন আমাদের বিপদে ফেলতে যাবেন?'

জবাব দেয়ার আগে কান পেতে কয়েক মুহূর্ত কি শুনলো কিশোর। গাছের মাথায়, ডালে যেন পাগল হয়ে গেছে পাখি আর বানরের দল। আবার শোনা গেল সেই ভয়াবহ কানফাটা গর্জন।

সেদিকে ইঙ্গিত করে কিশোর বললো, 'কি কারণ জানি না। তবে এটা বেশ বুঝতে পারছি, আরও কাছে এসেছে সিংহ। এদিকেই আসছে। শকুনটা এটাই বোঝাতে চেয়েছিলো। পাখি আর বানরের দলও তাই বলছে।'

কান পেতে আছে ছেলেরা। আতঙ্কিত।
ঘাসে ঘষার আওয়াজ উঠছে। চাপা ভারি পায়ের শব্দ।
গায়ে গা ঘেঁষে এলো ওরা। একটা গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালো।
ঠিক এই সময়, আবার গর্জে উঠলো সিংহটা, একেবারে কানের কাছে!

পাঁচ

'কুইক!' বলে উঠলো কিশোর। 'গাছে ওঠো। বাঁচতে চাইলে।'

চোখের পলকে কাছের গাছটায় চড়ে বসলো তিন গোয়েন্দা। মসৃণ কাণ্ড। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ওরা, মাটি থেকে বড় জোর ফুট দশেক ওপরে বসেছে। এর বেশি ওপরে ওঠার উপায় নেই, ডাল এতো সরু, ভেঙে পড়বে।

হাত তুলে ঘাসবন দেখালো মুসা। নড়ছে কিছু।

হালকা শিস শোনা গেল। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ওদেরই বয়েসী একটা ছেলে। সতর্ক।

'এই!' ডাকলো রবিন। 'আমরা এখানে।'

ঝট করে মাথা তুললো ছেলেটা। একই সংগে উঠে গেল তার হাতের রাইফেলের নল। 'কে তোমরা?'

'ব–বন্ধু! রাইফেল সরাও।'

'আমাদের ডেকে আনা হয়েছে এখানে,' যোগ করলো মুসা। 'আমরা তিন গোয়েন্দা।'

'মিস্টার কলিনস,' কিশোর বললো, 'এখানে রেখে গিয়েছেন আমাদের। কি যেন দেখতে গেছেন।'

রাইফেল নামালো ছেলেটা। 'নেমে এসো।'

নামলো তিন গোয়েন্দা।

ঘাসবন দেখিয়ে কিশোর বললো, 'একটু আগে ওখানে সিংহের গর্জন শুনেছি। গাছে থাকাই কি ভালো ছিলো না?'

হাসলো ছেলেটা। 'ও তো ভিকটর।'

ঢোক গিললো মুসা। 'ভিকটর। সিংহের নাম ভিকটর?'

মাথা নোয়ালো ছেলেটা। 'হ্যাঁ। ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পোষা।'

উঁচু ঘাসবনে আবার শোনা গেল গর্জন। খুব কাছে।

স্থির হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'ও–ওই ডাক শুনেও ভয় না পেতে বলছো?' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে

মুসা।

'প্রথম প্রথম শুনলে ভয় একটু লাগেই। কিন্তু ও ভিকটর। কারো ক্ষতি করে না।'

মট করে শুকনো একটা ডাল ভাঙলো।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। 'এতো শিওর হচ্ছো কিভাবে?'

'এখানেই কাজ করি আমি,' হাসছে ছেলেটা। 'রোজ দেখি ভিকটরকে। ও, আমার নামই তো বলিনি এখনও। আমি ডিকার কলিনস। ডিক।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বললো কিশোর। নিজেদের নাম জানালো একে একে। তারপর বললো, 'আচ্ছা তোমার বাবার ব্যাপারটা কি বলো তো? আমাদের সংগে এই রসিকতা কেন?'

অবাক মনে হলো ডিককে।

'এখানে জঙ্গলের মাঝখানে ফেলে গেল,' রাগ চাপা দিতে পারলো না মুসা। 'কাছাকাছি রয়েছে সিংহ। এটা কোনো রসিকতা হলো?'

'সেজন্যেই গোলমাল শুরু হয়েছে এখানে,' রবিনও রেগেছে। 'এরকম করতে থাকলে ব্যবসা বেশিদিন চালাতে পারবে না। কেউ আসবে না শেষে।'

রীতিমতো অবাক মনে হলো ডিককে। 'কি বলছো? প্রথম কথা, আমি উইলবার কলিনসের ছেলে নই, ভাতিজা। দুই নম্বর, চাচা এখানে রেখে যায়নি তোমাদের, যেতে পারে না। কারণ, ভিকটরকে আমরাই খুঁজছি! অপরিচিত কাউকে এখানে ফেলে যাবে চাচা, প্রশ্নই ওঠে না।'

বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর, 'সত্যি বলছি আমরা, ডিক। মিস্টার কলিনস সাথে করে আমাদের এখানে নিয়ে এসে ফেলে গেছেন। সিংহের ডাক শুনে, আমাদের এখানে থাকতে বলে ঢুকে গেছেন ঘাসবনে। তারপর থেকে আছি এখানে, অনেকক্ষণ ধরে আছি।'

জোরে মাথা নাড়লো ডিক। 'কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। চাচা হতেই পারে না। সারাক্ষণ আমি ছিলাম তার সংগে, এইমাত্র এলাম। অন্য কেউ হবে। কি-রকম দেখতে?'

লোকটার বর্ণনা দিলো রবিন।

শুনে বললো ডিক, 'বললাম না, ভুল হয়েছে। ও আমার চাচা নয়। ওর নাম টোল কিন। এখানে অ্যানিমেল ট্রেনারের কাজ করতো।' লম্বা ঘাসের দিকে তাকিয়ে কান পেতে কিছু শুনলো সে। 'কিন্তু এখানে আবার ঢুকলো কিভাবে? চাচা তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে?' কথাটা ধরলো কিশোর। 'কেন?'

'জানোয়ারের সংগে দুর্ব্যবহার করতো। চাচা এসব পছন্দ করে না। তার ওপর,

লোকটার স্বভাব-চরিত্রও ভালো না, খালি গোলমাল পাকানোর তালে থাকে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে।'

'কি জানি,' চিন্তিত দেখালো কিশোরকে। 'লোকটাকে তো বিন্দুমাত্র মাতাল মনে হলো না। বেশ শান্ত।'

'আর আমাদের সঙ্গেই বা তার কিসের শত্রুতা?' রবিনের প্রশ্ন। 'আমাদেরকে বিপদে ফেলে যাবে কেন?'

'বুঝতে পারছি না,' ডিকও ভাবছে। 'আচ্ছা, কেন এসেছো তোমরা বলেছো নাকি?'

কপাল চাপড়ালো কিশোর। 'সব বলে দিয়েছি। মিস্টার ক্রিস্টোফার আমাদের পাঠিয়েছেন, একথাও বলেছি তাকে। এখন মনে পড়ছে, সিংহের নার্ভাসনেসের কথা শুনে অবাক হয়েছিলো সে।'

'কিন্তু তাতেই বা কি হয়েছে?' রবিন বললো। 'টোল কিনকে তাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের হাত ছিলো না। আমরা তার শত্রু নই।'

'কারণটা সিংহ হতে পারে,' কিশোর ব্যাখ্যা দিলো। 'সিংহের কেস নিয়ে এখানে এসেছি আমরা। কিন হয়তো চায় না, সিংহটা কেন নার্ভাস হয়েছে সেটা আমরা বের করে ফেলি।'

'তা হতে পারে,' একমত হলো ডিক। 'কিনই হয়তো ভিকটরকে ছেড়ে দিয়েছে। নিজে নিজে বেরিয়ে যায়নি সিংহটা, এখন মনে হচ্ছে।'

'তোমার চাচার সংগে দেখা হওয়া দরকার। তিনি হয়তো আরও কিছু জানাতে পারবেন,' বললো কিশোর। 'চলো, যাই।'

'কিশোর!' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'কি!'

'ঠিক আমাদের পেছনে...,' রবিনের গলা কাঁপছে, 'বিরাট এক সিংহ। পোষা তো মনে হচ্ছে না!...বুনো...'

ফিরে চেয়ে বললো ডিক, 'হ্যাঁ, ভিকটরই। আমাকে চেনে ও। তোমরা চুপ করে থাকো। আমি ওকে সামলাচ্ছি।'

আশ্বস্ত হতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। দেখছে, এক পা বাড়ালো ডিক। এক হাত তুললো। 'ভিকটর, শান্ত হও ভিকটর। আমি...আমরা...ভিকটর, লক্ষ্মী ছেলে।'

জবাবে চাপা গর্জন। কেশর ফুলিয়ে চেহারা ভীষণ করে তুললো সিংহ। এগোতে শুরু করলো। মাথা নোয়ালো। হলদে চোখে সন্দেহ। বিশাল মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে গর্জে উঠলো আবার। ফুট দশেক দূরে এসে থামলো। ঝুলে পড়েছে মস্ত চোয়াল, বাঁকা, তীক্ষ্ণধার শ্বদন্ত বেরিয়ে পড়েছে।

গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এলো ভারি, চাপা গর্জন। এগিয়ে আসতে লাগলো আবার।

অসহায় চোখে দেখছে তিন গোয়েন্দা। পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে, নড়ার ক্ষমতা নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ। আবার কথা বললো ডিক, 'শান্ত হও, ভিকটর। চুপ হও। তুমি আমাকে চেনো। শান্ত হও। লক্ষ্মী ছেলে।'

এপাশ ওপাশ লেজ নাড়তে শুরু করলো সিংহ। মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি বেরোলো আবার কণ্ঠ থেকে। আরেক কদম আগে বাড়লো।

অস্বস্তিতে মাথা নাড়লো ডিক। 'কি জানি হয়েছে ওর। আমাকে চেনে। অথচ, এখন যেন চিনতে পারছে না।'

ধীরে, খুব ধীরে পিছাতে শুরু করলো ডিক।

এগিয়ে আসছে সিংহ।

ছয়

পাথর হয়ে গেছে যেন তিন গোয়েন্দা।

সিংহটার সংগে নিচুস্বরে কথা বলে চলেছে ডিক, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। শান্ত হচ্ছে না ভিকটর।

ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের, কিন্তু ব্রেনটা কাজ করছে ঠিকমতোই। জোর ভাবনা চলেছে মাথায়। সিংহটার ব্যবহারে অবাক হয়েছে। ডিকার কলিনসকে যেন চিনতেই পারছে না! কেন?

গোলমালটা কোথায়, হঠাৎ আবিষ্কার করলো কিশোর। সিংহটা যাতে চমকে না যায়, এমনিভাবে নিচু কণ্ঠে বললো, 'ডিক, সামনের বাঁ পা-টা দেখো। কাটা।'

দেখলো ডিক। রক্ত লেগে রয়েছে। 'এজন্যেই কথা শুনছে না। আহত সিংহ খুব ভয়ানক। কি যে করি!'

'রাইফেল তো আছে,' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। 'দরকার পড়লে গুলি করো।'

'এটা পয়েন্ট টু-টু। কিছুই হবে না ওর। গুলি লাগলে আরও রেগে যাবে। এটা আমি সংগে রাখি ইমার্জেন্সীর জন্যে, ওয়ার্নিং শট...'

আরেক পা এগোলো সিংহ। বিকট হয়ে উঠেছে চেহারা।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে পিছাতে লাগলো তিন গোয়েন্দা, যে গাছ থেকে নেমেছিলো সেটার দিকে।

'খবরদার,' হুঁশিয়ার করলো ডিক। সে চেষ্টাও করো না। পা ওঠানোর আগেই

ধরে ফেলবে।'

'ফাঁকা আওয়াজ করো তাহলে,' পরামর্শ দিলো কিশোর। 'ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করো ওকে।'

'কোনো লাভ হবে না। মাথা নিচু করে রেখেছে। তারমানে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওটা।' ঠোঁট কামড়ালো ডিক। 'ইস্, এখন চাচাকে বড্ড দরকার...'

লম্বা ঘাস সরানোর শব্দ হলো। 'আমি এসেছি,' শুকনো কণ্ঠস্বর। 'চুপ, একদম চুপ। একটা আঙুল নড়াবে না কেউ।'

সহজ ভঙ্গিতে এগোলেন আগন্তুক। কোমল কণ্ঠে বললেন, 'ভিকটর, কি হয়েছে?'

যেন কথার কথা, স্বাভাবিক প্রশ্ন। কাজ হলো। মাথা ঘোরালো সিংহ। লেজ নাড়লো। গর্জে উঠলো গলা ফাটিয়ে।

মাথা ঝাঁকালেন আগন্তুক। লম্বা, ব্রোঞ্জরঙ চামড়া। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে ধরলেন সিংহের বিশাল মাথাটা। 'দেখি তো, কি হয়েছে?'

আবার বিকট হাঁ করলো সিংহ। ছেলেরা ভেবেছিলো, গর্জে উঠবে। তা না করে গুঙিয়ে উঠলো। আস্তে করে তুলে ধরলো আহত পা–টা।

'আহ্হা, খুব কেটেছে তো,' দরদ–মেশানো কণ্ঠে বললেন কলিনস। 'দাঁড়াও, ঠিক করে দিচ্ছি।' পকেট থেকে রুমাল বের করে কাটা জায়গা বেঁধে দিতে শুরু করলেন।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে সিংহ।

শেষ গিঁটটা বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন কলিনস। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিলেন সিংহের কানে, কেশরে। 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। সব ঠিক হয়ে যাবে। এটা একটা জখম হলো নাকি?'

হেসে, ফিরে চাইলেন তিনি।

চাপা ছোট্ট একটা গর্জন করলো সিংহ। কাঁপছে মুখের পেশী। হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। এসে পড়লো কলিনসের গায়ের ওপর, তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

আতঙ্কিত চোখে দেখলো তিন গোয়েন্দা, মানুষটাকে মাটিতে ফেলে তাঁর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে বিশাল জানোয়ারটা। ডিকের দিকে চেয়ে অবাক হলো ওরা। হাসি ফুটেছে ছেলেটার মুখে।

বুঝতে না পেরে কিশোর বললো, 'কিছু একটা করো!'

'গুলি করো, গুলি করো!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

'ভয়ের কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বললো ডিক। 'খেলছে চাচার সংগে।'

তাদেরকে আরও অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠলেন কলিনস। জড়িয়ে

ধরলেন সিংহটাকে।

গরগর করছে সিংহ, আনন্দ প্রকাশের সময় বেড়াল যেমন করে।

গায়ের ওপর থেকে ঠেলে সিংহটাকে সরিয়ে উঠে বসলেন কলিনস। ধুলো ঝাড়তে শুরু করলেন শরীর থেকে। 'বেজায় ভারি। ও সেটা বোঝে না। ভাবে, এখনও বুঝি সেই বাচ্চাটিই আছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। ডিকের দিকে ফিরে বললো, 'উফ, ভয়ে মারা যাচ্ছিলাম। ওভাবেই খেলে নাকি সব সময়?'

'তাতে ভয়ের কিছু নেই,' বললো ডিক।

'কিন্তু মিস্টার ক্রিস্টোফার যে বললেন...,' কলিনসের দিকে ফিরলো কিশোর। 'মিস্টার কলিনস, আমরা তিন গোয়েন্দা। আপনার বন্ধু মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন। উনি বললেন সিংহটা কোনো কারণে নার্ভাস হয়ে পড়েছে।'

'ঠিকই বলেছেন,' স্বীকার করলো কলিনস। 'নিজের চোখেই তো দেখলে ঘটনা। আগে এরকম ব্যবহার কখনও করতো না ভিকটর। ইদানীং ওর ওপর আর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।'

'কেন এরকম করে? পা কাটা বলে? আপনার কি মনে হয়নি, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়?'

'মানে?' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল কলিনসের মুখ থেকে।

'ওই যে কাটাটা, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়ে থাকতে পারে। ধরুন, কোনো ভোজালি...'

'তাই তো!' মাথা ঝাঁকালেন কলিনস।

'আমরা আরেকজনের দেখা পেয়েছিলাম, স্যার। ভুলে তাকে আপনি ভেবেছি। হাতে একটা ভোজালি ছিলো। সে-ই আমাদেরকে এখানে এনে ফেলে গেছে।'

'টোল কিনের কথা বলছে, কাকু,' ডিক জানালো। 'ও-ই নিশ্চয় ভিকটরকে ছেড়েছে।'

চোয়াল কঠিন হলো কলিনসের। 'টোল কিন? আবার এসেছে? সিংহটার দিকে তাকালেন তিনি। 'এখন বোঝা যাচ্ছে, কে ছেড়েছে ভিকটরকে। টোল এখানে এনেছে তোমাদেরকে?'

'হ্যাঁ,' বললো রবিন। 'তারপর দাঁড়াতে বলে চলে গেছে।'

'ওর পক্ষেই ভিকটরের পা কাটা সম্ভব,' মুসা বললো। 'একসময় সিংহটার ট্রেনার ছিলো। কাছে গিয়েছে সহজেই। ভোজালি দিয়ে পা কেটেছে।'

'তাই যদি হয়,' গম্ভীর হয়ে বললেন কলিনস, 'শেষবারের জন্যে শয়তানী করেছে। এখানে আবার ঢুকলে ভিকটরই ওকে ধরবে। আর ভিকটরের ধরা মানে...'

ভলিউম-৫

বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি। আদর করে সিংহের কানে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। তোমরাও এসো।'

'ডাক্তারের জন্যে বাইরে যেতে হবে নাকি?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না,' জবাব দিলো ডিক। 'আমাদের নিজস্ব পশুচিকিৎসক আছে। ডাক্তার হ্যালোয়েন।'

সাত

বন থেকে একটা গলিপথে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। টেইলবোর্ড নামিয়ে ভিকটরকে গাড়িতে তুলে বাঁধলেন কলিনস।

'এসো,' সদ্য পরিচিত তিন বন্ধুকে ডাকলো ডিক। 'আমরা সামনে উঠে বসি।'

গাড়ি চালালেন কলিনস।

'কোত্থেকে ভিকটরকে ছাড়া হলো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'সাধারণত কোথায় রাখা হয় তাকে?'

'বাড়িতেই থাকে,' জবাব দিলেন কলিনস। 'আমার আর ডিকের সঙ্গে।'

আঁকাবাঁকা পথ ধরে ঢাল বেয়ে উঠছে গাড়ি। খোয়া বিছানো পথ, এগিয়ে গেছে একটা বড় শাদা বাড়ির দিকে।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি রাখলেন কলিনস। 'ডিক, ডাক্তারকে খবর দাও।'

পাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলো ডিক।

অবাক হয়ে বাড়িটা দেখছে কিশোর। 'এখানে থাকেন? গুদামঘরটা দেখে আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম ওখানেই বুঝি থাকেন।'

'ওটা একটা শো,' হেসে বুঝিয়ে বললেন কলিনস। 'নানারকম লোক আসে এখানে। এটা অ্যানিম্যাল ফার্ম, আবার র‍্যাঞ্চও বলতে পারো। বুনো পশ্চিমের একটা গন্ধ রাখতে চেয়েছি। কিছু কিছু দর্শক আছে, পছন্দ করে এসব। সিনেমা কোম্পানিরও কাজে লাগে। একটা কোম্পানি শুটিং করছে এখন, একটা জংলী ছবি বানাচ্ছে।'

'মিস্টার ক্রিস্টোফার বলেছেন। শুটিঙে নাকি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে সিংহটা?'

'হ্যাঁ। ওকেও ভাড়া নিয়েছে কোম্পানি। কিন্তু ওটা যা ব্যবহার শুরু করেছে, আমার তো ভয় হচ্ছে, সাংঘাতিক কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না করে বসে। ফ্র্যাঙ্কলিন সিন্-এর দলের কাউকে খুন করলেও অবাক হবো না।'

'ফ্র্যাঙ্কলিন সিন কে?' জানতে চাইলো রবিন।

'নামটা পরিচিত লাগছে,' মুসা বললো। 'আমার বাবা সিনেমায় কাজ করে।

সিন…সিন…নামটা বাবার মুখেই বোধহয় শুনেছি।'

'হতে পারে। সিন তো খুব বিখ্যাত লোক। বড় প্রডিওসার, ডিরেক্টর…অন্তত সে নিজে তো তা-ই মনে করে।'

ডিককে বাড়ির ভেতর থেকে বেরোতে দেখে নামলেন কলিনস। টেইলবোর্ড খুললেন।

কাছে এসে পথের দিকে দেখলো ডিক, ধুলোর ঝড় ছুটে আসছে। 'ঝামেলা আসছে, কাকু।'

কলিনসও ফিরে তাকালেন। কাছাকাছি হলো ভুরু। 'হ্যাঁ। ফ্র্যাঙ্কলিন সিন।'

একটা স্টেশন ওয়াগন এগিয়ে আসছে। কাছে এসে থামলো। সামনের সিট থেকে লাফ দিয়ে নামলো একজন বেঁটে, মোটা, টাকমাথা লোক। বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে হেঁটে এলো। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, রেগেছে।

'কলিনস,' চেঁচিয়ে বললো সে, 'আমাদের চুক্তি ঠিক রাখতে বলেছিলাম।'

দরদর করে ঘামছে পরিচালক।

শান্তকণ্ঠে বললেন কলিনস, 'কি বলছেন? চুক্তিটা বেঠিক হয়েছে কোথায়?'

মুঠোবদ্ধ হাত কলিনসের মুখের সামনে ঝাঁকালো পরিচালক। 'চুক্তিতে আছে, আমার লোকদের কোনো বিপদ হবে না। অথচ…। এর জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাকে।'

ভুরু উঁচু হলো কলিনসের। 'কি ঘটেছে?'

'আমাকে ফোন করেছে, জন প্রাইস নাকি জখম হয়েছে। কি ভাবে হয়েছে, জিজ্ঞেস করিনি। আমি শিওর, আপনার জানোয়ারের কাজ।'

'অসম্ভব!'

হাত তুলে ভ্যানের বিশাল সিংহটাকে দেখালো পরিচালক। 'ওই তো, প্রমাণ তো ওখানেই আছে। আপনার পোষা সিংহ। আমি জানতে পেরেছি, ঘন্টাখানেক আগেও ছাড়া ছিলো ওটা, বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কি, অস্বীকার করতে পারবেন?'

'না, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এতে প্রমাণ হলো না, জন প্রাইসকে ভিকটরই আক্রমণ করেছিলো। আমি বিশ্বাস করি না।'

'নিজের চোখে যখন দেখবেন, ঠিকই বিশ্বাস করবেন।'

'বেশি জখম হয়েছে?' নরম হলেন কলিনস।

'কি করে বলবো? দেখিইনি এখনও। তবে সিংহ হামলা চালালে কি কেউ কম জখম হয়?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসলো কলিনসের। 'দেখুন, এখনও জানি না আমরা, আপনিও জানেন না, ভিকটরই কাজটা করেছে কিনা।'

'আর কে করবে তাহলে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করবো। হাতের কাজটা আগে সেরে নিই…'

গাড়ির হর্নের শব্দ হলো। ছোট পুরনো একটা লরি ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে আসছে।

'ডাক্তার হ্যালোয়েন,' ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে জানালো ডিক।

ব্রেক কষলেন ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটা। নেমে এলেন লরি থেকে। লম্বা, পাতলা শরীর। পুরু গোঁফের তলা থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা সিগারেটের গোড়া, আগুন নিভে গেছে। হাতে কালো ডাক্তারী–ব্যাগ। লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে এলেন জটলার কাছে।

সিংহটার ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন ডাক্তার। সিনকে এড়িয়ে গিয়ে কলিনসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডিক ফোন করলো,' মোটা খসখসে কণ্ঠস্বর। 'কি করে জখম হলো?'

'আমরা বাড়ি ছিলাম না: এই সুযোগে কে জানি ছেড়ে দিয়েছে। পা কেটে দিয়েছে।'

'ভোজালি দিয়ে কেটেছে,' সুর মেলালো ডিক।

ডিকের দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করলেন ডাক্তার। 'কে করেছে?' জবাবের অপেক্ষা না করে বললেন, 'দেখলেই বুঝবো, কি করে কেটেছে। উইলবার, ধরো ওকে শক্ত করে।'

ভিকটরের কেশর চেপে ধরলেন কলিনস।

কোমল গলায় ডাক্তার বললেন, 'ভিকি, বয়, দেখি তো কি হয়েছে?'

আহত পা–টা তুলে ধরে আস্তে করে রুমালটা খুললেন তিনি। গুঙিয়ে উঠলো সিংহ।

'আহা, অমন করছো কেন?' খসখসে কণ্ঠ মোলায়েম করতে চাইলেই কি আর হয়? কিন্তু পরিচিত মানুষ, আপত্তি করলো না সিংহ। 'ব্যথা করছে? …হুম। কাটা কম, তবে গভীর বেশি। ডিসপেনসারিতে নিয়ে যাই। এখানে থাকলে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে।'

'দরকার হলে নিয়ে যাও,' বললেন কলিনস। 'ভিকটর, যা ডাক্তারের সংগে।'

লরির দিকে এগোলেন ডাক্তার। পথরোধ করলো পরিচালক। 'ব্যাপারটা কি?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো সে। 'সিংহটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমি ভাড়া করেছি ওকে। কাল সকাল আটটায় শুটিং।'

ধীরেসুস্থে সিগারেটের গোড়াটা ধরালেন ডাক্তার। ধোঁয়া ছাড়লেন পরিচালকের নাকেমুখে। 'আমি যখন বলবো, তখন থেকে কাজ শুরু করবে সিংহটা। কাল সকালে

ওর পা ভালো হয়ে গেলে, ভালো, নইলে থাকবে আমার কাছেই। রোগীকে সুস্থ করা আমার কর্তব্য এবং দায়িত্ব। আপনার ছবির কি হবে সেটা আপনি জানেন। সরুন, পথ ছাড়ুন।'

চুপচাপ এই নাটক উপভোগ করছে তিন গোয়েন্দা। ভেবেছিলো, বোমা ফাটবে। কিন্তু তাদেরকে অবাক করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো সিন।

কলিনস আর ডাক্তার দু'জনে মিলে ভিকটরকে লরিতে উঠতে সাহায্য করলেন।

সিন এসে দাঁড়ালো কলিনসের সামনে। 'আবার বলছি আপনাকে, কাল সকালে সময়মতো যেন পাই সিংহটাকে। নইলে···তো, এখন কি জন প্রাইসকে দেখতে যাবেন?'

নীরবে পরিচালককে অনুসরণ করে তার স্টেশন ওয়াগনে গিয়ে উঠলেন কলিনস। জানালা দিয়ে মুখ বের করে কিশোরের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'সরি, কিশোর। তোমাদের সংগে পরে কথা বলবো।'

চিন্তিত চোখে তাকিয়ে রইলো কিশোর যতোক্ষণ না গাড়িটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল, যদি সত্যি হয়।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার।

'কি সত্যি হয়?' প্রশ্ন করলো ডিক। 'কার জন্যে খারাপ? আমার চাচা, না সিন?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কিশোর। 'তোমার চাচাকে কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো, ডিক।'

'হ্যাঁ। চাচার খারাপ হলে আমারও খারাপ। বাবা-মা নেই আমার, মারা গেছে। কেউ নেই এই এক চাচা ছাড়া। ও, আর আছে সিলভার।'

'সিলভার?' রবিন বললো।

'আমার আরেক চাচা, সিলভার কলিনস। বড় শিকারী, ভ্রমণকারী। আফ্রিকার কতো জায়গা যে সফর করেছে। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে ওই চাচাই তো জন্তুজানোয়ার পাঠায়।'

'আচ্ছা, এই ফ্র্যাঙ্কলিন সিনের ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'খুব বদমেজাজী মনে হলো। বলতে গেলে দুর্ব্যবহারই করলো তোমার চাচার সংগে।'

'জানি না। হয়তো শিডিউল ফেল করার ভয়ে সময়মতো বাজারে ছাড়তে চায় আরকি ছবিটা। তাছাড়া মেজাজ দেখানোটা অহেতুক নয়। তার সংগে একটা চুক্তি হয়েছে, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে কোনো বিপদ আপদ হবে না, নিরাপদে কাজ করতে পারবে। এখন গোলমাল দেখলে তো রাগবেই।'

'সত্যি যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, কি হবে তাহলে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'চাচার বড় রকমের ক্ষতি হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। পঞ্চাশ হাজার ডলারে ভাড়া নিয়েছে সিন। ওই টাকা তো ফিরিয়ে দিতে হবেই, জাঙ্গল ল্যাণ্ডেরও বদনাম হয়ে

যাবে। সিনেমা কোম্পানি আর ভাড়া নিতে আসবে না, এমন কি টুরিস্ট আর সাধারণ দর্শকও কমে যাবে।'

'হুঁ,' বললো কিশোর, 'তাহলে তো ভাবনারই কথা। সেজন্যেই এতোটা উতলা হয়েছেন মিস্টার কলিনস।'

'আর শুধু ওই পঞ্চাশ হাজারই নয়,' আরও জানালো ডিক। 'সিংহটার জন্যে আলাদা ভাড়া দেবে সিন। প্রতিটি দৃশ্যের জন্যে পাঁচশো ডলার করে।'

'ভিকটর কি আগে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে? কাউকে জখম-টখম করেছে?'

'না,' মাথা নাড়লো ডিক। 'কখনও না। এমনিতে বেচারা খুব শান্ত, ভালো ট্রেনিং পাওয়া,' ঠোঁট কামড়ালো সে। 'তবে ইদানীং অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে। দেখলেই তো তখন।'

'আগে না করলে এখন করে কেন?' রবিন বললো। 'কিসে, কেন নার্ভাস হয়েছে সে, কোনো ধারণা দিতে পারো?'

'ঠিক বলতে পারবো না, তবে কিছুদিন ধরে ভালো ঘুম হচ্ছে না তার। অস্থির থাকে। রাতে থেকে থেকেই উঠে গর্জায়, পায়চারি করে, বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মাঝেসাঝে চাচার কথাও শুনতে চায় না।'

'ঘরের বাইরের কোনো কিছু উত্তেজিত করে তাকে?' প্রশ্ন করলো কিশোর। 'রাতের অন্ধকারে বাইরে তো কতোরকম জানোয়ারই ঘুরে বেড়ায়।'

'না, সেজন্যে না,' জোরে মাথা নাড়লো ডিক। 'হরিণ যা আছে, রাতে ছাড়া থাকে না, নির্দিষ্ট ঘরে আটকে রাখা হয়। ঘোড়াগুলোকে রাখা হয় কোরালে। দুটো হাতি আছে আমাদের, দিনে বেশির ভাগ সময়ই হ্রদের ধারে থাকে, রাতে থাকে ওদের ঘরে। এছাড়া র‍্যাকুন আছে, বানর, পাখি, কুকুর, আর আরও নানারকম জানোয়ার আছে। পাখি আর বানর ছাড়া প্রায় কোনো জানোয়ারই রাতে ছাড়া থাকে না। গুণে গুণে ঢোকানো হয় যার যার খাঁচায়।'

'তাহলে কি কারণে নার্ভাস হয় সিংহটা?' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'কারণ তো একটা নিশ্চয় আছে।'

'এতোটাই নার্ভাস যে জন প্রাইসকে আক্রমণ করে বসেছে,' কিশোরের কথার পিঠে বললো মুসা। 'তবে প্রাইসও নাকি লোক সুবিধের নয়। বাবার মুখে শুনেছি। ব্যবহার-ট্যবহার খুব খারাপ।'

'লোকের সংগে ব্যবহার খারাপ করা এক কথা,' রবিন বললো, 'আর সিংহের সংগে করা আরেক কথা। যেমন কর্ম তেমন ফলই হয়তো পেয়েছে।'

'সবই আমাদের অনুমান,' কিশোর বললো, 'শিওর হয়ে বলা যাচ্ছে না কিছুই। অন্য কোনো জানোয়ারের আক্রমণেও আহত হতে পারে...'

'গরিলা!' বাধা দিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ডিক।

'গরিলা? গরিলাও আছে নাকি এখানে?'

'ছিলো না। তবে দু'একদিনের মধ্যে আসার কথা ছিলো। হয়তো এসে গেছে, আমরা জানি না। এবং কোনোভাবে খাঁচা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হামলা চালিয়েছে প্রাইসের ওপর। হতেই পারে।'

হাত তুললো কিশোর। 'আবার সেই অনুমান। কোনোভাবে বেরিয়েছে বলছো। সেই কোনোভাবেটা কিভাবে? খাঁচায় তালা থাকে না?'

মাথা ঝাঁকালো ডিক, 'ঠিকই বলেছো। আসলে...আমিও বোধহয় ভিক্টরের মতো নার্ভাস হয়ে পড়ছি। গরিলার কথা চাচা বলেনি আমাকে। এলে নিশ্চয় জানতো, বলতোও; আর সত্যিই তো নতুন জীব এলে সেটার বেরোনো...যদি না...যদি না...'

'যদি না, কী?'

'যদি না কেউ খুলে দেয়। এমন কেউ, যে আমার চাচাকে দেখতে পারে না।'

আট

কাজ সেরে বিকেলেই ফিরে এলো রোরিস। তিন গোয়েন্দাকে গাড়িতে তুলে নিলো। চললো স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে। ডিককে কথা দিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা, খুব শিগগিরই আবার জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আসছে ওরা।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালালো ছেলেরা।

রবিন বললো, 'একজনের ওপরই বেশি সন্দেহ পড়ছে, টোন কিন। চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে, শোধ নেয়ার জন্যেই হয়তো এসব করছে। অঘটন ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। সিন লোকটাকে অবশ্য ভালো লাগেনি আমার। তবে তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। সে ক্ষতি করতে চাইবে কেন? শূটিঙে দেরি হলে, তারই ক্ষতি।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা। 'শুনেছি, কিছু কিছু কোম্পানির বাজেট খুব কম থাকে, সময়ও কম। তাছাড়া জাঙ্গল ল্যাণ্ডে যতো বেশি দিন শূটিং করবে, ততো বেশি ভাড়া গুণতে হবে। জেনেশুনে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে যাবে কেন সে? কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

'সঠিক কিছুই বলা যায় না এখন,' ধীরে ধীরে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কিন করে থাকতে পারে।'

'আসল কাজের কিন্তু কিছুই হলো না। আমরা গিয়েছিলাম একটা সিংহ কেন নার্ভাস হয়েছে, সে-ব্যাপারে তদন্ত করতে।'

'তা ঠিক। শুধু জেনেছি, কেউ ওকে ঘর থেকে ছেড়ে দিয়েছে। পা কেটেছে। তবে ওই কাটা কিছু প্রমাণ করে না। কিভাবে কেটেছে কে জানে!'

'আমার তো এখন মনে হচ্ছে, পশুচিকিৎসক দিয়ে হবে না। ওই সিংহের রোগ সারাতে হলে সাইকিয়াট্রিস্ট দরকার।'

চললো আলোচনা।

ইয়ার্ডে পৌছুলো গাড়ি।

নামলো ছেলেরা। হেডকোয়ার্টারের দিকে চললো। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো কিশোর। চোখে বিস্ময়। 'আরি, গেল কই!'

'কি গেল কই?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'লোহার শিকগুলো! সব বেচে দিয়েছে?'

ঘাড় চুলকালো রবিন, সে-ও অবাক। 'এতোগুলো মরচেপড়া শিকের দরকার হলো কার?'

'আল্লাহই জানে,' হাত নাড়লো মুসা। 'রাশেদ চাচার কপাল খুলেছে আরকি।'

মেরিচাচীকে আসতে দেখা গেল। কাছে এলে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'চাচী, শিকগুলো কোথায়?'

'নিয়ে গেছে,' হাসিমুখে বললেন মেরিচাচী। 'একটা লোক এসেছিলো। ট্রাক বোঝাই করে সব কিনে নিয়ে গেছে।'

'চাচা কই?'

'কাটতি দেখে আরও শিক আনতে গেছে। রোভারকে নিয়ে গেছে, বড় ট্রাকে করে।'

'লোকটা আরও শিক নেবে নাকি? বলেছে কিছু?'

'বলেনি, তবে যেরকম আগ্রহ দেখলাম, আরও নিতে এলেও অবাক হবো না।' তিনি কিশোরের উত্তেজিত শুকনো মুখের দিকে তাকালেন। 'এই, মুখচোখ এমন শুকনো কেনরে? খাসনি কিছু? স্যাণ্ডউইচ আছে, জলদি গিয়ে খেয়ে নে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। অফিস সামলাস।'

রান্নাঘর থেকে স্যাণ্ডউইচ আর ফ্রিজ থেকে কমলার রসের বোতল বের করে নিয়ে এসে অফিসে বসলো তিনজনে।

ইয়া বড় বড় গোটা পাঁচেক স্যাণ্ডউইচ শেষ করার আগে একটা কথাও বললো না মুসা। তারপর ঢকঢক করে দুই বোতল কমলার রস খেয়ে ঢেকুর তুললো, 'আহ্, বাঁচলাম। নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছিলো।...তা ভাই, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আবার কবে যাচ্ছি আমরা?'

'পারলে কালই,' বললো কিশোর। 'আজ তো কিছুই জানতে পারিনি, দেখিওনি

তেমন কিছু। অনেক কিছু দেখার আছে। রাতে রহস্যজনক কিছু ঘটে ওখানে। যে কারণে নার্ভাস হয়ে পড়ে সিংহটা।' রসটুকু শেষ করে বোতলটা ঠক করে নামিয়ে রাখলো টেবিলে। 'নানা কারণে অস্থির হয় জন্তুজানোয়ার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইঙ্গিত পেলে হয়…কিন্তু ঝড়-টরের তো নামগন্ধও নেই এখন। তাহলে কিসে নার্ভাস করলো?'

'আরও একটা ব্যাপার,' রবিন মনে করিয়ে দিলো। 'টোন কিন আমাদের সংগে অভিনয় করলো কেন? কেন বললো না সে উইলবার কলিনস নয়?'

'জানি না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো? সিংহটা কিন্তু আগে থেকেই গর্জন করছিলো। মানে কিনের সংগে আমাদের দেখা হওয়ার আগে থেকেই। এমনও তো হতে পারে, জখমটা কিন করেনি। নাহ্, গাধার মতো গিয়ে খামোখা ঘুরে এলাম। এরপর গেলে চোখকান খোলা রাখতে হবে। অনেকগুলো রহস্য জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

গেটের দিকে চোখ পড়তে মুসা বললো, 'কে জানি আসছে।'

বাদামী রঙের একটা স্যালুন গাড়ি ঢুকলো ইয়ার্ডে। অফিসের সামনে এসে থামলো। একজন লোক নামলো, মাথায় চুল খুব পাতলা। ইয়ার্ডের জঞ্জালের ওপর চোখ বোলালো। তারপর এগিয়ে গেল একদিকে। একটা জিনিস ধরে ভালোমতো দেখলো। সন্তুষ্ট হয়ে রেখে দিয়ে রুমালে হাতের ধুলো মুছে এগিয়ে এলো অফিসের দিকে।

দরজায় বেরিয়ে এসেছে কিশোর। পেছনে তার দুই সঙ্গী।

কোমর সরু, চওড়া কাঁধ লোকটার। পরনে বিজনেস সুট, গলায় বো-টাই। ফ্যাকাসে নীল চোখের তারা, অনেকটা কোদালের মতো চোয়াল—চেহারার সর্বনাশ করে দিয়েছে। মুসা তো মনে মনে নামই দিয়ে ফেললো, 'কোদালমুখো'।

'কিছু লোহার শিক দরকার,' বললো লোকটা। বলার ভঙ্গিতে কর্তৃত্ব, আদেশ দিতে অভ্যস্ত বোঝা যায়। 'মালিক কোথায়?'

'বাইরে গেছে, স্যার,' ভুখোর সেলসম্যানের মতো বিনীত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'আপনার যা যা দরকার, আমাকে বলতে পারেন। কিন্তু, শিক তো দিতে পারবো না, স্যার, নেই। সরি। য়া ছিলো সব বিক্রি হয়ে গেছে।'

'কে কিনেছে? কখন?'

'আজ সকালে। কে নিয়েছে, বলতে পারবো না, স্যার তখন ছিলাম না।'

'কেন, বিক্রির রেকর্ড রাখো না?'

'পুরনো মাল বিক্রির আর রেকর্ড কি রাখবো, স্যার? লোকে আসে, পছন্দ করে, দাম দিয়ে নিয়ে যায়। ব্যস। ঝামেলা শেষ।'

'আই সী,' হতাশ হয়ে আবার পুরনো লোহালক্কড়ের দিকে তাকালো লোকটা।

'ইয়ার্ডের মালিক আমার চাচা,' লোকটার হতাশা দেখে বললো কিশোর। 'আরও শিক আনতে গেছে। নামঠিকানা রেখে যান, এলেই আপনাকে খবর দেবো।'

কিশোরের কথা যেন শুনতেই পায়নি লোকটা, জঞ্জালের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বললো, 'এখন একটাও নেই? ছোটবড় যা হোক?'

'কি ধরনের জিনিস খুঁজছেন, স্যার, বুঝিয়ে বললে চেষ্টা করতে পারি। দেখি কিছু দিতে পারি কিনা।'

'ওগুলো কি?' হাত তুলে দেখালো লোকটা। 'জানোয়ারের খাঁচা? ওগুলোতে তো শিক আছে।'

'তা আছে। কিন্তু ওগুলো দিয়ে কি করবেন? দেখছেনই তো পুরনো, ভাঙা। মেরামত করতে সময় লাগবে...'

বাধা দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো লোকটা, 'ওই শিক হলেই চলবে আমার। কতো?', পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো লোকটা।

চোখ মিটমিট করলো কিশোর। 'শুধু শিক চাইছেন? আস্ত খাঁচা নয়?'

'না। কতো?'

চেহারা দেখেই বোঝা যায়, গভীর ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। 'সরি, স্যার। ওগুলো এখন বিক্রি হবে না। চাচা বলেছে, আগে মেরামত হবে, তারপর বেশি দামে বিক্রি করা হবে সার্কাস পার্টির কাছে।'

হাসলো লোকটা। 'বেশ তো। মেরামত করে যে দামে বিক্রি করবে, এখনই তা-ই নিয়ে নাও আমার কাছ থেকে।'

কিছু মনে করবেন না, স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি কি সার্কাসের লোক?'

'না হলে ক্ষতিটা কি?' বললো লোকটা। 'আমি খাঁচাগুলো চাইছি, তার জন্যে যা দাম লাগে দেবো। ব্যস, চুকে গেল। জলদি বলো, কতো দাম। তাড়া আছে আমার।'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খাঁচাগুলোর দিকে তাকালো কিশোর। চারটে। এতো ভাঙাচোরা, মেরামত করেও পুরোপুরি ঠিক করা যাবে কিনা সন্দেহ। 'এক হাজার ডলার, স্যার,' ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললো সে।

মানিব্যাগে শক্ত হলো লোকটার আঙুল। 'ওই জঞ্জালগুলোর দাম এক হাজার! ঠাট্টা করছো নাকি? আছে কিছু ওগুলোর, ভালো করে চেয়ে দেখো?'

পেছনে নড়েচড়ে উঠলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। ছোট্ট কাশি দিয়ে অহেতুক গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করলো মুসা। আসলে কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে।

ফিরেও তাকালো না কিশোর। 'সবগুলো এক হাজার নয়, স্যার,' বিনীত কণ্ঠস্বর, 'একেকটার দাম এক হাজার। তারমানে চারটের দাম চার হাজার।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লোকটা। মানিব্যাগটা ভরে রাখলো পকেটে। 'অযথাই তোমাকে বসিয়ে গেছে তোমার চাচা। ব্যবসার কিচ্ছু বোঝো না। চারটে নতুন খাঁচার দাম কতো, জানো?'

'তাহলে নতুনই কিনে নিলে পারেন, স্যার? ঠিক আছে, এক কাজ করেন, আপনি আবার আসেন একটু পরে! ততোক্ষণে চাচা হয়তো চলে আসবে।'

মাথা ঝাঁকালো লোকটা। আবার মানিব্যাগ বের করে একটা বিশ ডলারের কড়কড়ে নোট বেছে নিলো। কিশোরের নাকের কাছে ওটা নেড়ে বললো, 'এই যে, বড়জোর এই দিতে পারি। বিশ ডলার।'

দ্বিধা করছে কিশোর। পুরনো ভাঙা ওই খাঁচাগুলোর দাম বিশ ডলারের অনেক কম, জানে সে। দিয়ে দেবে নাকি? 'সরি। পারলাম না, স্যার।'

নয়

'ঠিক আছে, খোকা,' কঠিন, শীতল কণ্ঠে বললো কোদালমুখো, 'আমি আবার আসবো।'

গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

'করেছো কি, কিশোর?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'ওই জঞ্জালের দাম চার হাজার ডলার?' মুসাও চেঁচালো। 'বিশ ডলারই তো অনেক বেশি। শিওর, আজ রাশেদচাচার বকা খাবে তুমি।'

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'জানি। পাঁচ ডলারও লাগেনি চাচার কিনতে।'

'তাহলে?' রবিন বললো। 'লোকটাকে সুবিধের মনে হলো না। তাকে ওভাবে বিদেয় করে ভালো করোনি। নিরাশ হয়েছে খুব।'

'অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছিলো তো,' বললো কিশোর। 'তাই ভাবলাম, চাপ দিয়ে দেখিই না, কতোখানি ওঠে: কতোটা দরকার?'

'এখন তো জানলে,' বললো মুসা। 'বিশ ডলার। মেরিচাচী এসে শুনলে আজ রাতের খাওয়া বন্ধ করে দেবে তোমার।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে অফিসে ফিরে এসে বসলো কিশোর। 'দেখা যাক কি হয়।'

আবার এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। ইয়ার্ডের ট্রাকে ফিরে এসেছেন রাশেদ পাশা। খালি ট্রাক। শিক, খাঁচা কিচ্ছু নেই পেছনে।

অফিস থেকে বেরোলো ছেলেরা।

'কি ব্যাপার, চাচা,' জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কিচ্ছু পাওনি?'

লম্বা গোঁফের ডগা টানলেন রাশেদ পাশা। পাইপটা দাঁতে কামড়ে ধরে রেখে বললেন, 'নাহ্। পুরনো শিকের জন্যে যেন পাগল হয়ে উঠেছে লোকে। যা ছিলো, তখন দেখে এসেছিলাম, সব নিয়ে গেছে। একটাও নেই।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। 'আমাদের এখানে যা ছিলো, তা–ও সব বেচা শেষ। এইমাত্র আরেকজন কাস্টোমার গেল।'

'তাই নাকি? ভুলই করে ফেলেছি। তখনই সব নিয়ে আসা উচিত ছিলো।'

অস্বস্তিভরে পা নাড়লো কিশোর, এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করলো। 'চাচা, লোকটা ওই খাঁচাগুলো চাইছিলো। কেনার জন্যে খুব চাপাচাপি করলো।'

ভাতিজার মুখের দিকে তাকালেন চাচা। 'ওই ভাঙা খাঁচা? কতো দাম বললো?'

'বিশ ডলার।'

'বিশ ডলার?' গম্ভীর হলেন রাশেদ পাশা। 'দিলি না কেন?'

'বললাম, অনেক কম দাম বলেছে।'

ফকফক করে ধোঁয়া ছাড়লেন চাচা। 'তুই কতো চেয়েছিলি?'

লম্বা দম নিলো কিশোর। 'এক হাজার ডলার।' বোম ফাটার আশায় চুপ রইলো এক মুহূর্ত। কিন্তু জবাবে বেরোলো আরও কিছু ধোঁয়া। 'একেকটার জন্যে এক হাজার। চারটের জন্যে চার হাজার।'

দাঁত থেকে পাইপ হাতে নিলেন রাশেদ পাশা। বকা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে কিশোর, এই সময় গেটে আবার শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। বাদামী স্যালুনটা ফিরে এসেছে।

'ওই যে, ওই লোক,' বললো কিশোর।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলো কোদালমুখো। রাশেদ পাশাকে বললো, 'আপনি ইয়ার্ডের মালিক?'

'হ্যাঁ,' বললেন চাচা।

'আমার নাম ডেইমিং।' আঙুল দিয়ে বাতাসে খোঁচা মেরে কিশোরকে দেখালো সে, 'ওটাকে বসিয়ে গিয়েছিলেন কেন? কিচ্ছু জানে না। কয়েকটা পুরনো খাঁচার জন্যে ও আমাকে জবাই করতে চেয়েছিলো।'

'তাই নাকি? সরি।'

হাসি ফুটলো কোদালমুখোর মুখে। 'আমি জানতাম, তা–ই বলবেন আপনি।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বিশ ডলারের একটা নোট দিলো। 'ওকে দিতে চেয়েছিলাম, নিলো না।'

খাঁচাগুলোর দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'আপনি তো চাইছেন শিক, তাই না?

ওগুলো খাঁচা।'

'খাঁচা থেকেই খুলে নেবো,' অধৈর্য হয়ে বললো ডেইমিং। শিক দিয়েই খাঁচা বানানো হয়। এই যে নিন, বিশ ডলার।'

নিভে যাওয়া পাইপ ধরালেন রাশেদ পাশা। জোরে জোরে টেনে ধোঁয়া ছাড়লেন।

অপেক্ষা করছে কিশোর।

উসখুস করছে লোকটা।

'সরি, মিস্টার,' অবশেষে বললেন রাশেদ পাশা, 'আমার ভাতিজা দাম চেয়ে ভুল করে ফেলেছে। খাঁচাগুলো সার্কাস পার্টির কাছে বেচবো আমি। আর কারো কাছে নয়।'

স্তব্ধ হয়ে চাচার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

হাঁ হয়ে গেছে রবিন আর মুসা।

'সার্কাস পার্টি?' ভুরু কোঁচকালো লোকটা।

'হ্যাঁ। ওগুলো জানোয়ারের খাঁচা। মেরামত করে সার্কাস পার্টির কাছে বেচবো। ছেলেমানুষ তো, ভুল করে ফেলেছে।'

'ভুল মানে! কতো দাম চেয়েছে একেকটার জানেন? এক হাজার ডলার।'

'হ্যাঁ, বলেছে।'

হাসলো ডেইমিং। 'আপনার ভালো দামে বিক্রি হওয়া দিয়ে কথা। সার্কাস পার্টির কাছেই বেচুন, আর যার কাছেই বেচুন। আমি কি কম দিচ্ছি?'

'আসলে,' আবার ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ পাশা, 'সার্কাসের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে আমার। তাছাড়া বললামই তো, ভাতিজা কম চেয়ে ফেলেছে। একেকটা খাঁচার দাম হওয়া উচিত দেড় হাজার ডলার। তারমানে চারটের দাম ছয় হাজার।'

পাথর হয়ে গেল যেন লোকটা। ইয়ার্ডের মালিকের মুখে কোনোরকম রসিকতার ভাব দেখতে পেলো না। নীরবে পাইপ টেনে চলেছেন, নিয়মিত ধোঁয়া ছাড়ছেন। কেউ কিছু বলছে না, পিনপতন নীরবতা। ভালো জমেছে নাটক।

এই সময় বেরসিকের মতো সেখানে এসে হাজির হলো রোভার, 'বস, ওখানে জঞ্জাল জমে আছে। সাফ করে ফেলবো?'

বিশালদেহী রোভারকে দেখলো এক পলক কোদালমুখো, আরও শীতল হলো চাহনি। 'ঠিক আছে, মিস্টার,' খসখসে কণ্ঠে বললো সে, 'আপনার জিনিস, আপনি যতো খুশি দামে বেচুন। আমার টাকার দাম আমার কাছে।'

চলে গেল বাদামী সুন্যান।

কিশোরের ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে চাচাকে।

মিনিট কয়েক পর।

হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকেছে তিন গোয়েন্দা।

'রাশেদচাচা কাণ্ডটা করলো কি।' টুলে বসতে বসতে বললো রবিন।

'ছয় হাজার ডলার!' মুসা বললো।

'আমিও অবাক হয়েছি,' মাথা দুলিয়ে বললো কিশোর। 'কি জানি কেন করেছে। সার্কাসকে ভালোবাসেতো। তাই হয়তো লাভের কথা ভাবেনি। পনেরো ডলার নাহয় গেলই। তার পছন্দের জায়গায় বিনে পয়সায়ই হয়তো দান করে দেবে।'

'কিন্তু হঠাৎ করে লোহার শিক আর খাঁচার জন্যে খেপে উঠলো কেন লোকে?' রবিনের প্রশ্ন।

মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কিশোর, এই সময় বাজলো টেলিফোন।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকালো কিশোর। লাইনের সংগে লাগানো স্পীকারের সুইচ অন করে দিলো। 'হ্যালো। কিশোর পাশা।'

'কিশোর,' বেজে উঠলো স্পীকারে, 'আমি। আমি ডিক কলিনস। আজ রাতে আসতে পারবে?'

'আজই? ঠিক বলতে পারছি না। এতো তাড়াহুড়ো কেন? কিছু হয়েছে?'

'না। ভাবলাম, গরিলাটা এসেছে তো, তোমরা হয়তো দেখতে চাইবে।'

'তাই নাকি? খুব বড়?'

হাসলো ডিক। 'অনেক বড়। সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের। ঘরেই রাখতে চাইছি। কিন্তু ওখানে তো ভিকটরও থাকবে। তার তো আবার মেজাজ খারাপ। কি করে বসে কে জানে।'

'হ্যাঁ। অন্ধকারে তো আবার নার্ভাস হয়ে যায় সিংহটা।'

'এইই সুযোগ তোমাদের জন্যে। এলে আজ রাতেই হয়তো জানতে পারবে কেন হয়।'

'দেখি, চেষ্টা করবো। গাড়ি যদি পাই।'

'কেন, তোমাদের গাড়িই তো আছে।'

'রাতে পাওয়া যাবে না। আই মীন, ড্রাইভার পাওয়া যাবে না। দিনে খাটে বোরিস আর রোভার, মানে, আমাদের কর্মচারীরা। রাতে ওদের কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। দেখি, রোলস রয়েসটা জোগাড় করতে পারি কিনা।'

'রোলস রয়েস!'

'হ্যাঁ, সংগে শোফারও আছে। গাড়ি পেলে আজ রাতেই আসবো। তুমি কোথায় থাকবে?'

রাত ন'টায় জাঙ্গল ল্যাণ্ডের গেটে পৌঁছলো রোলস রয়েস।

জানালা দিয়ে মুখ বের করলো কিশোর। 'এখানেই তো ডিকের থাকার কথা।'

গেটের ওপরে উজ্জ্বল একটা আলো আশপাশের অনেকখানি জায়গা আলোকিত করে রেখেছে। তার পরে পুরো বনভূমি অন্ধকার। রাতের বাতাসে সড়সড় করছে পাম গাছের পাতা। ভেসে আসছে বিচিত্র কিচিরমিচির।

গাড়ি থেকে নেমে গেটের পাল্লা খুলে দিলো মুসা। রোলস রয়েস ভেতরে ঢুকলে পাল্লা আবার বন্ধ করে দিয়ে এসে উঠে বসলো। 'কেমন জানি জায়গাটা!' নিচু কণ্ঠে বললো সে। 'গা ছমছম করে।'

পথ আর জায়গা চিনে রাখার ব্যাপারে মুসা ওস্তাদ। একবার যেখান দিয়ে যায়; সহজে ভোলে না। অন্ধকারেও চিনে ফেলে কি করে যেন, তার এই ক্ষমতা অনেক সময় কিশোর পাশাকেও বিস্মিত করেছে। পথ দেখালো এখন মুসা। ড্রাইভ করে চললো হ্যানসন।

বড় শাদা বাড়িটা দেখা যেতেই শোফারের কাঁধে হাত রাখলো মুসা, 'এক মিনিট।'

ভুরু তুললো কিশোর। 'কি ব্যাপার, মুসা?'

'চিৎকার শুনলাম মনে হলো।'

চুপ করে বসে কান পেতে রয়েছে ওরা। খানিক পরেই বনের ভেতর থেকে শোনা গেল শব্দ। তারপর, দূরে শোনা গেল সাইরেনের তীক্ষ্ণ বিলাপের মতো শব্দ।

হাত তুলে বললো রবিন, 'দেখো দেখো, সার্চলাইট!'

সবাই দেখলো, অন্ধকার আকাশে বাঁকা রেখা সৃষ্টি করে সরে যাচ্ছে সার্চলাইটের তীব্র নীলচে-শাদা আলোকরশ্মি। সামনে ঝোপঝাড়ের ভেতরে শোনা গেল দুপদাপ শব্দ। ভারি নিঃশ্বাস, হাঁপাচ্ছে কেউ। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি। রোলস রয়েসের হেডলাইটের আলোর সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট।

'টোম কিন!' চেঁচিয়ে বললো রবিন।

'কিসে তাড়া করেছে!' মুসা বললো। 'ব্যাপারটা কি?'

হুড়মুড় করে পথের অন্যপাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো লোকটা। ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল তার ছুটে চলার আওয়াজ।

সামনে রাগান্বিত চিৎকার শোনা গেল। টর্চের আলো দেখা গেল।

'কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে,' আন্দাজ করলো রবিন।

'চলো তো দেখি,' কিশোর বললো।

গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলো তিন গোয়েন্দা।

তাদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলো কেউ।

ফিরে চাইলো কিশোর। দ্বিধা করছে।

একটা টর্চের আলো নেচে উঠলো। 'কিশোর, আমি। ডিক।'

কাছে গেল তিন গোয়েন্দা।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ডিক। তার পেছনে আরও কয়েকজন, টর্চ হাতে কি যেন খোঁজাখুজি করছে। এদিক ওদিক আলো ফেলছে। গাছের ডালেও ফেলছে কেউ কেউ। কয়েকজনের হাতে রাইফেল।

'হয়েছে কি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'আবার পালিয়েছে ভিকটর?'

'না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিক। 'তার চেয়েও বড় বিপদ।'

'কী?' অধৈর্য কণ্ঠে বললো রবিন। 'হাতে রাইফেল কেন ওদের? টোল কিনকে খুঁজছে?'

'কে?'

'টোল কিন,' জবাব দিলো মুসা। 'এই তো, এইমাত্র দেখলাম ওকে। এদিক থেকে বেরিয়ে ওদিকে ঢুকে পড়েছে।'

'তা-ই বল!' গম্ভীর হলো ডিক। 'আমি এটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কিসের সন্দেহ?' রবিন আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'কি হচ্ছে এখানে?'

'গরিলা। খাঁচা থেকে পালিয়েছে।'

'কখন?' জানতে চাইলো মুসা। ভয়ে ভয়ে তাকালো এদিক ওদিক। 'তারমানে এই বনে এখন একটা বুনো গরিলা ছাড়া রয়েছে!'

'খানিক আগের ঘটনা। ডাক্তার হ্যানোয়েল তখন মাত্র ভিকটরকে নিয়ে এসেছেন বাড়িতে।'

'একটা বুনো গরিলা, আর একটা নার্ভাস সিংহ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'ডিক, এমনও তো হতে পারে, গরিলাটাকে দেখে রাগারাগি করেছে ভিকটর। গর্জন করেছে। তাতে ভয় পেয়ে খাঁচার দরজা খুলে পালিয়েছে গরিলাটা।'

'দরজা খোলেনি।'

'তাহলে?'

'কেউ শিক খুলে দিয়েছে,' এক মুহূর্ত চুপ রইলো ডিক। তিক্তকণ্ঠে বললো, 'টোল কিন ছাড়া আর কেউ না, আমি শিওর।'

দশ

মাথা নাড়লো কিশোর। 'সে না-ও হতে পারে। অনেক কারণেই বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে টোল কিন। ও-ই করেছে, প্রমাণ করতে পারবে?...খাঁচাটা

একবার দেখা যায়? হয়তো কোনো সূত্র–টুত্র…'

'এসো,' পা বাড়াতে গিয়েও থামলো ডিক। 'রোলস রয়েসের কথা বললে। গাড়িটা কোথায়?'

'পাহাড়ের গোড়ায়,' জবাব দিলো রবিন। 'অসুবিধে নেই। শোফার আছে। গাড়িতেই বসে থাকবে।'

বাড়ির পাশের একটা খোলা জায়গায় ছেলেদের নিয়ে এলো ডিক। প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলছে। আলোকিত হয়ে আছে আশপাশের এলাকা। বড়, শূন্য খাঁচাটা দেখালো ডিক। 'তোমরা আজ বিকেলে যাওয়ার পর এসেছে। দুটো খাঁচা এসেছে এবার…'

'দুটো খাঁচা?' কিশোরের প্রশ্ন।

পেছনে চাপা একটা গর্জন হতেই চমকে ফিরে তাকালো সে। রবিন আর মুসাও ফিরেছে।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কি ওটা?'

বাড়ির কোণে টর্চের আলো ফেললো ডিক। 'দারুণ দেখতে। না?'

মাত্র বিশ ফুট দূরে রয়েছে জীবটা। ওরা ওটার দিকে এগোতেই গররর করে উঠলো।

'কালো প্যান্থার,' বললো ডিক। 'চিতাবাঘ।'

মোটা লোহার শিকে তৈরি খাঁচার ভেতর থেকে জ্বলন্ত হলুদ চোখে ওদের দেখছে চিতাবাঘ। ওরা আরও এগোতেই হিসিয়ে উঠলো। মুখ হাঁ করতে দেখা গেল ঝকঝকে শাদা ভয়াল শ্বদন্ত।

'আরিব্বাপরে! পেশী দেখেছো!' মুগ্ধ চোখে জানোয়ারটাকে দেখছে মুসা। 'আমাজানের জঙ্গলে আমরা যে জাগুয়ারটাকে ধরেছিলাম. [illegible]রে [illegible]য় কম না।'

মুসার কথার জবাবেই যেন গর্জে উঠে খাঁচার শিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো চিতাটা। ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

'এটা জাগুয়ার নয়,' জানালো ডিক। 'প্যান্থার, খাঁটি চিতাবাঘ। আফ্রিকান।'

অস্থিরভাবে খাঁচার ভেতরে পায়চারি শুরু করলো চিতাবাঘ।

'মেজাজ খুব খারাপ মনে হচ্ছে।' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকালো রবিন। 'কিশোর, তোমার কি মনে হয়?'

কিশোর চেয়ে আছে আরেকদিকে, শূন্য খাঁচাটা দেখছে, যেটাতে গরিলা ছিলো। এগিয়ে গেল ওটার কাছে। ভালোমতো দেখে সোজা হলো। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোলো মুখ থেকে।

'কি ব্যাপার, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'খাঁচায় গোলমাল,' ঘোষণা করলো কিশোর। 'ডিক ঠিকই বলেছে কেউ

গরিলাটাকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

'কি করে বুঝলে?' এগিয়ে এলো মুসা।

খাঁচার একধার দেখালো কিশোর। 'দেখেছো? একটা শিক খুলে নেয়া হয়েছে। পাশের দুটো বাঁকানো। প্রতি দুটো শিকের মাঝে ফাঁক ছয় ইঞ্চি। একটা কেউ খুলে নিয়েছে। ফাঁক বেশি হয়ে যাওয়ায় অন্য দুটোতে চাপ দেয়ার সুযোগ পেয়েছে গরিলাটা। ফাঁক করে বেরিয়ে গেছে। ডিক, গরিলাটা কতো বড়?'

'বয়েস বেশি না, তবে গায়েগতরে বড়ই। প্রায় আমাদের সমান।'

'হুঁ। তারমানে দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে গায়ের জোর বেশি। আনা হয়েছে কোত্থেকে?'

'মধ্য আফ্রিকার রুয়াণ্ডা। অনেকদিন থেকেই আশায় ছিলাম, একটা গরিলা পাবো। সিলভার চাচাও অনেক চেষ্টা করেছে। কঙ্গো, উগাণ্ডা রুয়াণ্ডায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। শেষে রুয়াণ্ডা থেকে চিঠি লিখেছে আমাদেরকে, একটা গরিলা পাওয়া গেছে, তবে ওদেশ থেকে বের করার অসুবিধে। সরকারী বিধিনিষেধ। ওদের বোঝাতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে চাচাকে।'

'গরিলা তো অনেক জাতের আছে,' রবিন বললো। 'তোমাদের এটা কোন জাতের?'

'পাহাড়ী,' অন্ধকার থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠ। আলোয় এলেন উইলবার কলিনস। 'কম বয়েসী, মর্দ্দা।'

'পাওয়া গেছে?' জানতে চাইলো ডিক।

মাথা নাড়লেন কলিনস। ক্লান্ত, মুখে ধুলোময়লা লেগেছে। 'মনে হয় খাদের ওদিকে চলে গেছে। গিয়ে দেখা দরকার।'

'জন প্রাইসের কি খবর?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। ভিকটরই মেরেছে ওকে?'

হাসলেন কলিনস। 'না। পাহাড় থেকে পিছলে পড়েছে। অযথাই আমাকে চাপ দিতে এসেছিলো সিন। হারামী লোক। এক ঝামেলা থেকে রেহাই পেলাম, এখন আরেক ঝামেলায় পড়েছি।'

দূরে হৈ-চৈ শোনা গেল।

'যাই, গিয়ে দেখি,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন কলিনস। 'খারাপ কিছু ঘটানোর আগেই গরিলাটাকে ধরা দরকার।'

'কাজটা বিপজ্জনক, না?' মুসা বললো।

'কিছুটা তো বটেই,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

একটা হুড খোলা জীপ এসে থামলো। ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন ডাক্তার হ্যালোয়েন। কলিনস উঠে বসতেই আবার চলতে শুরু করলো জীপ।

মলিন হাসি হাসলো ডিক। 'ওই এক ডাক্তার। জন্তুজানোয়ারের পাগল।'

'এতোই যদি পাগল হবে,' মুসা ফস করে বলে ফেললো, 'গাড়িতে রাইফেল কেন?'

'ওটা রাইফেল না, স্টান গান। ডার্ট ছোঁড়ে, বুলেট নয়। বিশেষ ধরনের ডার্ট, ভেতরটা ফাঁপা, তাতে ঘুমের ওষুধ ভরা থাকে। রক্তে মিশলে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে জানোয়ার। ধরা সহজ হয় তখন।'

'ওঁরা গিয়ে গরিলা ধরুক,' কিশোর বললো। 'আমরা ততোক্ষণ আশপাশটা ঘুরে দেখি। জানোয়ারগুলো ছাড়া পায় কিভাবে, বোঝা দরকার। প্রথমে পালালো ভিকটর, তারপর এখন এই গরিলা।'

'ভিকটর এখন ভালো আছে,' ডিক জানালো। 'বাড়ির ভেতরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তার। কাল সকালে শুটিঙে যেতে পারবে সিংহটা।'

চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। 'ভিকটরেরও খাঁচা আছে নাকি?'

'না। এক মাস আগেই ওর খাঁচা ফেলে দিয়েছি। এখন ঘরের ভেতরে চাচা আর আমার সংগে ঘুমায়। ওর নিজের ঘর আছে। কিন্তু আমাদের সংগে থাকতেই ভালোবাসে।'

আলোকিত বাড়িটার দিকে তাকালো কিশোর। 'একবার তো ছেড়ে দিয়েছে। আবার যদি দেয়?'

পকেট থেকে চাবি বের করলো ডিক। দেখালো। 'তালার ব্যবস্থা করেছি। শুধু দুটো চাবি, একটা চাচার কাছে, একটা আমার।'

'ডিক, তুমি বলেছো, রাতে অস্থির হয়ে ওঠে ভিকটর। এসো না, বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখি। কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

রাজি হলো ডিক। একটা টিলার ওপরের বন পরিষ্কার করে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। মূল বাড়ি থেকে খানিক দূরে একটা ছাউনি, তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আর জ্বালানী কাঠ রাখা হয়। ইচ্ছে করলে গাড়িও রাখা যায় ওখানে, কিন্তু গাড়ি বাইরেই রাখেন কলিনস। টিলা থেকে উত্তর দিকে নেমে গিয়ে অন্য পথের সংগে মিশেছে একটা পথ।

শান্ত নিথর রাত। খানিক আগে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। চাঁদ উঠেছে। ঝকঝকে আকাশ, এক রত্তি মেঘ নেই।

পুরো বাড়িটা এক চক্কর ঘুরলো ওরা। ফিরে এলো আবার খাঁচাগুলোর কাছে। শূন্যই রয়েছে গরিলার খাঁচা। চিতাটা শুয়েছে বটে, ছেলেদের দেখে আবার সতর্ক হয়ে উঠলো। লেজ আছড়াতে শুরু করলো এপাশ ওপাশ।

'চলো, অন্য জায়গা দেখি,' প্রস্তাব দিলো কিশোর।

ডিককে অনুসরণ করে ঢালু পথ বেয়ে নামতে লাগলো তিন গোয়েন্দা। হাঁটতে হাঁটতে জানালো, জাঙ্গল ল্যাণ্ডের কোথায় কি আছে।

'কতো বড়?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'আমার তো মনে হচ্ছে, এতো বেশি বড়, কোথায় কি ঘটছে বোঝাই মুশকিল তোমাদের জন্যে।'

'একশো একরের মতো,' বললো ডিক 'বড় এলাকা, ঠিকই বলেছো। তবে খোঁজ রাখতে, কই, আমাদের তেমন অসুবিধে হয় না।'

'কোন জায়গায় শূটিং করে সিন?'

'উত্তরে। এখান থেকে গাড়িতে পাঁচ মিনিটের পথ। এখন আমরা যাচ্ছি পুবে। আরেকটু পরেই আমাদের সীমানা শেষ।'

দুই ধারে ঝোপঝাড়, পাথর, বড় বড় গাছ। কোথাও মাথার ওপরে ডালপাতার চাঁদোয়া সৃষ্টি হয়েছে, ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে জ্যোৎস্না।

'তোমার চাচা যে খাদের কথা বললো, কোথায় ওটা? উত্তরে গেলেন বলেই তো মনে হলো।'

'হ্যাঁ। তবে কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে আরেকটা পথ পড়বে। উত্তর-পশ্চিমে গেছে। পনেরো মিনিটের পথ, তারপরে পাওয়া যাবে গিরিখাত। ওখানে কয়েক একর জমি আছে আমাদের। আফ্রিকান বন তৈরি করা হয়েছে ওখানে। হাতিগুলো ওখানেই থাকে।...ওই যে, ডাক শুনতে পাচ্ছো?'

জাঙ্গল ল্যাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে গেল ডিক, 'পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে টুরিস্ট সেকশন। আমাদের প্রধান আকর্ষণ আফ্রিকা আর জন্তুজানোয়ার, তবে বুনো পশ্চিমও পছন্দ অনেক দর্শকের। তাই ওদিকে একটা কৃত্রিম পশ্চিমা সীমান্ত-শহর তৈরি করেছি, নকল একটা গোরস্থান আছে, একটা গোস্ট টাউন আছে। এমনকি পুরনো দিনের ঘোড়ার গাড়িও আছে একটা, তাতে বাচ্চারা চড়ে।

'দক্ষিণে রয়েছে ঢোকার পথ, যেদিক দিয়ে এসেছো তোমরা। জঙ্গল বেশি ওদিকেই। মাঝখানে রয়েছে হ্রদটা, আর তারপরে, যেখানে সিন শূটিং করছে সেখানে রয়েছে আরও জঙ্গল। উত্তরে, শেষ মাথায় পাহাড়ের সারি। উঁচু উঁচু চূড়া আছে। আমাদের এখানে সিনেমার যতো শূটিং হয়, তার বেশির ভাগই হয় ওখানে। চূড়া থেকে নিচে ডাইভ দিয়ে পড়ে অভিনেতারা। ডাক্তারের ডিসপেনসারিও ওদিকেই।'

হঠাৎ পাখি আর বানর চেঁচামেচি জুড়ে দিলো। থমকে গেল তিন গোয়েন্দা। ডিকের দিকে তাকালো।

'ও কিছু না,' বললো ডিক। 'প্রহর ঘোষণা করছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। নানারকম জন্তুজানোয়ার আছে আমাদের। সাপও আছে অনেক রকম। ওগুলোকে অবশ্য কড়া পাহারায় রাখতে হয়। খাঁচা থেকে ছাড়ি না। জঙ্গলে একবার ঢুকে গেলে আর খুঁজে বের

করা যাবে না।'

ডিকের কথা কিশোরের কানে যাচ্ছে বলে মনে হলো না। হঠাৎ পেছনে ফিরে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বাড়িটা থেকে কতো দূরে এসেছি?'

'পাঁচশো গজ হবে। আরেকটু পরেই ঢালের শেষে বেড়া…'

'এই, চুপ!' দাঁড়িয়ে গেছে মুসা। 'কিসের শব্দ?'

সবাই শুনতে পাচ্ছে। ভোঁতা, অদ্ভুত একটা আওয়াজ। বাড়ছে শব্দটা। অনেকটা হাড় চিবানোর শব্দের মতো। তার সংগে যোগ হলো সাইরেনের মতো শব্দ, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হলো, বাড়ছে।

'আমার ভাল্লাগছে না,' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'চলো ফিরে যাই…'

কিশোরের কৌতূহল বেড়েছে। 'শব্দটা কিসের…'

কথা শেষ করতে পারলো না। তার আগেই শতগুণ বেড়ে গেল শব্দ। নানাধরনের শব্দের মিশ্রণ, বিশেষ কিছুর সাথে তুলনা করা কঠিন।

'চলো, পালাই!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

ওদেরকে অবাক করে দিয়ে নীরব হাসিতে ফেটে পড়লো ডিক।

'তুমি হাসছো!'

'হাসবো না? যা ভয় পেয়েছো। ওটা তো মেটাল শ্রেডার।'

এগারো

কমে এলো তীক্ষ্ণ শব্দ, হালকা শিস দিয়ে থেমে গেল। সাইরেনের মতোই।

'মেটাল শ্রেডার?' আনমনে বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

গাছপালার ভেতর দিয়ে একদিকে দেখালো ডিক, 'হ্যাঁ, কিশোর। বেড়ার ওধারে। আমাদের সীমানার বাইরে। একটা স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে। লোহালক্কড়ের জঞ্জাল। বেশির ভাগই পুরনো বাতিল গাড়ির বডি।'

'ওই শ্রেডার দিয়ে কি করে?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'লোককে ভয় দেখায়?'

'ওটা একধরনের মেশিন। গাড়ির শরীর কেটে টুকরো টুকরো করে। ধাতু থেকে ধাতুকে আলাদা করে। এই যেমন ধরো, গাড়ির বডিতে কতো রকমের ধাতুই থাকে, পিতল, লোহা, ইস্পাত…সব আলাদা আলাদা করে ফেলে। ওই ধাতুকে আবার নতুন করে কাজে লাগানো হয়।'

'মারছে!' হউফ করে নিঃশ্বাস ছাড়লো সহকারী গোয়েন্দা। 'চেনে কিভাবে? মানুষের ব্রেন লাগানো আছে নাকি?'

'অনেকটা ওরকমই। কম্পিউটার সিসটেম আছে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। হাতঘড়ির দিকে তাকালো। 'সাড়ে ন'টা। ডিক, ভিকটর কি এই সময়টাতেই নার্ভাস হয়?'

'আগেও হয়, পরেও হয়। ঠিক সময় বলতে পারবো না। অতোটা খেয়াল করে দেখিনি। তবে হয় অন্ধকার হওয়ার পরে।'

'সব সময় রাতে? দিনে কখনও না?'

'না।'

'কি ভাবছো, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলো রবিন। 'ভাবছো, ওই মেটাল শ্রেডারের শব্দে নার্ভাস হয় সিংহটা?'

'শব্দ মানুষের চেয়ে জন্তুজানোয়ারকে অস্থির করে বেশি। হয়তো ভিকটর ওই শব্দ সইতে পারে না।'

'কিন্তু শুধু রাতে কেন?' যুক্তি দেখালো মুসা। 'দিনেও তো হয় শব্দ। তখন নার্ভাস হয় না কেন?'

'ভালো পয়েন্ট ধরেছো, সেকেণ্ড,' বললো কিশোর। 'ডিক ওই যন্ত্রটা দিনে চলে না?'

'মাঝেসাঝে। তবে সঠিক বলতে পারবো না। আমাদের বাড়ি থেকে আওয়াজ ততোটা শোনা যায় না তো…'

'হুম্‌ম্‌।' মাথা ঝোঁকালো গোয়েন্দাপ্রধান। 'মেশিনটা বসেছে কদ্দিন?'

'নতুন। ইয়ার্ডটা অবশ্য পুরনো, কয়েক বছর ধরে আছে। শ্রেডারটা এসেছে মাসখানেক হলো।'

'এক মাস। তা ভিকটরের রোগটা শুরু হয়েছে কবে থেকে?'

'দু'-তিন মাস হবে। শুরুতে তেমন বেশি ছিলো না। তার অস্থিরতা বেড়েছে গত এক হপ্তায়।'

'তারমানে,' রবিন বললো, 'মেটাল শ্রেডার আসার আগেই তার রোগ হয়েছে।'

চিন্তিত মনে হচ্ছে কিশোরকে। 'তাহলে হয়তো বন্ধ জায়গা পছন্দ করতে পারছে না ভিকটর, মানে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকাটা। কিংবা অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে।'

'সিনেমায় অভিনয়ের জন্যেও হতে পারে,' রসিকতা করে বললো মুসা। 'অনেক অভিনেতার হয় ওরকম। পরদিন শূটিং থাকলে আগের রাতে উত্তেজনায় ঘুমাতে পারে না। বাবার কাছে শুনেছি।'

'তা হয়,' বললো কিশোর। 'কিন্তু সেটা মানুষের বেলায়, সংলাপ মুখস্থ করতে হয় বলে। আরও নানা কারণ থাকে। সিংহের সে-সব ভাবনা নেই।' ডিকের দিকে ফিরলো। 'আচ্ছা, সিন এখানে এসেছে কতোদিন হলো?'

'মাস দুই হবে। মাস দেড়েক কাটিয়েছে লোকেশন সিলেকশন আর এটা ওটা করে। শূটিং শুরু করেছে এই হপ্তা দুই আগে থেকে।'

'রাতেও শূটিং করে?'

'করে মাঝে মাঝে।'

'মেটাল শ্রেডারের শব্দে অসুবিধে হয় না? মানে, ডায়লগ রেকর্ড করার সময় মাইকে ঢুকে যায় না ওই বিকট শব্দ।'

'তা হয়তো যায়। জানি না।'

'না, যায় না,' মুসা বললো। 'অনেক সময় শূটিং আগে হয়ে যায়। শব্দ, এমনকি ডায়লগও পরে যোগ করা হয়। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'তা ঠিক। ডিক, অভিনেতা আর টেকনিশিয়ানরা থাকে কোথায়? শ্রমিকও তো আছে। তারা?'

'রাতে শূটিং না থাকলে প্রায় সবাই যার যার বাড়ি চলে যায়।'

'কারা কারা থাকে?'

'সিন। তার নিজের ট্রেলার আছে। আর থাকে অভিনেতা জন প্রাইস, আর অভিনেত্রী অ্যানি ফিশার। তাদেরও ট্রেলার আছে। সারা রাতই গেট খোলা থাকে। কে কখন আসে যায়, কি করে, এতোশতো খোঁজখবর রাখি না আমরা। রাখার প্রয়োজনও পড়ে না।'

'এমনও তো হতে পারে, ওই তিনজন ছাড়াও আরও কেউ থেকে যায় ভেতরে। রাতে এসে ঘুরঘুর করে তোমাদের বাড়ির আশপাশে। পারে না? তাতেই হয়তো চঞ্চল হয় ভিকটর।'

'কেন এরকম করবে কেউ, কিশোর?' কথাটা ধরলো রবিন।

'কেন করবে, সেটা এখন বলতে পারছি না। তবে করতেও তো পারে।'

'চলো, আরো ঘুরে দেখাই,' বললো ডিক। 'বেড়ার ধার দিয়ে আরেকদিকে চলে যাবো। এসো।'

ওরা বেড়ার কাছাকাছি আসতেই আবার শুরু হলো সেই অদ্ভুত বিকট শব্দ। ধাতু চিবিয়ে খাচ্ছে যেন কোন ভয়াল দানব।

'কি আওয়াজরে বাবা!' কানে আঙুল দিলো রনি। 'এরপর এলে সংগে তুলো নিয়ে আসবো। তোমাদের সব জানোয়ারই যে নার্ভাস হয়নি এটাই আশ্চর্য।'

বেড়ার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। লোহার খুঁটি একটু পর পর পুঁতে তার গায়ে তারের জাল লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বেড়া। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। 'কদ্দুর পর্যন্ত আছে বেড়াটা?'

'উত্তরে চলে গেছে, একেবারে ইয়ার্ডের শেষ মাথা পর্যন্ত,' জানালো ডিক।

'তারপরে বড় একটা ড্রেনমতো আছে। সব জায়গায়ই বেড়াটা ছয় ফুট উঁচু, এখানে যেমন দেখছো। খুব শক্ত। কোনো জানোয়ার ভেঙে ওপাশে যেতে পারবে না।'

বেড়ার ধার ধরে উত্তরে এগোলো ছেলেরা। তারপর সরে এলো পাহাড়ের দিকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মুসা।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

হাত তুলে দেখালো একদিকে মুসা। ফিসফিসিয়ে বললো, 'কি যেন শুনলাম?'

শ্রেডারের চিৎকার থেমে গেছে।

কান পাতলো অন্যেরাও।

'কই, কোথায়?' বললো কিশোর। 'আমি তো কিছু শুনছি না।'

আবার হাত তুলে দেখালো মুসা। 'ওদিকে।'

এইবার শুনতে পেলো সবাই। লম্বা ঘাসে ঘষার শব্দ। সেই সংগে ভারি নিঃশ্বাসের আওয়াজ।

'ওই তো!' বলে উঠলো মুসা।

চাঁদের আলোয় ঘাসবনে একটা নড়াচড়া চোখে পড়লো সবারই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ওরা।

বেরিয়ে এলো ওটা। কালো মাথা এপাশ ওপাশ নাড়ছে। ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, ওরা।

এগিয়ে আসছে জীবটা। ছাড়া পাওয়া সেই গরিলা।

বারো

সকলের আগে সামলে নিলো কিশোর। চেঁচিয়ে উঠলো, 'দৌড় দাও!'

মুহূর্ত দেরি করলো না, ঘুরেই ছুট লাগালো তিন গোয়েন্দা। ডিক দ্বিধা করছে। কর্তব্যবোধ। কিন্তু এগিয়ে আসা গরিলার লাল চোখ আর বিকট চেহারা দেখে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো, পিছু নিলো অন্যদের।

দমাদ্দম বুকে থাবা মারলো গরিলাটা, যেন ঢাক বাজালো। তারপর ঘুরে ঢুকে গেল আবার ঘাসবনে।

থামলো চার কিশোর।

'গেল কই?' হাঁপাচ্ছে রবিন।

'ঘাসের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে আবার,' ডিক জানালো। 'এখানে থাকাটা আর ঠিক না। চলো বাড়ি যাই।'

ফিরে চলেছে ওরা। বুকের ভেতরে দুরুদুরু কমেনি এখনও। খানিক দূর এগিয়ে মোড় নিয়েছে, ঠিক এই সময় ঘাস ফাঁক করে আবার বেরিয়ে এলো গরিলাটা। একেবারে তাদের মুখোমুখি। পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

ভয়ে জমে গেল যেন ছেলেরা।

মোটা, রোমশ দুই হাত মাথার ওপর তুলে বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠলো গরিলা।

'শুয়ে পড়ো! জলদি!' শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ে গড়িয়ে সরে গেল চারজনেই।

ফটাস করে একটা শব্দ হলো।

মুখ ফিরিয়ে ছেলেরা দেখলো, কলিনস আর ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন গরিলাটার পেছনে। ডাক্তারের হাতে উদ্যত স্টান গান।

দুলে উঠলো গরিলাটা। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোলো গলা থেকে। গুঙিয়ে উঠে ধুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

উঠে দাঁড়ালো ছেলেরা। হাঁটু কাঁপছে। বুকের খাঁচায় যেন পাগল হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ড।

'এই, ঠিক আছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন কলিনস।

কম্পিত কণ্ঠে জানালো ছেলেরা, ঠিক আছে।

পড়ে থাকা গরিলটাকে দেখছেন ডাক্তার। আপনমনে বিড়বিড় করলেন, 'অনেকক্ষণ ঘুমাবে। বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো।'

'ভাগ্যিস সময়মতো এসেছিলাম,' বললেন কলিনস। 'ব্যাটা ফালতু কথা বলে খাদের দিকে পাঠালো আমাদের।'

'কে?' এগিয়ে এলো কিশোর।

'আর কে? ফ্র্যাঙ্কলিন সিন!'

ঝুঁকে গরিলার দুই হাত তুলে ধরেছেন ডাক্তার। 'এই উইলবার, পা দুটো ধরো। গাড়িতে তুলি।'

'দাঁড়াও, আগে বেঁধে নিই,' কলিনস বললেন। 'বলা যায় না, কখন হুঁশ ফিরে আসে।'

গরিলাটার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা হলো। বেজায় ভারি। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো গাড়ির কাছে। দু'জন মানুষের জন্যে কাজটা কঠিন হতো, ছেলেরা সাহায্য না করলে। যা হোক, অবশেষে জীপের পেছনে তোলা হলো ওটাকে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন এখন?' কলিনসকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'খাঁচায় ভরবো আবার।'

'কাকু,' ডিক বললো, খাঁচার একটা শিক খোলা। দুটো বাঁকানো। কিশোর বলছে,

একটা শিক খুলে নিয়েছে কেউ। সুযোগ পেয়ে বাকি দুটো শিক বাঁকিয়ে বেরিয়ে গেছে গরিলাটা।'

নীরবে কিশোরের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন কলিনস। মাথা দোলালেন। 'ঠিকই বলেছে। তারমানে কেউ স্যাবোটাজ করতে চাইছে আমাদের।'

'দেখেশুনে তো তা-ই মনে হচ্ছে, স্যার,' কিশোর বললো। 'কিন্তু ওই ভাঙা খাঁচায় আবার রাখবেন গরিলাটাকে? থাকবে?'

'ভাঙা খাঁচা নয়। ইতিমধ্যে নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। লোক লাগিয়ে দিয়ে এসেছি।'

চলতে শুরু করলো জীপ।

ওটার পেছনে প্রায় দৌড়ে চললো ছেলেরা।

বাড়িতে পৌছে দেখলো, খাঁচার কাছে একজন বিশালদেহী লোক। খাটো করে ছাঁটা চুল। পেশীবহুল শরীর। এক হাতে উল্কি দিয়ে আঁকিবুকি আঁকা। বড় একটা হাতুড়ি নিয়ে কাজ করছে।'

'হয়ে গেছে,' কলিনসকে বললো লোকটা। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললো, 'ধরে ফেলেছেন? তাড়াতাড়িই পেরেছেন।'

খাঁচার কাছে এগিয়ে গেলেন কলিনস। সড়ে দাঁড়ালো লোকটা।

নতুন লাগানো শিকগুলো শক্ত করে ধরে টেনে, ঝাঁকি দিয়ে দেখলেন কলিনস। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। থ্যাংকিউ, ব্রড। এসো, একটু সাহায্য করো আমাদেরকে। কিংকঙের বাচ্চা সাংঘাতিক ভারি।'

'নিশ্চয়,' হাত থেকে হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে জীপের দিকে এগোলো ব্রড।

'রাখো,' হাত তুললেন ডাক্তার, 'আমি একবার দেখি খাঁচাটা। আজকের দিনটা যা গেল না! জানোয়ার খুঁজতে খুঁজতে জান খারাপ। আরেকবার ছুটলে আর খুঁজতে পারবো না।'

হেসে বললো ব্রড, 'তা ঠিক, খুব খেটেছেন আজ। দেখুন, আপনিই দেখুন, ভালোমতো লাগানো হয়েছে কিনা।'

পড়ে থাকা হাতুড়িটা তুলে নিয়ে খাঁচার কাছে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। প্রতিটি শিকে বাড়ি দিয়ে দেখতে শুরু করলেন। একটা করে বাড়ি দেন, আর কান পেতে শোনেন আওয়াজ কেমন বেরোচ্ছে। কোনো শিকে চিড়চিড় কিছু আছে কিনা, কিংবা ফাঁপা কিনা, তা-ই যেন বোঝার চেষ্টা করছেন। চিড় থাকলে শিকের জোর কম হবে, বাঁকিয়ে ফেলতে পারে গরিলা। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাইছেন।

'ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলো ব্রড।

'মনে তো হচ্ছে।' কড়া চোখে ব্রডের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'ভালোমতো

কাজ করবে, এটাই আশা করি। টোল কিনের মতো করলে থাকতে পারবে না, বলে দিলাম।'

'পারবে পারবে,' হাত নাড়লেন কলিনস। 'তোমার লোক তো। তুমি যখন দিয়েছো, কাজের লোকই হবে। খামোকা বেচারাকে ধমকাচ্ছো।'

'হুঁশিয়ার করে দিলাম আরকি, ফাঁকিবাজি যাতে না করে। আর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট চাই না এখানে।' গরিলার খাঁচাটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থেকে বললেন, 'কে শিকটা খুলে নিলো কিছুই বুঝতে পারছি না! গরিলায় খুললে তো এখানেই পড়ে থাকতো।' বলতে বলতেই চিতার খাঁচাটার দিকে চোখ পড়লো। 'দেখি, ওটাও একবার দেখে আসি। ছুটে না যায় আবার।'

হাতুড়ি হাতে চিতার খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। লাফ দিয়ে উঠে খাঁচার দেয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়লো চিতাটা। চাপা গলায় গর্জাচ্ছে।'

মোলায়েম গলায় ওটার সংগে কথা বলতে বলতে শিকগুলোয় বাড়ি দিতে লাগলেন ডাক্তার।

'খুঁজছেনটা কি?' মুসার প্রশ্ন।

'বোধহয় মেটাল ফ্যাটিগ।' বুঝিয়ে দিলো কিশোর, 'কিংবা বলতে পারো ধাতুর অবসাদ! তাতে ধাতুর জোর কমে যায়। এয়ারপোর্টে প্লেন ওড়ার আগে ওরকম পরীক্ষা করা হয়।'

'কিন্তু এভাবে হাতুড়ি দিয়ে?' রবিন বললো। 'ওরা করে অন্যভাবে।'

'এটা হয়তো ডাক্তারের নিজস্ব পদ্ধতি। তাঁর কাজ, তিনি ভালো বোঝেন। জন্তুজানোয়ার নিয়ে কারবার, খাঁচা বিশেষজ্ঞ তিনি হবেন না তো আর কে হবে?'

ফিরে এলেন ডাক্তার। সন্তুষ্টই মনে হলো তাঁকে। 'ঠিকই আছে মনে হয়। গরিলাটাকে ঢোকানো যায়।'

গরিলাটাকে খাঁচায় ভরা হলো। হুঁশ ফেরেনি। বাঁধন খুলে দিলেন কলিনস। বেরিয়ে এসে খাঁচার দরজা আটকে দিলেন।

'আমি যাই,' জীপের দিকে এগোলেন ডাক্তার। উঠে বসে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'একটা ঘোড়ার কি জানি হয়েছে। এখনই গিয়ে ওকে দেখতে হবে। উইলবার, কোনো দরকার হলে ডেকো আমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার। আজ রাতে আর ডাকতে না হলেই বাঁচি।'

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে জীপ নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো দিলো রবিন। 'মজা আসছে,' ফিসফিসিয়ে বললো, 'জনাব ফ্র্যাঙ্কলিন সিন।'

কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে থেমে দাঁড়ালো স্টেশন ওয়াগন। লাফ দিয়ে নামলো

টাকমাথা পরিচালক। গরিলার খাঁচার দিকে একবার চেয়েই কথার তুবড়ি ছোটালো, 'পেয়েছেন, তাহলে, অ্যাঁ? পেলেন তো, কিন্তু অনেক দেরি করে। আরও অনেক আগেই ধরতে পারা উচিত ছিলো। ওদিকে আমার লোকেরা তো ভয়ে বাঁচে না।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' ধীরে বললেন কলিনস। 'আরও আগেই ধরতে পারতাম, ফালতু কথা বলা না হলে। এদিকেই ছিলো ওটা, বেড়ার কাছাকাছি। আপনি বললেন খাদের দিকে গেছে। সেদিকে গিয়েই তো দেরিটা করলাম।'

'ওদিকে ডাকতে শুনেছি, তাই বলল্যম, দোষটা কি হলো শুনি?' গলা চড়িয়ে বললেন, 'দেখুন মিস্টার, এরকম হতে থাকলে শূটিং করবো কিভাবে? তালা দিয়ে রাখেন না কেন আপনার হারামী জানোয়ারগুলোকে? আমার লোক ভাগাবেন দেখছি।'

'সরি, মিস্টার সিন,' তাড়াতাড়ি বললেন কলিনস, 'এগুলো ছোটখাটো দুর্ঘটনা। সিরিয়াস কিছু হয়নি। যা হয়েছে হয়েছে, এখন সব ঠিক আছে। নিশ্চিন্তে গিয়ে কাজ করতে পারেন। আসলে, আপনাদের জন্যেই হচ্ছে এরকম, এটা না বলে পারছি না। হৈ-চৈ বেশি করছেন, তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে আমার জানোয়ারগুলো।'

রাগে লাল হয়ে গেল সিনের মুখ। 'শূটিং করবো, হৈ-চৈ তো হবেই। মুখে তালা এঁটে শূটিং হয় নাকি? শুনেছেন কখনও...'

কানফাটানো তীক্ষ্ণ গর্জনে চমকে উঠে থেমে গেল সিন। পাঁই করে ফিরলো। খাঁচার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালো চিতাটা, দাপাদাপি করছে বেরোনোর চেষ্টায়।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল পরিচালকের চেহারা। দেখে মনে হলো, চোখ উল্টে বুঝি পড়ে যাবে এখুনি। এই প্রথম যেন চোখ পড়লো তিন গোয়েন্দার ওপর। ওদের হাসি হাসি মুখ দেখে জ্বলে উঠলো রাগে, 'এরা কারা? এখানে কি করছে?'

'ওরা আমার মেহমান,' বললেন কলিন্‌স। 'আমাকে সাহায্য করতে এসেছে। তো, আপনার আর কিছু বলার আছে?'

চিতাটার মতোই জ্বলে উঠলো পরিচালকের চোখ। দ্রুত উঠছে নামছে বুক। 'আপনার জানোয়ার সামলে রাখবেন, ব্যস। নইলে পস্তাবেন বলে দিলাম।'

ঘুরে, গটমট করে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলো সে। চলে গেল।

অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে আছে কিশোর। 'লোকটার ব্যবহার কিন্তু মোটেই চিত্রপরিচালকের মতো নয়। বেশি বদমেজাজী, অস্থির।'

'আছে ওরকম লোক,' মুসা বললো। 'সিনেমা লাইনে ওদেরকে বলে "কুইকি"। টাকা কম। তাই যতো কম টাকায় কম সময়ে পারে, ছবি নামিয়ে খালাস। মেজাজ তাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে সারাক্ষণ। আমার ধারণা, টাকার সমস্যা আছে লোকটার।'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো,' বললো কিশোর, 'শব্দটা কিন্তু নেই আর এখন। মেটাল শ্রেডার। অনেকক্ষণ ধরে বন্ধ। চলো, বেড়ার কাছে। আরেকবার দেখতে চাই।'

'আমি যেতে পারছি না, কিশোর,' ডিক বললো, 'সরি। এখানে কাজ আছে। চাচাকে সাহায্য করতে হবে। তোমরা যাও।'

ঘ... দেখলো কিশোর। 'বেশিক্ষণ থাকবো না। আরেকবার দেখেই চলে যাবো। কাল আ..বো আবার, ভালো করে দেখার জন্যে।'

রওনা হলো কিশোর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিছু পিছু চললো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'আবার কি কানের পর্দার জোর পরীক্ষা করতে যাচ্ছি নাকি?' অন্ধকার বনোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'এবার যে কোন্ জানোয়ারে তাড়া করবে, আল্লাহই মালুম,' মুসা বললো।

জবাব দিলো না কিশোর। নীরবে এগিয়ে চলেছে। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে একটা গাছের গোড়ায় এসে বসলো।

'কি...,' বলতে গিয়ে বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

'চুপ।' চাপা গলায় সাবধান করলো কিশোর।

নীরবে কিশোরের পাশে বসে পড়লো দুই সহকারী।

মেটাল শ্রেডার এখন নীরব।

'দেখো,' স্যালভিজ ইয়ার্ডের দিকে দেখালো কিশোর, 'ওই যে লোকটা। চেনা চেনা লাগছে না?'

বেড়ার ওপাশে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় আলোকিত ইয়ার্ডের চত্বর। একটা লোক। সিগারেট ধরানোর জন্যে এক সময় দিয়াশলাই জ্বাললো লোকটা। কিছুক্ষণের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল তার চেহারা।

'আরি, কোদালমুখো!' চেঁচাতে গিয়েও সামলে নিলো মুসা, কণ্ঠস্বর খাদে নামালো। 'আজ সকালে ওই ব্যাটাই তো খাঁচা কিনতে গিয়েছিলো।'

'ঠিকই চিনেছো,' রবিন বললো, 'নাম যেন কি বলেছিলো?' ডেইমিং। ও-ব্যাটা ওখানে কি করছে?'

'এই, শোনো,' দু'জনকে চুপ করিয়ে দিলো কিশোর।

কটকট, খড়খড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

চকচকে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে কোদালমুখোর হাতে, পকেট থেকে বের করছে। মুখের কাছে নিয়ে গেল সেটা।

আবার খড়খড় করে উঠলো তার হাতের জিনিসটা।

'ওয়াকি-টকি,' বললো কিশোর। 'ট্রান্সমিট করছে কোদালমুখো।'

তেরো

'চলো, যাই,' আবার বললো কিশোর। 'কি বলে, শুনি।'

বেড়ার কাছে এক জায়গায় একগুচ্ছ ইউক্যালিপটাস গাছ জন্মে আছে। ওগুলোর মূলে ছড়িয়ে থাকা ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে বসা যাবে। হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোতে শুরু করলো কিশোর। পেছনে রবিন আর মুসা। ছায়ায় ছায়ায় নীরবে চলে এলো গুচ্ছটার তলায়। বাতাসে এক ধরনের তৈলাক্ত ওষুধী গন্ধ ছড়াচ্ছে ইউক্যালিপটাস। ডেইমিঙের কাছ থেকে বড় জোর বিশ ফুট দূরে রয়েছে এখন ওরা।

যান্ত্রিক শব্দ বেরোলো ওয়াকি-টকির স্পীকার থেকে।

ওটা প্রায় ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে কথা বললো ডেইমিং।

শোনা গেল। বুঝতে পারলো ছেলেরা।

'এদিকে এসো,' বললো ডেইমিং।

'আসছি,' জবাব দিলো স্পীকার।

জঞ্জালের পাহাড়ের ধার দিয়ে চুপি চুপি আসতে দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তিকে। ওই লোকটার হাতেও ওয়াকি-টকি। লম্বা অ্যান্টেনা পুরো খুলে রেখেছে।

'কিছু পেলে, ডারেল?' জিজ্ঞেস করলো কোদালমুখো।

'না,' জবাব এলো ওয়াকি-টকিতে।

'দেখো ওখানে। কোনো কিছুর তলায় লুকিয়েছে হয়তো। আমি এখানটায় দেখছি।'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা ভাঙা মাডগার্ড তুলে ছুঁড়ে ফেললো কোদালমুখো। নীরবতার মাঝে ঝনঝন শব্দটা বেশি জোরালো হয়ে কানে বাজলো। একটা বাম্পার, একটা রেডিয়েটর গ্রিল সরালো ডেইমিং। ভালোমতো খুঁজে দেখলো। মাথা নাড়লো।

এগিয়ে আসছে অন্য লোকটা। ডেইমিঙের মতোই জঞ্জাল সরিয়ে দেখতে দেখতে আসছে। একেবারে কাছে চলে এলো লোকটা। ডেইমিঙের মতোই সে-ও একটা কালো বিজনেস সুট পরেছে।

দু'জনেই চেপে নামিয়ে দিলো যার যার ওয়াকি-টকির অ্যান্টেনা।

'খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছি আমরা,' বললো দ্বিতীয় লোকটা।

'জানি,' কোদালমুখোর জবাব। 'কিন্তু হারানো চলবে না। খুঁজে বের করতেই হবে।'

'অন্যটাতে গিয়ে খুঁজলে কেমন হয়?'

'ওই জাঙ্কইয়ার্ডটা? মনে হয় না আছে ওখানে। তবে কোঁকড়াচুলো ছেলেটার ওপর

চোখ রাখা দরকার। দেখে যেরকম মনে হয়, ততো বোকা নয় ছেলেটা। বোধহয় কোনো কিছুর গন্ধ পেয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকালো তিন গোয়েন্দা। 'কোঁকড়াচুলো' বলতে কাকে বুঝিয়েছে, বুঝতে পেরেছে।

ক্ষণিকের জন্যে এদিকে ফিরলো দ্বিতীয় লোকটা। চাঁদের আলোয় তার চেহারা দেখা গেল। ছোট কুতকুতে চোখ, থ্যাবড়া নাক—যেন থাবড়া মেরে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। 'কলিনস যে দুটো আনলো আজকে, ওগুলোতে আছে? খুঁজবো?'

মাথা নাড়লো ডেইমিং। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলো। 'না, এখন না। টের পেলে পাখি উড়ে যেতে পারে।' কাগজটা দেখিয়ে বললো, 'ডোরাস নামের মেসেজঃ ডব্স রক্স নক্স এক্স রেক্স বক্স। ছ'টা এক্স। কেব্‌ল্ কোড। হয়তো ছ'শো 'কে'–এর কথা বলছে। তার মানে দশ লাখ ডলার। বুঝলে ডারেল, সোজা ব্যাপার না। অনেকগুলো পাথর।'

কাঁধ ঝাঁকালো ডারেল। 'তা–তো বুঝলাম। কিন্তু দেরি করলে না সাফ করে ফেলে। এখুনি গিয়ে ধরছি না কেন ব্যাটাকে?'

কাগজের টুকরোটা পকেটে রাখতে রাখতে বললো ডেইমিং, 'অপেক্ষা করতেই হবে। সুযোগ নিশ্চয় দেবে। হুঁশিয়ার আর কতোক্ষণ থাকবে? খালি একটা ভুল করুক, অমনি ক্যাঁক করে ধরবো। আর তার আগেই যদি পাথরগুলো পেয়ে যাই, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। একই সংগে দুই পাখি।'

'ঠিক আছে। যা ভালো বোঝো।'

'সিন ব্যাটা এসবে আছে কিনা, বোঝা দরকার। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। পঞ্চাশ হাজারের চুক্তি করেছে। শর্তের গোলমাল হলে কেস ঠুকে দেবে কলিনসের নামে, টাকাটা না দেয়ার চেষ্টা করবে। গরিলাটাকে সে–ও ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারে।'

হেসে উরুতে চাপড় মারলো ডারেল। 'ব্যাটাকে বাগে পেলে দেখে নেবো এক হাত। সেদিন শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম, সেটা থেকে বের করে দিলো আমাকে।'

কোদালমুখোও হাসলো। 'আমার সংগে অবশ্য এখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। যাকগে, চলো আজ যাই। কাল আবার এই সময়ে এসে খুঁজবো।'

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো ডেইমিং।

ডারেল চললো তার উল্টোদিকে।

কিশোরের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে ইঙ্গিত করলো মুসা, ডেইমিং যেদিকে যাচ্ছে, দেখালো। এক জায়গায় জালের বেড়া কাত হয়ে মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। অথচ, আগের বার ওটা খাড়া দেখেছিলো ওরা।

কাত হয়ে থাকা বেড়া পেরিয়ে এপারে চলে এলো ডেইমিং। খুটিটাকে তুলে আবার সোজা করে দিলো বেড়াটা। হাতের ধুলো ঝাড়লো। তারপর ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো, সাদা বাড়িটার দিকে চলেছে। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

উঠলো তিন গোয়েন্দা। স্যালভিজ ইয়ার্ডটা নীরব। কাজ বন্ধ। ডারেলকেও দেখা যাচ্ছে না আর। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো ছেলেরা।

কিসের শব্দে চমকে থেমে দাঁড়ালো মুসা। অন্য দু'জনও দাঁড়িয়ে গেল।

ঘাসের মধ্যে কিসের নড়াচড়া। হালকা পদশব্দ।

আবার কোন জানোয়ার! কালো চিতাটা না-তো? দুরুদুরু করে উঠলো ছেলেদের বুক।

ঘাসবনের কিনারে একটা গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি।

কি, দেখার জন্যে দাঁড়ালো না ছেলেরা। ঘুরেই দিলো দৌড়।

শেকড়ে হোঁচট খেয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো কিশোর। হাত-পা ছুঁড়ে পাগলের মতো ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হাতে লাগলো ঠাণ্ডা, শক্ত কিছু। আত্মরক্ষার তাগিদে ধরলো জিনিসটা, তুলে নিলো, বাড়ি দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা অন্তত করা যাবে। উঠে দাঁড়ালো। পেছনে শোনা গেল গোঁ গোঁ। হাতের জিনিসটা এক নজর দেখলো সে, একটা লোহার শিক।

কিশোরের হাত ধরলো মুসা। টেনে নিয়ে চললো।

পেছনে অন্ধকারে রাগে চেঁচালো কেউ। টর্চ জ্বলে উঠলো। আলো এসে পড়লো ছেলেদের গায়ে।

ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটে আসছে ভারি লোকটা।

দেখার জন্যে থামলো না ছেলেরা, ছুটছে। রবিন আগে আগে। পেছনে অন্য দুজন, কিশোরকে প্রায় হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে মুসা। হাতের শিকটা ফেলেনি গোয়েন্দাপ্রধান।

পেছনে চিৎকার করছে লোকটা, ওদেরকে থামতে বলছে।

থামলো তো না-ই, বরং গতি আরও বাড়ালো ওরা।

পেরিয়ে এলো পাহাড়। এতো জোরে হাঁপাচ্ছে, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক। বন থেকে বেরিয়ে পথে এসে পড়লো—এই পথই গেছে কলিনসদের বাড়িতে। রোলস রয়েসটা দেখতে পেলো, আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ছুটলো সেদিকে।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লো কিশোর। 'হ্যানসন! জলদি ছাড়ুন!'

তিন গোয়েন্দার কাজের সংগে পরিচিত হ্যানসন। একটা প্রশ্নও না করে এঞ্জিন

স্টার্ট দিলো। মুসা আর রবিন উঠে বসতেই চলতে শুরু করলো গাড়ি। রওনা দিলো গেটের দিকে।

বনের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে এসে পথে নামলো বিশালদেহী এক লোক। ব্রড। টর্চ নাচিয়ে, হাত নেড়ে চেঁচামেচি করছে, থামতে বলছে ওদেরকে।

'থামবেন না,' বললো কিশোর। 'চালিয়ে যান।'

গায়ের ওপরই এসে পড়ে দেখে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল ব্রড। পিছে চেয়ে দেখলো ছেলেরা, আফ্রিকান জংলী নৃত্য জুড়েছে জাঙ্গল ল্যাণ্ডের নতুন সহকারী, ঘুসি পাকিয়ে দেখাচ্ছে। তাকে দোষ দিতে পারলো না ওরা। হয়তো তার ওপর নির্দেশ রয়েছে কড়া পাহাড়া দেয়ার জন্যে। তার কাজ সে করছে।

গেটের পাল্লা বন্ধ। দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে গেল মুসা। তালাবন্ধ নয়, শুধু ভেজিয়ে রাখা হয়েছে। ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা খুলে দিয়েই আবার দৌড়ে এসে উঠলো গাড়িতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা। 'ব্রড আমাদের চেনে। ও এমন ব্যবহার করলো কেন, কিশোর?'

গোয়েন্দাপ্রধান শুনলো বলে মনে হলো না। একনাগাড়ে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

নিরাপদেই ইয়ার্ডে পৌঁছলো রোলস রয়েস। ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।

অনেক রাত হয়েছে। তবু একবার হেডকোয়ার্টারে ঢুকে খানিকক্ষণ আলোচনা করাটা উচিত মনে করলো কিশোর। হাতের শিকটা ওয়ার্কশপের ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরালো সে।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই আবার প্রশ্ন করলো মুসা, 'ব্রড ওরকম করলো কেন?'

'তাতে আমি কোনো রহস্য দেখছি না,' জবাব দিলো কিশোর।

'তার ওপর পাহারার ভার রয়েছে। সন্দেহজনকভাবে আমাদেরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাড়া করেছে। ব্যস।'

'তারমানে আমরা থামলেই ঢুকে যেতো?'

'হয়তো।'

'তাহলে থামলাম না কেন?'

'সব সময় কি আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যায়?'

'যতো যা-ই বলো, ওর ব্যবহার পছন্দ হয়নি আমার।'

'আমারও না,' মুসার সংগে একমত হলো কিশোর। 'কিন্তু কি করা যাবে বলো?

সব মানুষের ব্যবহার তো একরকম হয় না। যাকগে ওর কথা। কোদালমুখো আর থ্যাবড়া নাকের কথায় আসা যাক…'

'প্রথমেই ধরা যাক,' কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই বললো রবিন, 'ইয়ার্ডে কি খুঁজছিলো ওরা?'

'ছোট কিছু,' বললো মুসা। 'বললো না, খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছে?'

'ছোটই হবে এমন কোনো কথা নেই,' কিশোর বললো। 'ওরকম একটা জাঙ্কইয়ার্ডে বড় জিনিস লুকিয়ে রাখলেও সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কি লুকিয়েছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'তবে, ওদের কথা থেকে কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। রবিন, কাগজটা দেখিয়ে কোদালমুখো কি কি বলেছিলো, মনে আছে?'

'আছে,' বলেই গড়গড় করে আউড়ে গেল রবিন, ডোরাস লামের মেসেজঃ ডক্স রক্স নক্স এক্স রেক্স বক্স। ছ'টা এক্স। এটা কেব্‌ল্ কোড। হয়তো ছ'শো 'কে' এর কথা বলেছে। তার মানে দশ লাখ ডলার। বুঝলে ডারেন্স, সোজা ব্যাপার না। অনেকগুলো পাথর।'

'ভেরি গুড। নোটবইয়ে লিখে ফেলো। পরে ভুলে যেতে পারো।' থামলো কিশোর। রবিনকে লেখার সময় দিলো। তারপর বললো, 'বেশ, এবার কথাগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ডোরাস লাম কে, জানি না আমরা। এটুকু বুঝতে পারছি, কেব্‌ল্ করেছে সে, তারমানে কোথাও থেকে মেসেজ পাঠিয়েছে। আর মেসেজটা পাঠিয়েছে কোডের মাধ্যমে, সাংকেতিক শব্দে।'

'মানে কি শব্দগুলোর?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'উচ্চারণের তারতম্যে অনেক সময় শব্দের মানে অন্যরকম হয়ে যায়। ডেইমিং উচ্চারণ করেছে ইংরেজি 'এক্স'–এর মতো করে। বলেছেও বটে এক্স। কিন্তু তার বোঝার ভুল যদি হয়ে থাকে?—যদিও সে সম্ভাবনা কম। কিন্তু শব্দগুলো এমনও তো হতে পারেঃ ডক্‌স্ রক্‌স্ নক্‌স্ এক্স রেক্‌স্ বক্স। অর্থাৎ, এক্স আর বক্স বাদে বাকিগুলোতে শেষ অক্ষর এক্স–এর পরিবর্তে সি কে এস?' একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে লিখলো সে। বাড়িয়ে দিলো সঙ্গীদের দিকে, 'এরকম?'

দেখলো দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিশোর লিখেছেঃ **DOCKS ROCKS KNOCKS EX WRECKS BOX.**

'তা নাহয় হলো,' মাথা নাড়লো মুসা। 'কিন্তু এসবেরই বা মানে কি?'

'ঠিক বলতে পারবো না, তবে অনুমান বোধহয় করতে পারছি,' উত্তেজনা ফুটলো কিশোরের কণ্ঠে, 'এই যেমন ধরো, রক্‌স্। দশ লাখ ডলারের কথাও বলেছে ডেইমিং। বলেছে, অনেকগুলো পাথর। কিছু বুঝতে পারছো?'

'দশ লাখ ডলার দামের পাথর? কার এতো মাথা খারাপ হয়েছে? এতো টাকা দিয়ে পাথর কিনবে?'

'পাথর অনেক ধরনের হয়, মুসা আমান,' রহস্যময় কণ্ঠে বললো গোয়েন্দাপ্রধান। 'রক্‌সের আরও একটা প্রতিশব্দ আছে, অবশ্য স্ল্যাঙ। টাকাকেও রক্‌স্ বলা হয়। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, টাকার গন্ধ পেয়েছে ডেইমিং আর ডারেল। দশ লাখ ডলার। কোনো ষড়যন্ত্র করছে। ওদের কথাবার্তা চালচলনে ডাকাত বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার!'

'ওটা তোমার অনুমান,' রবিন মেনে নিতে পারছে না। 'ধরলাম, তোমার কথাই ঠিক। মেসেজের বাকি কোডগুলোর মানে কি?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। 'এখনও জানি না। হয়তো, বলা হয়েছে, টাকাগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। সংকেতের মানে বের করতে পারলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে আমাদের কাছে। হতে পারে, টাকাগুলো লুটের মাল, ডাকাতি করে এনেছে।'

'পাথরগুলো পাওয়া গেলে একসংগেই দুই পাখি ধরার কথা বললো,' মনে করিয়ে দিলো মুসা। 'কাদের কথা, কিসের কথা বোঝালো?'

আবার মাথা নাড়লো কিশোর। 'জানি না। তবে কোনো একজনের কথা বুঝিয়েছে। যে হুঁশিয়ার থাকে, এবং যে কোনো মুহূর্তে ভুল করে বসতে পারে।'

'সেই লোকটা কে?'

'হয়তো ফ্র্যাঙ্কলিন সিন,' বললো রবিন।

'সে কেন এসব করতে যাবে, বুঝতে পারছি না আমি,' গাল চুলকালো কিশোর। 'গরিলা ছাড়ার ব্যাপারে যদি কারো হাত থাকে, তাহলে সেটা টোল কিন। অন্তত স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু তার সংগে পাথর আর দশ লাখ ডলারের কি সম্পর্ক?'

আঙুল দিয়ে টেবিলে টাট্টু বাজালো কিশোর। চুপ করে ভাবলো কিছুক্ষণ। বললো, 'আসলে, সঠিক পথে ভাবছি না আমরা, ফলে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রথম কথাটাই ভুলে যাচ্ছি আমরা, আজ সকালে খাঁচা কিনতে এখানে এসেছিলো ডেইমিং। তারপর, খানিক আগে তার সঙ্গীর কাছে কথাটার উল্লেখও করেছে।'

'ও হয়তো ভাবছে খাঁচার মধ্যে রয়েছে পাথরগুলো,' রসিকতার ভঙ্গিতে বললো মুসা।

'হেসো না,' গম্ভীর হয়ে বললো কিশোর। 'মেসেজে বক্স বলা হয়েছে, তারমানে খাঁচাও হতে পারে। "রেক্‌স বক্স" মানে ভাঙা খাঁচা না বুঝিয়ে হয়তো বুঝিয়েছে, খাঁচাগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করো, পাথর পেয়ে যাবে। কিংবা টাকা!'

'তোমাদের এখানকার চারটে খাঁচা টুকরো টুকরোই হয়ে আছে,' বললো মুসা। 'আর ডেইমিঙের কাছেও ওগুলো তেমন দামী মনে হয়নি। তাহলে বিশ ডলার সেধেই

বিদেয় হতো না।'

'তা ঠিক।'

'সারাদিনের উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে মাথা গরম হয়ে আছে আমাদের।' মুসা প্রস্তাব দিলো, 'এখন আর ভাবাভাবি না করে চলো গিয়ে ঘুমাই। সকালে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে'খন।'

'ঠিকই বলেছো। তবে...' থেমে গেল কিশোর।

'তবে?'

'জটিল একটা রহস্য দানা বেঁধেছে,' সন্তুষ্টির হাসি ফুটলো কিশোরের মুখে। 'সমাধান করে আনন্দ পাবো।'

চোদ্দ

পরদিন সকালে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো আবার তিন গোয়েন্দা।

'জাঙ্গল ল্যাণ্ডে যাবো আজও,' ঘোষণা করলো কিশোর। 'তার আগে কিছু কথা আছে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। আমার অনুমান ঠিক হলে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটবে আজ ওখানে।'

আগ্রহে সামনে ঝুঁকলো দুই সহকারী।

'কি ঘটবে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

মুসার চোখেও একই প্রশ্ন।

বজ্রপাত ঘটালো যেন কিশোর, 'কলিনস ভাইয়েরা চোরাচালানীদের দলের সং জড়িত।'

'কী!' চমকে গেল দুই সহকারী।

'সিলভার কলিনস তার ভাইয়ের কাছে এখানে জানোয়ার পাঠায়,' বলে চল-া কিশোর। 'ওটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার। তলে তলে চলছে হীরা চোরাচালান।'

'হীরা!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রবিনের।

'হ্যাঁ, হীরা। হীরাও একধরনের পাথর, তাই না? 'জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলে চললো কিশোর, 'ডিক আমাদের জানিয়েছে, তার চাচা রুয়ানডায় গেছে গরিলা জোগাড়ের জন্যে। শুধু রুয়ানডাই নয়, আরও অনেক জায়গায় গেছে। জন্তুজানোয়ার জোগাড়ের ছুতোয় চষে বেড়িয়েছে সমস্ত আফ্রিকা। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক জায়গায় হীরার খনি পাওয়া গেছে, আগেও ছিলো, এখনও আছে। কঙ্গো, ঘানা, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন, দা রিপাবলিক অভ সেন্ট্রাল আফ্রিকা...এসব অঞ্চল থেকে

হীরা রপ্তানী হয়।'

একটা ম্যাপ বের করলো কিশোর। 'এই যে, পূর্ব আফ্রিকা, রুয়ানডা থেকে বেশি দূরে নয়। এই যে দেখো, উগাণ্ডা আর কেনিয়া কাছাকাছিই। ওখানে হীরার খনি আছে। জন্তুজানোয়ারও আছে প্রচুর। সিলভার কলিনস জানোয়ার পাঠানোর জন্যে যদি পূর্ব উপকূলে যায়, স্বাভাবিকভাবেই যেতে হয় এইসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে। উপকূলে ওখানে বেশ বড় একটা বন্দর-শহর আছে। নাম দারেস সালাম।'

শিস দিয়ে উঠলো মুসা। 'কানে পরিচিত লাগছে।'

দ্রুত পকেট থেকে নোটবুক বের করলো রবিন। পাতা উল্টে এসে থামলো এক জায়গায়। 'গতরাতে ডেইমিং বলেছিলো ডোবাস লাম! তারমানে দারেস সালামকেই উচ্চারণের কারণে ওরকম শোনা গেছে?'

'তা-ই,' মাথা ঝোকালো কিশোর। 'ওই মেসেজ কি করে জোগাড় করলো ডেইমিং, বুঝতে পারছি না। আমার যা মনে হয়, সিলভার তার ভাইকে পাঠিয়েছে ওই মেসেজ। জানোয়ার শিপমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর। বলেছে, যে হীরাগুলো আসছে।' জ্বলজ্বল করছে গোয়েন্দাপ্রধানের চোখ। "মেসেজের প্রথম শব্দটা হলো ডক্স্—ডি ও সি কে এস, অর্থাৎ জেটি। তারমানে বন্দর থেকে জাহাজে পাঠানো হয় হীরা।

'এরপর হলো রক্স্, মানে, পাথর; মানে হীরা।

'তৃতীয় আর চতুর্থ শব্দটার মানে এখনও বুঝতে পারিনি। তবে রেকস বক্স-এর মানে বুঝেছি। আসলে ওটা আর ই এক্স, রেক্সই হবে। এবং তাহলেই খাপে খাপে মেলে।' থামলো সে।

'থামলে কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে বললো মুসা। 'বলো।'

'রেক্স ইংরেজী নয়, ল্যাটিন। মানে হলো, রাজা। সিংহকে আমরা বলি পশুর রাজা। তাহলে? রেক্স বক্স বলে বোঝাতে চেয়েছে সিংহের খাঁচা, অর্থাৎ ভিকটরের খাঁচা। ভিকটরকে আনা হয়েছে আফ্রিকা থেকে, আর তার খাঁচায় করেই হীরাগুলোও। এবং আমার ধারণা, তারপর কোনোভাবে হীরাগুলো নিখোঁজ হয়েছে। ওগুলোকেই বার বার খুঁজতে আসছে কেউ, নার্ভাস করে তুলছে ভিকটরকে।'

মাথা দুলিয়ে বললো মুসা, 'ঠিক বলেছো। সাধারণ কুকুরও রাতের বেলা অপরিচিত কাউকে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে দেখলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে।'

'কিন্তু উইলবার কলিনস ভিকটরের অপরিচিত নয়,' রবিন বললো।

'না, উইলবার কলিন্স ভিকটরকে উত্তেজিত করেননি,' বললো কিশোর। 'অন্য কেউ।'

'ক্যাপ্টেন সিন?' মুসা বললো। 'সবাইকে উত্তেজিত করার ক্ষমতা আছে ওর।'

হতে পারে। কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ মেলাতে পারছি না।'

তুড়ি বাজালো মুসা। 'বুঝেছি! টোল কিন। মনে আছে, সেদিন ভিকটরকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিয়েছে। সিংহটাকে বের করেছে খাঁচায় হীরা খোঁজার জন্যে।'

'ভুলে যাচ্ছো,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর, 'খাঁচা থেকে নয়, ঘর থেকে। ভিকটরের খাঁচা আগেই ফেলে দেয়া হয়েছে।'

'ডেইমিং আর ডারেলের ব্যাপারটা কি?' প্রশ্ন করলো রবিন। 'ওরা কোথায় ফিট করছে? কি খুঁজছে, জানে ওরা। এমনকি কোথায় খুঁজতে হবে, মনে হলো তা-ও জানে।'

'হতে পারে, ওরা দু'জন একই দলের লোক। কলিনসদের দলের।'

'জাঙ্কইয়ার্ডে খুঁজতে গিয়েছিলো কেন তাহলে?'

'হীরাগুলো ওখানেও হারিয়ে থাকতে পারে। কি বলেছিলো ডারেল মনে আছে? খড়ের গাদায় সুঁই খুঁজছে।'

'দুই পাখির ব্যাপারটা কি তাহলে?'

'তাই তো! ওটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। নাহ্, এখানে এসে আবার মিলছে না। একদলের লোক না ওরা। এখন মনে হচ্ছে, ডেইমিং আর ডারেল কলিনসদের শত্রুও হতে পারে।'

'বড্ড গোলমেলে। জটিল।' গাল ফুলিয়ে ফোঁস করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো রবিন। 'ভাবছি, ডিক এসবের কতোখানি জানে!'

'বোধহয় কিছুই না। সাবধানে কথা বলতে হবে আমাদের। হাতে প্রমাণ না নিয়ে ওর চাচাদের বিরুদ্ধে ওর সামনে কিছুই বলা যাবে না। বুঝেছো?'

মাথা ঝাঁকালো রবিন আর মুসা।

'চলো এখন, বেরোই। আজও বোরিস যাবে ওদিকে। বলে রেখেছি, নিয়ে যাবে আমাদের। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

পনেরো

তিন গোয়েন্দার আসার অপেক্ষায় বাড়িতেই বসে ছিলো ডিক। সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলো।

শূটিং যেখানে হচ্ছে সেখানে নিয়ে চললো তিন গোয়েন্দাকে। সমতল খানিকটা খোলা জায়গা ঘিরে রেখেছে বড় বড় গাছপালা আর ঘন ঝোপ। ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একধারে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের চূড়া। চমৎকার সেটিং।

কাজ চলছে। সবাই ব্যস্ত। বেশি ব্যস্ত সিন। একবার গিয়ে অভিনেতাদের সংগে

কথা বলছে, ফিরে এসে টেকনিশিয়ানদের যন্ত্র সাজানো ঠিক হয়েছে কিনা দেখছে-- দু'একটা পরামর্শ দিয়েই ছুটে যাচ্ছে শ্রমিকদের কাছে, ধমক দিচ্ছে, হাত নেড়ে অনর্গল কথা বলে কি কি কাজ করতে হবে বোঝাচ্ছে।

'শূটিং কিছু করেছে আজ?' ডিককে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

মাথা নাড়লো ডিক। 'না, পারেনি। সারাটা সকাল আকাশ মেঘলা ছিলো। রেগে আছে সিন। এখন সূর্য যখন উঠেছে, শুরু হবে শূটিং। ভিকটরের সিনটা আগে নেবে।'

'রাত কেটেছে কেমন ওর?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ভালো। তবে চিতাটা অস্থির হয়ে ছিলো অর্ধেক রাত।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'এক সিংহের জ্বালায়ই বাঁচি না, আবার একটা ভীতু চিতা!'

'না না, অতো ভয়ের কিছু নেই। নতুন এসেছো তো। জায়গা সইয়ে নিতে সময় নেবে।'

'ভিকটরের জখম কেমন, ডিক?' রবিন জানতে চাইলো।

'ভালো। প্রায় মিশে গেছে।' সেট-এর একদিকে দেখালো ডিক। বিশাল সিংহটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যেখানে উইলবার কলিনস। ছেলেদের দেখে হাত তুলে ডাকলেন।

এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

জ্বলজ্বলে চোখে তাদের দিকে তাকালো সিংহটা। হাঁ করে হলদে দাঁত দেখালো। লেজ নাড়ছে।

'মুড ভালো আজ ওর,' জানালেন কলিনস। 'ইতিমধ্যে কয়েকবার রিহারস্যাল দিয়েছি, কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছি।'

বিরাট হাঁ করে ভয়াল দাঁতগুলো আবার দেখালো সিংহটা। নরম গররর আওয়াজ বেরোলো গলার ভেতর থেকে।

হাসলেন কলিনস। 'বললাম না, মুড ভালো।'

হাত তুলে সিংহটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইশারা করলো সিন।

'চলো, যাই,' ছেলেদের বললেন কলিনস।

অভিনেতা-অভিনেত্রী দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তাদেরকে বললো সিন, 'অ্যানি, তুমি আর জন দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে,' পাহাড়ের গোড়াটা দেখালো। সিংহটা থাকবে ওপরে, ওই যে ওই বড় পাথরটা ঝুলে আছে তার ওপর, নিচে তোমাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাবে জন, সিংহটাকে দেখে চমকে উঠবে। এই সময় সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। পরিষ্কার? কোনো প্রশ্ন? অ্যানি? জন? গুড।'

ক্যামেরাম্যানের দিকে ফিরলো পরিচালক। 'সিংহের ঝাঁপিয়ে পড়ার সিনটা তুলবে

তুমি। জন লড়াই করবে ওটার সংগে, গায়ের ওপর থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে, গড়াগড়ি করে সরে যাবে কয়েক ফুট। তারপর নিথর হয়ে পড়ে থাকবে, সিংহটা তার গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দাঁড়াবে।

'এরপর সিন কাট হয়ে যাবে। আর ছবি তোলার দরকার নেই। পরের দৃশ্যে চলে যাবো আমরা। ঠিক আছে? তোমাদের কাজ তোমরা ঠিকঠাক মতো করবে। এখন সিংহটা বেমক্কা কিছু করে না বসলেই বাঁচি।'

'দেখুন,' গম্ভীর হয়ে বললেন কলিনস, 'আপনার লোকদের ঠিকমতো চলার নির্দেশ দিন। ওরা বেমক্কা কিছু না করলে ভিকটরও করবে না। প্রাইস যদি চুপচাপ পড়ে থাকেন মাটিতে, ভিকটর আর কিছু করবে না। ওঠার চেষ্টা করলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। ওরকমই বোঝানো হয়েছে ওকে। আপনার অভিনেতারা উল্টোপাল্টা কিছু না করলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

পরিবেশ হালকা করার জন্যে প্রাইসের দিকে চেয়ে চোখ টিপলো পরিচালক। 'তোমার জীবন বীমা করানো আছে তো, জন?'

অভিনেতার মুখ শুকনো। 'রাখো তোমার রসিকতা। আমি এদিকে...' সরে গেল ওখান থেকে। সিগারেট ধরালো।

'ভয় পাচ্ছে বেচারা,' ফিসফিস করে বন্ধুদের বললো কিশোর। 'ভিকটরের ওপর সিনও ভরসা রাখতে পারছে না।'

শান্ত হয়ে বসে থাকা বিশাল জানোয়ারটার দিকে তাকালো মুসা। 'প্রাইসকে দোষ দেয়া যায় না। গায়ের ওপর জলজ্যান্ত এক সিংহ লাফিয়ে পড়বে ভাবতে কারই বা ভালো লাগে?'

'কিন্তু ভিকটর পোষা,' প্রতিবাদ জানালো ডিক। 'ও কখনো কারও কোনো ক্ষতি করেনি।'

'জন প্রাইসের না গতকাল কি জানি হয়েছিলো?' রবিন বললো। 'কই, আজ তো তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

'মেক-আপ,' বললো মুসা।

অভিনেত্রীর দিকে এগিয়ে গেল সিন। 'জনের দৃশ্যটা নেয়ার পর পরই তোমার একটা দৃশ্য নেয়া হবে। দৃশ্যটা হবে এরকমঃ তাঁবুতে ঘুমিয়ে থাকবে তুমি। এককোণা ফাঁক করে মাথা গলিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকবে সিংহ। ওকে দেখে ভয় পেয়ে উঠে বসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবে তুমি। সিংহটাও তখন গর্জে উঠবে। ঠিক আছে? বোকার মতো কিছু করে বসো না। এই যেমন লাফ দিয়ে মাটিতে নামা, সিংহটাকে আঘাত করা...খবরদার, ওসব কিচ্ছু করবে না। শুধু বিছানায় উঠে বসবে, গা থেকে চাদর সরাবে, চিৎকার করবে, ব্যাস। 'বুঝেছো?'

'সিংহের সংগে আর কখনও অভিনয় করিনি, মিস্টার সিন,' ভয়জড়িত কণ্ঠে বললো অভিনেত্রী। 'সত্যি বলছেন, ও কিছু করবে না?'

হাসলো সিন। 'কলিনস গ্যারান্টি দিয়েছে, করবে না।'

কিন্তু অ্যানির মুখ দেখে মনে হলো না, খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

কিশোরের হাত ছুঁয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো মুসা। নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে কোদালমুখোকে দেখতে পেলো গোয়েন্দাপ্রধান, সেটের এক কিনারে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছে। ডিকের দিকে কাত হয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'ওই লোকটাকে চেনো? ওই যে, ও।'

'কোদালমুখোটা তো? চিনি। নাম জিনজার। সিনের সংগে কাজ করে।'

'জিনজার? তুমি শিওর? ডেইমিং না?'

'না না, জিনজার। আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষজ্ঞ।'

দুই সহকারীর দিকে চট করে একবার তাকালো কিশোর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। মাথা ঝোঁকালো দু'জনেই।

'টোল কিনের কি খবর?' ডিককে জিজ্ঞেস করলো আবার কিশোর। 'আর দেখা গেছে ওকে?'

মুখ বাঁকালো ডিক। 'আরও? ধরা পড়লে কি অবস্থা হবে জানে না?'

'আচ্ছা, ডিক, ভিকটরের খাঁচাটা কই? কোথায় ফেলেছো?'

'জানি না। যদ্দুর মনে হয়, ইয়ার্ডে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমাদের বেশিরভাগ জঞ্জালই ওখানে ফেলি। কেন?'

'এমনি। কৌতূহল।'

'ওকে, কলিনস,' হঠাৎ বলে উঠলো সিন, 'আপনার সিংহ নিয়ে ওখানে উঠুন গিয়ে।'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে ভিকটরের কান ধরে টান দিলেন কলিনস। 'আয়, ভিকি। কাজ করতে হবে।'

বাধ্য ছেলের মতো কলিনসের সংগে সংগে চললো সিংহটা। এরপর তাঁর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলো।

পাহাড়ের নিচে অবস্থান নিলো প্রাইস আর অ্যানি।

ইশারা করলো সিন।

চেঁচিয়ে উঠলো সহকারী পরিচালক, 'রেডি ফর অ্যাকশন। সবাই চুপ।'

প্রায় সবগুলো চোখ একসাথে ঘুরে গেল অভিনেতা–অভিনেত্রীর দিকে। পাহাড়ের ওপরে সিংহের মুখ দেখা যাবে। ঠিক ওই বিশেষ মুহূর্তে দুই সহকারীর হাত ধরে টানলো কিশোর।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে এলো দু'জনে।

'কি ব্যাপার?' বিরক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'এটা একটা সময় হলো ডাকার? আসল সিনটা…'

'এই সুযোগটার অপেক্ষায়ই ছিলাম,' আস্তে বললো কিশোর। 'চলো, কাজ আছে।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

গলায় রহস্য ঢেলে বললো কিশোর, 'হীরক অঞ্চলে।'

সাদা বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালো ছেলেরা।

'নতুন খাঁচাগুলো বোধহয় ওধারে,' বললো কিশোর। 'দেখবো। চোরাচালানের কাজে নিশ্চয় ওগুলোও ব্যবহার করা হয়েছে। হুঁশিয়ার থাকবে।'

অবাক হলো রবিন। 'কেন? কার ভয়? সবাই তো এখন শূটিঙের ওখানে।'

'সবাই নয়,' আর কিছু বললো না কিশোর। বাড়ির পাশ ঘুরে অন্যধারে এগিয়ে গেল। তার কথামতো কোণের কাছে দাঁড়ালো মুসা আর রবিন। ভালো করে দেখলো, কাছেপিঠে কেউ আছে কিনা। নেই দেখে, কিশোর একটা জানালার নিচে এসে দাঁড়ালো। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো। ঘরেও কাউকে দেখা গেল না।

দুটো খাঁচা দু'দিকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। একটার দিকে এগোলো ওরা। অন্যটা দেখা যায় না ওখান থেকে।

'কপাল ভালোই আমাদের,' ফিসফিস করে বললো রবিন। 'কিংকঙের বাচ্চা ঘুমোচ্ছে।'

খাঁচার এক কোণে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে গরিলাটা।

'চোরাই হীরা খোঁজার জন্যে ভেতরে ঢুকতে হবে নাকি?' মুসার কণ্ঠে অস্বস্তি।

জবাব না দিয়ে খাঁচার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। আনমনে বিড়বিড় করলো, 'কিভাবে আনা হয়েছে? কোনো চোরা খোপটোপ…'

'হতে পারে,' বাধা দিয়ে বললো রবিন। 'কিন্তু সেটা বুঝবে কিভাবে?'

'নাহ্, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভেতরে ঢুকে দেখতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু গরিলাটা রয়েছে…,' ভাবনায় পড়ে গেল কিশোর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে। আমি তো ভাবছিলাম, গরিলাটার সংগেই ভেতরে ঢোকাবে আমাদেরকে।'

ঘুরে দাঁড়ালো কিশোর। 'চলো, চিতার খাঁচাটা দেখিগে।' কিছুদূর এগিয়েই স্থির হয়ে গেল হঠাৎ।

'কি হলো?' ভুরু নাচালো রবিন।

'চুপ! নড়বে না। দৌড় দেবে না।'

'হয়েছেটা কি?' ভয় পেয়েছে মুসা।

'সামনে দেখো,' কিশোরের গলা কাঁপছে। 'খাঁচার দরজা খোলা। চিতাটা ভেতরে নেই!'

শূন্য খাঁচার দিকে তাকালো দু'জনে। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। পা অবশ হয়ে আসছে, শরীরের ভার ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে যায় বুঝি। আতঙ্ক চরমে উঠলো, পেছন থেকে যখন শোনা গেল পরিচিত, ভয়াবহ শব্দটা। চিতার তীক্ষ্ণ শিস, সেই সংগে চাপা গর্জন।

ঢোক গিললো কিশোর। রবিন আর মুসার কাছ থেকে সামান্য তফাতে রয়েছে ও। মুখ ফেরাতেই চোখে পড়লো ওটাকে। ফিসফিসিয়ে বললো, 'বিশ ফুট দূরে। ঠিক তোমাদের পেছনে। গাছের ওপর। একসাথে থাকা উচিত না আমাদের। আমি তিন গুণলেই...,' কথা শেষ হলো না। লম্বা ঘাসের মাথায় ঢেউ দেখা গেল। দমবন্ধ করে দেখলো সে, ঘাসের মাথা ফাঁক হচ্ছে, বেরিয়ে এলো একটা চকচকে নল। নলের মুখ ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে।

খসখসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'কেউ নড়বে না!'

ঘাসবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা মানুষটা। ডাক্তার হ্যালোয়েন। আস্তে করে আরেক পা বাড়ালেন। আরেকটু উঁচু হলো হাতের রাইফেলের নল। ট্রিগারে আঙুল।

অকস্মাৎ, একসংগে ঘটলো কয়েকটা ঘটনা। তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকার করে উঠলো চিতা। গর্জে উঠলো রাইফেল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ছেলেরা। ধুপ করে তাদের কয়েক ফুট দূরে এসে লাফিয়ে নামলো চিতাটা। পড়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পা নাড়লো, মুখ খিঁচলো, শিহরণ উঠলো শক্তিশালী পেশীতে, তারপর নিথর হয়ে গেল কুচকুচে কালো দেহটা।

এগিয়ে এলেন ডাক্তার। তার মুখে রাগ আর হতাশার মিশ্রণ। ময়লা বুটের ডগা দিয়ে আলতো খোঁচা দিলেন চিতার গায়ে।

'তোমাদের ভাগ্য ভালো, গুলিটা জায়গামতো লেগেছে,' বললেন তিনি।

'গুলি...মানে...ওটা কি...,' ঠিকমতো কথা বেরোচ্ছে না মুসার মুখ দিয়ে।

'হ্যাঁ, মরে গেছে,' তার কথাটা শেষ করে দিলেন ডাক্তার। 'আসল বুলেট। কল্পনাও করিনি কখনও, কলিনসের কোনো জানোয়ারকে খুন করতে হবে,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি।

জানোয়ারটার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরালো কিশোর, ঢোক গিললো। 'থ্যাংকস, ডকটর। ওটা বেরোলো কিভাবে?'

'আমারই দোষ,' এবার মাথা নাড়লেন তিনি। 'অনেক দূর থেকে এসেছে, ভাবলাম, ভালোমতো চেকাপ দরকার। বাইরে থেকে ডার্ট ছুঁড়লাম। ঠিক ওই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলো ওটা। লাগলো না ডার্ট। আবার ছুঁড়তে যাবো, এই সময় খাঁচার দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ওটা। অবাক হয়েছি, কিন্তু দাঁড়ালাম না। দিলাম দৌড়, জীপ থেকে রাইফেল আনতে। অস্ত্র সংগে রাখি। বিপজ্জনক জানোয়ার নিয়ে কাজ করি, কখন দরকার পড়ে। এই এখন...,' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

'তারমানে খাঁচার দরজা খুলে রেখেছিলো কেউ?' কিশোরের প্রশ্ন। 'ওরকম একটা কাজ কে করতে যাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ডাক্তার। যে করবে তারও তো বিপদের ভয় আছে। দরজা খুলে যদি তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো চিতাটা? আমার মনে হয়, তালা ঠিকমতো লাগেনি।'

'ডার্ট তো কতোই ছুঁড়েছেন। এতো কাছ থেকে মিস করলেন কেন?'

সরু হয়ে এলো ডাক্তারের চোখের পাতা। 'বললাম না, লাফিয়ে উঠেছে। কপাল, বুঝলে, সবই কপাল। মরবে তো, তাই...' ধরে এলো তাঁর গলা।

চিতাটার ওপর ঝুঁকলো মুসা। 'মেরে ফেলা ছাড়া কি আর কোনো উপায় ছিলো না?'

'আর কি করতে পারতাম? ভয়ানক খুনী। আবার ডার্ট ছুঁড়তে পারতাম। কিন্তু ওষুধের ক্রিয়া শুরু হতে সময় লাগতো। ওই সময়ের মাঝেই সর্বনাশ করে ফেলতো।' হঠাৎ যেন মনে পড়লো তাঁর, 'তা তোমরা এখানে কি করছো? কলিনস তো বললো শূটিং দেখতে গেছো।'

'গিয়েছিলাম,' আমতা আমতা করলো কিশোর। 'ভাবলাম, এদিকে একবার ঘুরে যাই...'

এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'কলিনসের কাছে শুনলাম, তোমরা গোয়েন্দা। তদন্ত করতে এসেছো নিশ্চয়? কিছু পেলে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না। সবই এখনও রহস্য।'

'তোমাদের দোষ দেবো কি? আমিই অবাক। একের পর এক রহস্যময় ঘটনা ঘটে চলেছে এখানে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা রহস্যের কথা শুনবে?'

তিন জোড়া চোখেই আগ্রহ ফুটলো।

ঠোঁটে সিগারেট লাগালেন ডাক্তার। দেশলাই বের করে ধরালেন। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে থুথু ফেললেন মাটিতে। তারপর সিগারেটটা দুই আঙুলের ফাঁকে নিয়ে বললেন, 'বলছি। যতোবার, তোমরা ছেলেরা এখানে আসো, একটা করে জানোয়ার ছাড়া পায়। ভালো করে ভেবে দেখো। বোঝা যায় কিছু?'

একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।

জোরে হেসে উঠলেন ডাক্তার। 'ঠিক বলিনি?' চিতাটার গায়ে লাথি মারলেন। 'এটাকে সরানো দরকার। ঠিক আছে, পরে হবে। শোনো, তোমাদেরকে একটা উপদেশ দিয়ে রাখি...'

'কি, স্যার?' মিনমিন করে বললো রবিন।

'সাবধানে থাকবে।'

বলে আর দাঁড়ালেন না। ঘুরে, হেঁটে গিয়ে ঢুকে পড়লেন লম্বা ঘাসের ভেতরে।

ষোলো

দুই সহকারীকে নিয়ে ইয়ার্ডের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালো গোয়েন্দাপ্রধান। কয়েক একর জায়গা জুড়ে পড়ে আছে লোহা লক্কর, অধিকাংশই গাড়ির ভাঙাচোরা বডি।

'এখানে কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'চোরাই হীরাগুলো খুঁজবো,' জবাব দিলো কিশোর। 'ভিকটরের ফেলে দেয়া খাঁচাটাও।'

'হীরাগুলো এখনও খাঁচার মধ্যে রয়েছে ভাবছো?' রবিন প্রশ্ন করলো।

'যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক দিন আগে ফেলা হয়েছে খাঁচাটা। তবে একটা আইডিয়া হয়তো পেতে পারি দেখলে।'

'কিন্তু কিশোর,' মুসা বললো, 'খাঁচায় থাকলে কোথায় থাকবে? তোমার কি ধারণা, থলেয় ভরে বেঁধে দেয়া হয় কোনো কোণাটোনায়?'

'বলতে পারবো না, মুসা। আমার মনে হয়, ডেইমিং আর ডাব্রেলও জানে না, কোথায় রাখা হয় হীরাগুলো। জানলে এতোদিনে পেয়ে যেতো।'

'ওরা কাল রাতে অনেক খুঁজেছে,' রবিন বললো, 'পায়নি। আমরা পাবো, এটা আশা করছো কিভাবে?'

'আমরা খুঁজবো দিনের আলোয়। অন্ধকারে অনেক কিছুই চোখ এড়িয়ে যায়।'

'স্রেফ পাগলামি,' বিড়বিড় করলো মুসা।

নির্জন ইয়ার্ড।

কিশোর বললো, 'এইই সুযোগ। চলো।'

আগের রাতে বেড়াটা যে-জায়গায় নামানো হয়েছিলো, সেখানে এসে দাঁড়ালো ওরা। সহজেই ঠেলে আবার নামিয়ে দিলো খুঁটি। হেঁটে চলে এলো তারের জালের ওপর দিয়ে। চত্বরে ঢুকে গুঁড়ি মেরে এসে থামলো ভাঙাচোরা বডির স্তূপের কিনারে।

কান ঝালাপালা করা ঝনঝনে ধাতব আওয়াজ উঠলো ইয়ার্ডের অন্যধারে। সেই সংগে বিরক্তিকর যান্ত্রিক গোঙানি, শিস, আর্তনাদ।

'চলো দেখি,' প্রস্তাব দিলো কিশোর, 'মেটাল শ্রেডার কি করে কাজ করে।'

বিরাট এক ক্রেন দেখা গেল, কয়েক শো' গজ দূরে। কন্ট্রোলহাউসটা আরও দূরে। প্রতিবাদ জানিয়ে গুঙিয়ে উঠলো যেন যন্ত্র। মস্ত এক যান্ত্রিক থাবা নেমে আসতে লাগলো স্তূপের ওপরে।

জঞ্জালের ওপর ঘটাং করে পড়লো থাবাটা। ধাতব আঁকশিতে করে তুলে নিলো একটা বডি। শূন্যে উঠে গেল। দুলছে। ওটাকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো আঁকশি। ধুপ করে পড়লো বডিটা, তারপর শুরু হলো বিচিত্র হুপ-হুপ-হুপ শব্দ। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে বডি।

'কনভেয়র বেল্ট,' একটা বডির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে মুসা। 'শেড-এ নিয়ে যাচ্ছে।'

শেড-এর মুখে পৌঁছে থামলো বেল্ট, ক্ষণিকের জন্যে। তারপর ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ছুঁড়ে ফেললো বডিটাকে, হা করে থাকা দানবের পেটে। চালু হয়ে গেল যান্ত্রিক দানবের চোয়াল, দাঁত। আর্তনাদ শুরু করলো গাড়ির বডি। বোঝা যাচ্ছে, পিষে ফেলা হচ্ছে ওটাকে।

'খাইছে!' শিউরে উঠলো মুসা। 'শুনে মনে হয়, জ্যান্ত চিবিয়ে খাচ্ছে!'

আবার নড়তে শুরু করেছে ক্রেনের আঁকশি।

আরেকটা বডি তুলে নিয়ে গিয়ে ফেললো বেল্টের ওপর। বেল্ট সেটাকে নিয়ে গেল শেড-এ। আবার চিবানো আর আর্তনাদের পালা। এতো বিশ্রী শব্দ, গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়।

'বুঝলাম, কিভাবে কাজ করে,' বললো কিশোর। 'এসো, এবার আমাদের কাজ শেষ করি।'

খুঁজলো কিছুক্ষণ ওরা। পেলো না কিছুই।

'কি খুঁজছি জানলে আরও সহজ হতো,' ধাঁ করে ধাতব একটা জিনিসে লাথি মারলো মুসা।

'সেকেণ্ড, চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর, 'কি ওটা?' বলতে বলতেই ছুটে এসে তুলে নিলো।

'দেখে তো মনে হয় এককালে খাঁচার অংশ ছিলো,' মন্তব্য করলো রবিন।

'কি করে বুঝলে?' মুসা বললো। 'দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। শিকটিক কিছুই তো নেই।'

'সব কিছু ভর্তা করে দিয়েছে হয়তো মেটাল শ্রেডার,' বললো কিশোর। 'ভুলে যাচ্ছো কেন, যন্ত্রটা কম্পিউটার। ধাতু চেনে। আলাদা আলাদা করে ফেলে।'

'অ্যাঁ, তাই তো?' পরক্ষণেই প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়লো যেন মুসা, কতগুলো

জঞ্জালের ভেতর থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনলো একটা লোহার শিক।

আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলো কিশোর। নাচ জুড়ে দেবে যেন এখুনি। 'এটাই···এটাই বোধহয় খুঁজছি আমরা। দেখি।'

কিশোরের হাতে দিলো ওটা মুসা।

'আরে, সাংঘাতিক ভারি তো। দেখে এতোটা মনে হয় না।' চকচকে চোখে শিকটা দেখছে কিশোর। 'আরেকটা যে আছে, যেটা পেয়েছি···' হাঁ হয়ে গেল হঠাৎ।

'কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'অ্যাঁ? ···' শিকটা কাঁধে ফেললো কিশোর। 'কুইক! বেরিয়ে যাওয়া দরকার।'

'এতো তাড়া কিসের?' মুসা বললো। 'একটা পেয়েই যখন এতো খুশি, আরও খুশি করতে পারি তোমাকে। দাঁড়াও, আরও কয়েকটা শিক খুঁজে দিই।'

চলতে শুরু করেছে কিশোর। 'অন্যগুলো এটার মতো হবে না।'

'কি আছে এটাতে?'

জবাব দিলো না কিশোর। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বেড়ার দিকে।

কাজ সেরে, ফেরার পথে জাঙ্গল ল্যাণ্ড থেকে তিন গোয়েন্দাকে তুলে নিলো বোরিস।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কিশোর। পথে তার সংগে একটা কথাও হলো না রবিন আর মুসার।

ইয়ার্ডে পৌছে গাড়ি থেকে নেমে সোজা ওয়ার্কশপের দিকে ছুটলো কিশোর। ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'নেই!'

'কি নেই?' পাশে এসে দাঁড়ালো রবিন।

'লোহার শিক, যেটা গতরাতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। দরজায় লাগানোর জন্যে যেটা রেখেছিলাম, সেটাও নেই!'

'এখানেই তো রেখেছিলে,' মুসা বললো। 'গেল কোথায়? কিন্তু সাধারণ শিকের জন্যে এমন করছো কেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লো কিশোর। 'দেখি, চাচাকে জিজ্ঞেস করে।'

চত্বরের একধারে বসে আরামে পাইপ টানছেন রাশেদ পাশা। ছেলেদের দেখে মুখ তুললেন।

'চাচা, ওয়ার্কশপে একটা লোহার ডাণ্ডা ছিলো···,' শুরু করলো কিশোর।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত তুললেন রাশেদ পাশা। 'যতো ডাণ্ডা আর শিক আছে সব খুঁজে নেয়া হয়েছে।'

'কেন?'

'কেন?' হাসলেন রাশেদ পাশা। 'অবশ্যই খাঁচাগুলো মেরামতের জন্যে। তোর

চাচী আর রোভার গিয়ে খুঁজে আনলো। একটা লোক এসেছিলো, খাঁচা কিনতে। খুবই নাকি দরকার তার। জরুরী। কিঁ আর করবো। যতো ডাণ্ডা, শিক পেয়েছি, জোগাড় করে মোটামুটি মেরামত করে দিয়েছি খাঁচাগুলো।'

'কে এসেছিলো?' মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের। 'কাল যে কোদালমুখোটা এসেছিলো, সে?'

'না, আরেকজন। ভালো লোক। এতোই মুগ্ধ করে ফেললো আমাকে, কি বলবো, মন পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। সার্কাস পার্টিকে না দিয়ে তাকেই দিয়ে দিলাম। কথাবার্তা, ব্যবহার খুব ভালো লোকটার।'

হতাশ ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়লো কিশোর।

জোরে জোরে পাইপে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ পাশা। 'জানিস, চারটে খাঁচার জন্যে কতো দিয়েছে? চারশো ডলার!'

'চাচা, শ্যাটউইক ভ্যালি থেকে এনেছিলে খাঁচাগুলো, না?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ। আরেকটা স্যালভিজ ইয়ার্ড, তবে ভিন্ন ধরনের, ঠিক আমাদেরটার মতো না। ওদের মূল ব্যবসা গাড়ির বডি জোগাড় করে ধাতু আলাদা করা। তারপর চড়া দামে বিক্রি করে।'

উঠলেন রাশেদ পাশা। অফিসের দিকে পা বাড়াতে যাবেন, ডাকলো কিশোর, 'চাচা, এক মিনিট। লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?'

হাসলেন তিনি। 'জিজ্ঞেস করতে হয়নি, নিজে নিজেই বলেছে। কলিনস। উইলবার কলিনস। জন্তুজানোয়ার নাকি পালে, সেজন্যে খাঁচা দরকার।'

সতেরো

ফোনে হ্যানসনকে পাওয়া গেল। রোলস রয়েস নিয়ে তাকে আসার জন্যে অনুরোধ করলো কিশোর।

গাড়ি আসতে আসতে তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে নিলো তিনজনে।

গাড়িতে উঠে বসে রবিন বললো, 'কিশোর, এইবার বলো, এসবের মানে কি?'

'খুব সহজ,' জবাব দিলো কিশোর। 'লোহার শিকের ভেতরে ভরে হীরা চোরাচালান করছে কলিনসরা।'

'তোমার মাথা–টাতা ঠিক আছে তো, কিশোর?' মুসা বললো। 'ইয়ার্ডে যেটা কুড়িয়ে পেয়ে দিলাম তোমাকে, ওরকম শিকের কথা বলছো?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'কিন্তু ওটাতো নিরেট লোহা। ওর ভেতরে ভরে হীরা আনে কিভাবে?'

'নিরেট হলে পারবে না, কিন্তু ভেতরে ফাঁপা হলে? মনে আছে, শিকটা হাতে নিয়ে বলেছিলাম, বেজায় ভারি? গতরাতে যেটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার চেয়ে তোমারটা ভারি। তারমানে তোমারটা নিরেট।'

'কিন্তু বুঝলে কি করে শিকের ভেতর হীরা আছে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'প্রথমে শুধুই সন্দেহ ছিলো। যখন শুনলাম, উইলবার কলিনস এসে খাঁচাগুলো কিনে নিয়ে গেছেন, শিওর হয়ে গেলাম। ভেতরে দামী কিছু না থাকলে এতো আগ্রহ দেখিয়ে এতো টাকা দিয়ে ওই ভাঙা খাঁচা কিনতে আসতেন না কলিনস। কপাল খারাপ আমার, শিকটা হাতে পেয়েও হারিয়েছি। আমি এখনও বুঝতে পারছি না, এতো দেরিতে খাঁচাগুলো কিনতে এলেন কেন কলিনস?'

'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না,' মাথা ঝাড়লো মুসা। 'জানেনই যদি ওগুলোর ভেতরে হীরা আছে, প্রথমে ফেলে দিয়েছিলেন কেন?'

'পরিস্থিতি খারাপ ছিলো হয়তো তখন। কিংবা নিশ্চয় কোনো কারণ ছিলো। তাই, বেড়ার ওপাশে ইয়ার্ডে ফেলে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, সময়-সুযোগমতো আবার তুলে এনে হীরাগুলো বের করে নেবেন। কিন্তু কোনোভাবে খাঁচাগুলো ইয়ার্ডের অন্য খাঁচার সংগে মিশে যায়। ওগুলো কিনে নিয়ে আসেন রাশেদচাচা?'

'এটা সম্ভব,' মাথা দোলালো রবিন। 'তারপর হয়তো ইয়ার্ডের লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন কলিনস, কে কিনেছে খাঁচাগুলো। নাম ঠিকানা জোগাড় করেছেন। খোঁজখবর করতেই দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা ব্যাপার, ডেইমিং আর ডারেল জানে হীরাগুলোর কথা। সে-কারণেই ডেইমিং যখন গিয়েছিলো তোমাদের ইয়ার্ডে, লোহার পাইপ, ডাণ্ডা, এসব জিনিসের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'আমি ভাবছি,' আবার বললো রবিন, 'অন্য খাঁচাগুলোও ওরাই কিনে নিলো না তো?'

'অন্য খাঁচা?' মুসা বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ। মেরিচাচী যেগুলো বিক্রি করেছেন? আমরা তখন জাঙ্গল ল্যাণ্ডে ছিলাম।'

'নাহ্, ওগুলোতে ছিলো না,' বললো মুসা। 'ওগুলো অনেক বেশি লম্বা ছিলো, খাঁচার শিক না। ভারিও অনেক বেশি। ওগুলো নিখাদ লোহা।'

'আমারও তাই ধারণা,' একমত হলো কিশোর। 'ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। যে খুশি কিনুকগে।'

'কিশোর,' মুসা মুখ ফেরালো, 'গতরাতে যে শিকটা পেলে, ওটা ওখানে বনের মধ্যে এলো কোথেকে? কিভাবে?'

'হতে পারে, আলগা ছিলো। কলিনস যখন খাঁচাটা তুলে ইয়ার্ডে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, শিকটা তখনই কোনোভাবে খুলে পড়ে গেছে। খেয়াল করেননি তিনি।'

'তা নাহয় হলো,' বললো রবিন। 'কিন্তু খাঁচা এসেছে কয়েকটা, তাতে শিকও অসংখ্য। কলিনস বুঝলেন কি করে, কোনটাতে কোনটাতে আছে হীরা?'

'উপায় আছে,' মুচকি হাসলো কিশোর।

'কিভাবে?'

হঠাৎ জানালার দিকে মুখ ফেরালো কিশোর। রবিন বুঝলো, পেটে বোমা মারলেও এ-সম্পর্কে আর একটা কথা বের করা যাবে না এখন গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ থেকে। তার স্বভাব ওরকমই। কিছু কিছু কথা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপন রাখে সে, কিছুতেই ভাঙতে চায় না। কেন, সে-ই জানে।

বিরক্তিতে মুখ বাঁকালো রবিন। 'আসল রহস্যটাই এখনও বাকি। যেটার তদন্ত করতে গিয়েছিলাম আমরা। ভিকটরকে নার্ভাস করলো কে? ছাড়লো কে?'

'শীঘ্রি সেটা জানতে পারবো,' বাইরের দিকে চেয়ে থেকে বললো কিশোর। 'হতে পারে, মিস্টার কলিনসই ছেড়েছেন। তারপর নিজেই খুঁজতে বেরিয়েছেন। ভাবখানা, যেন তিনি কিছুই জানেন না।'

'কেন করবেন এরকম?' কথা ধরলো মুসা। 'সব তালগোল পাকানো। কোনোটাই স্পষ্ট হচ্ছে না আমার কাছে।'

'আজ সকালের কথাই ধরো,' মুসার সুরে সুর মিলিয়ে বললো রবিন। 'ভিকটরকে নিয়ে মিস্টার কলিনস ছিলেন সেটের কাছে। আমরা দেখেছি। চিতার খাঁচার দরজা খোলা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। কে খুললো? আবার ওদিকে ডাক্তার বললেন, দোষটা তাঁর।'

'হতে পারে,' জবাব দিলো কিশোর, 'ডাক্তারও সব জানেন। কলিনসকে, হয়তো বা ডিককেও, বাঁচানোর জন্যে সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন।'

জাঙ্গল ল্যাণ্ডে পৌঁছলো গাড়ি।

নেমে সাদা বাড়িটার দিকে এগোলো ছেলেরা।

'বড় বেশি নীরব,' হাঁটতে হাঁটতে বললো মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। কথা বললো না।

আরও খানিক দূর এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'কি যেন শুনলাম?' কান পেতে রয়েছে কিশোর। 'আবার কোনো খাঁচার দরজা খোলা নয় তো? দেখেশুনে কাছে যাওয়া উচিত।'

বাড়ির কিনারের খালি জায়গার দিকে এগোলো ওরা। ঘাসবন আর ঝোপঝাড়ের

কিনার ঘেঁষে চলছে।

'বেশি নীরব...,'

কথা শেষ করতে পারলো না কিশোর। তার আগেই বাধা এলো। কি যেন এসে পড়লো মাথার ওপর।

রবিন আর মুসার মাথায়ও পড়লো।

কঠিন হাত চেপে ধরলো ওদের।

মুখ-মাথা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ফেলা হলো। চিৎকার করলো ওরা, কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল।

জোরাজুরি করলো ওরা, হাত-পা ছুঁড়লো। লাভ হলো না। ধরা পড়লো অচেনা শত্রুর হাতে।

আঠারো

কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু এঞ্জিনের শব্দ কানে আসছে। গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের।

এক জায়গায় এসে থেমে, বন্দিদের গায়ে কম্বল আরও ভালো করে জড়ানো হলো। তার ওপর পেঁচিয়ে বাঁধা হলো দড়ি দিয়ে। তারপর তুলে বয়ে নিয়ে চললো, একজন একজন করে।

কিসের ভেতর যেন ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওদেরকে। বুঝতে পারলো ওরা, নরম গদির ওপর রাখা হয়েছে। খটাং করে দরজা বন্ধ হলো।

চলে যাচ্ছে লোকগুলো, পায়ের আওয়াজ বোঝা গেল। নীরব হয়ে গেল তারপর।

হঠাৎ চালু হলো যন্ত্র, বিকট শব্দ।

ওরা যেটার ভেতরে রয়েছে, তার ওপর এসে পড়লো কি যেন। ঝনঝন, ক্যাঁচম্যাচ করে উঠলো। ঝটকা দিয়ে উঠে গেল শূন্যে। হুড়মুড় করে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়লো ওরা।

'আরি!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন, মুখে এখন আর চাপ নেই, স্পষ্টই বোঝা গেল কথা। 'ওপরে তুলছে মনে হয়?'

'হ্যাঁ,' কিশোর বললো। 'জলদি কিছু করা দরকার আমাদের। কম্বল সরাতে পারলে অন্তত দেখতে পারবো কি হচ্ছে।'

অনেক চেষ্টা করলো ওরা। কিছুই করতে পারলো না। কম্বল পেঁচানো, তার ওপর দড়ি দিয়ে বাঁধা।

'হুপ-হুপ-হুপ-হুপ' শব্দ কানে আসছে।

'মারছে!' মুসা আতঙ্কিত। 'কনভেয়র বেল্টের আওয়াজ! পুরনো গাড়ির ভেতর ভরা হয়েছে আমাদেরকে। ক্রেনের আঁকশি তুলে নিয়েছে গাড়িটা!'

নামিয়ে দেয়া হলো গাড়িটা। দুলুনি বন্ধ হয়ে গেছে। আচমকা 'হুপ' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি!

ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। সেই সাথে এগোচ্ছে ছেলেরা, শেডের মুখের দিকে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

ছাড়া পাওয়ার জন্যে আরেকবার চেষ্টা চালালো ওরা।

বৃথা চেষ্টা।

চলছে বেল্ট, এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ওরা।

যন্ত্রের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল সে চিৎকার, নিজেরাই শুনতে পেলো না ভালোমতো, বাইরের কে শুনবে?

'জলদি নামাও!' শোনা গেল একটা কণ্ঠ। থেমে গেছে যন্ত্রের শব্দ।

টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে বের করে মাটিতে নামানো হলো ওদের।

গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরাতে সোজা ডেইমিঙের চোখে চোখ পড়লো কিশোরের। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ইয়া বড় এক ছুরি দিয়ে মুসার বাঁধন কাটছে ডারেল। আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে কাছেই, পরনে ইউনিফর্ম, মাথায় ধাতব হেলমেট। অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, ইয়ার্ডের মেশিন-চালক সে। চোখে অবাক দৃষ্টি।

'তারপর?' হাসিমুখে বললো ডেইমিং। 'কেমন লাগছে? গেছিলে তো আরেকটু হলেই।'

উঠে বসে মাথা ঝাঁকালো শুধু কিশোর। বোকা হয়ে গেছে যেন।

মুক্ত হলো রবিন আর মুসাও। শরীরের এখানে ওখানে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিচ্ছে।

'সময়মতোই এসেছি,' বললো ডেইমিং। 'কি হয়েছিলো? কি করেছিলে?'

'কারা যেন কম্বল ছুঁড়ে ফেললো আমাদের মাথায়,' ডেইমিঙের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললো কিশোর। 'আর কিছুই দেখলাম না। তারপর বেঁধে নিয়ে এলো এখানে। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের বাঁচানোর জন্যে।'

'কারা এনেছে?'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'এতো দ্রুত ঘটে গেল সব, কিছুই দেখার সময় পাইনি। উইলবার কলিনসের বাড়ির কাছে...,' থেমে গেল সে। 'আপনারা কি করে জানলেন

আমরা এখানে আছি?'

'কাছাকাছিই ছিলাম আমরা,' বললো কোদালমুখো। সঙ্গীকে দেখিয়ে বললো, 'ডারেল হঠাৎ বললো, পুরনো গাড়িতে কি ভরতে দেখেছে সে। দেখতে এলাম। দেখি, লোকগুলো পালিয়ে যাচ্ছে, মুখে রুমাল বাঁধা। ক্রেনের আঁকশি তুলে নিলো গাড়িটা, আমরা কিছু করার আগেই। দৌড়ে এসে কন্ট্রোল রুমে...

কেঁপে উঠলো মুসা। 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার! আরেকটু হলেই...' ভয়ে ভয়ে তাকালো শেড-এর মুখের দিকে।

'কারা ধরেছিলো তোমাদেরকে?' জিজ্ঞেস করলো ডেইমিং। 'কি করেছো তোমরা, যে মেরেই ফেলতে চেয়েছিলো?'

মুখ তুললো কিশোর। 'একটা তদন্ত করছি। কাদের সন্দেহ করছি, নাম বলার সময় আসেনি এখনও।'

হাসলো কোদালমুখো। 'তাই, না? ধরো, আবার কম্বল জড়িয়ে বেল্টে তুলে দেয়া হলো তোমাদের। শেডের ভেতর গিয়ে তখন চমৎকার গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে। দেবো নাকি তুলে?'

আড়চোখে কনভেয়র বেল্টের দিকে তাকালো কিশোর। 'আসলে আপনাদের দু'জনকেও সন্দেহ করেছি আমরা। তবে, এখন বুঝতে পারছি, হীরা চোরাচালানের সঙ্গে আপনারা জড়িত নন, তাহলে আমাদের বাঁচাতেন না।'

সঙ্গীর দিকে ফিরে ভুরু নাচিয়ে বললো ডেইমিং, 'কি ডারেল, বলিনি ছেলেটা ভীষণ চালাক? জেনে ফেলেছে সব।' কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলো। 'তো ইয়াং ম্যান, আশা করি এবার বলবে ওগুলো কোথায় আছে?'

'বলতে পারবো না। কারণ, জানি না।'

ঝটকা দিয়ে সঙ্গীর দিকে মুখ ফেরালো ডেইমিং। 'খামোখা সময় নষ্ট করছি এখানে। জলদি চলো। দেরি করলে পালিয়ে যাবে ব্যাটারা।'

উনিশ

দরজা খুলে অবাক হলো ডিক। 'আরে, কিশোর, তোমরা?'

'ডেইমিং, আর আরেকজন লোক, ডারেল, এসেছে এখানে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা নাড়লো ডিক। 'না তো। কেন?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। গেল কোথায় ওরা? 'তোমার চাচা তো বাইরে গেছেন, না?'

আবার মাথা নাড়লো ডিক। 'না, ঘরেই তো, ভিক্টরের কাছে, শুয়ে আছে। দাঁড়াও, ডাকি।'

ডিক চলে গেলে দুই সহকারীর দিকে তাকালো কিশোর।

'অবাক কাণ্ড!' বললো মুসা। 'আমিও ভেবেছিলাম দু'জনে এখানে এসেছে। গেল কোথায়?'

'বোধহয় খাঁচাগুলো খুঁজতে,' অনুমান করলো রবিন।

'কিসের খাঁচা?' হাসিখুশি একটা কণ্ঠ শোনা গেল। দরজায় দেখা দিলেন কলিনস।

'আপনার পুরনো খাঁচাগুলো, মিস্টার কলিনস,' কিশোরের জবাব।

অবাক হলেন কলিনস। 'কি বলছো?'

'জানার তো কথা আপনার, মিস্টার কলিনস। ভিক্টরের ফেলে দেয়া খাঁচাটা, সেই সংগে আরও তিনটে। যেগুলো আজ গিয়ে আমাদের ইয়ার্ড থেকে কিনে এনেছেন।'

কলিনসের চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'আ–আমি!'

'খাঁচাগুলো এনে কোথায় রেখেছেন, মিস্টার কলিনস?' এবার প্রশ্ন করলো রবিন। 'যেগুলোর শিকের ভেতর হীরা লুকানো রয়েছে?'

বুদ্ধু বনে গেছেন যেন, এমন ভাব করে একে একে তিন ছেলের মুখের দিকে তাকালেন কলিনস। 'ওকে। খুলে বলো সব।'

অস্বস্তি ফুটলো মুসার চোখে। 'একটা সত্যি কথা অন্তত বলুন। আমাদেরকে বেঁধে মেটাল শ্রেডারে ফেলে দিয়ে আসায় আপনার হাত আছে তো?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কলিনস। ভাতিজার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলে ওরা?'

চাচার মতোই ডিকও মাথা নাড়লো। 'জানি না।'

'আপনি বলেছিলেন আপনার একটা সমস্যা হয়েছে,' রবিন বললো, 'তাই আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। ভিক্টরকে কেউ নাজেহাল করে—তাই না? অথচ খোঁজ করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো আরেক কিচ্ছা। আপনি আর আপনার ভাই সিলভার, চোরাচালানী দলের সদস্য। জানোয়ারের খাঁচায় করে হীরা পাচার করেন। কোনোভাবে একটা চালান হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই আজ গিয়ে কিশোরদের ইয়ার্ড থেকে চারটে খাঁচাই কিনে এনেছেন।'

'পাগল হয়ে গেছো তোমরা!' এতোক্ষণে রাগলো ডিক। 'আজ সকাল থেকে কাকুর সংগে ছিলাম। জাঙ্গল ল্যাণ্ড থেকেই বেরোয়নি আজ।'

কলিনসের দিকে তাকালো কিশোর। 'বেরোননি?'

মাথা নাড়লেন কলিনস।

'কিন্তু আমার চাচা তো বললো, উইলবার কলিনস নামে একজনের কাছে বিক্রি

করেছে। বোকামি করে ফেলেছি, চেহারা কেমন ছিলো, জিজ্ঞেস করিনি চাচাকে। এখন আন্দাজ করতে পারছি, কে...'

'ডারেল?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হতে পারে।' আবার কলিনসের দিকে তাকালো কিশোর। 'হীরার ব্যাপারে কিছু জানেন না আপনি?'

'তুমি কি বলছো, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'ভিকটরের খাঁচাটা ফেলে দিলেন কেন?'

হাত নাড়লেন কলিনস। 'পুরোপুরি পোষ মানার পর আর খাঁচায় রেখে কি লাভ? জঞ্জাল ফেলার জায়গা যখন বাড়ির কাছেই আছে, দূরে যাওয়ার আর দরকার হলো না। বেড়ার ওপাশে ইয়ার্ডে ফেলে দিলাম।'

'কিন্তু ভিকটরকে ঘরে নিয়ে আসার পরেও অনেকদিন খাঁচাটা ফেলেননি, তাই না?'

'হ্যাঁ। ফ্র্যাঙ্কলিন সিন এসে ভিকটরকে ভাড়া করার কথা বলার পর ফেলেছি। সিংহটা বুনোই রয়ে গেছে, সিন একথা ভাবুক, তা চাইনি।'

চেহারা বিকৃত করে ফেললো কিশোর। 'মাপ চাইছি, মিস্টার কলিনস। অনেক আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি। আমারই বোঝার ভুল।'

'ভুল আমরা সবাই করি, কিশোর। খুলে বলো তো সব, হয়েছেটা কি?'

গোড়া থেকে শুরু করলো কিশোর, একেবারে খাঁচাগুলো তাদের ইয়ার্ডে পৌঁছার সময় থেকে। ডেইমিঙের খাঁচা কিনতে যাওয়ার কথা বলে বললো, 'অথচ ডিক জানালো, ওর নাম জিনজার। সিনের সংগে কাজ করে।' লোকটার চেহারার বর্ণনা দিলো।

'হ্যাঁ, সেটের কাছাকাছি দেখেছি বলে মনে পড়ছে,' বললেন কলিনস।

'গতরাতে ইয়ার্ডে ঢুকেছিলো সে,' জানালো রবিন। 'সংগে আরেকজন ছিলো, নাম ডারেল। চোরাই হীরার কথা বলাবলি করেছে ওরা। ওরাই আজ বাঁচিয়েছে আমাদের। আরেকটু হলেই পিষে ফেলতো মেটাল শ্রেডার।'

চুপচাপ সব শুনলেন কলিনস। তারপর বললেন, 'সরি, বয়েজ। কিছু বুঝতে পারছি না কিছু। ধরলাম, হীরা চোরাচালান হয়ে আসে এখানে। তবে,' তর্জনী নেড়ে বললেন, 'একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি। আমার ভাই সিলভার নেই এসবে।'

চুপ করে ভাবলো কিছুক্ষণ কিশোর। 'গত ক'মাসে ক'টা খাঁচা ফেলেছেন, বলবেন?'

'গত ক'মাসে নয়, বছরখানেক আগে গোটা তিনেক ফেলেছি। শেষ ফেলেছি ভিকটরের খাঁচাটা। মাঝে আর একটাও না।'

'তাহলে ওই খাঁচাটা দিয়েই শুরু। আচ্ছা, ভিকটর কেমন আছে আজ?'

হাসলেন কলিনস। 'ভালো, খুব ভালো। চমৎকার অভিনয় করেছে। ভালো শুটিং। সিন খুব খুশি। ঘরে শুয়ে এখন ঘুমাচ্ছে সিংহটা। খানিক আগে ডাক্তার এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।'

সহকারীদের দিকে ফিরলো কিশোর। 'যাওয়া দরকার। কাজ আছে, চলো।'

এগিয়ে দিতে এলো ডিক। হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'দরকার পড়লে আবার এসো। চাচা কিছু মনে করেনি...'

'করলেও দোষ দেয়া যাবে না তাঁকে,' তিক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছি। তোমার কাছেও মাপ চাইছি, ডিক।'

'আরে, দূর, কি যে বলো।'

একটা আলগা পাথরে পা পিছলে হঠাৎ আছাড় খেলো কিশোর। উঠে বসলে দেখা গেল, হাত ঝাড়ছে। কড়ে আঙুল মুখে দিয়ে চুষলো। কোনো কিছুতে লেগে কেটে গেছে আঙুলের মাথা।

'কি হলো? বেশি লেগেছে?' ঝুঁকে এলো ডিক।

'না, সামান্য...'

'সামান্য কোথায়? রক্ত বেরোচ্ছে। চলো, ঘরে চলো ওষুধ লাগিয়ে দিই।'

ঘরে ঢুকে ডিক বললো, 'ডাক্তার চাচা থাকলে ভালো হতো। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে পারতো। ...আরে, তার ব্যাগ ফেলে গেছে। কখনও তো এরকম হয় না।'

একটা চেয়ারের ওপর পড়ে আছে বহুব্যবহৃত, পুরনো, মলিন চামড়ার ব্যাগটা। ওটার দিকে স্থির চেয়ে থেকে কিশোর বললো, 'ঠিক আছে, আমিই ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিতে পারবো। ব্যাগ ধরলে কিছু মনে করবেন না তো ডাক্তার?'

'আরে না না, কি মনে করবেন? যাও না।'

ব্যাগ খুলে হাত ঢোকালো কিশোর। ব্যাণ্ডেজের কাপড় বের করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো আরেকটা জিনিস। হলদে একটুকরো কাগজ।

'কারও পুরনো প্রেসক্রিপশন বোধহয়, রেখে দাও,' বললো ডিক।

রাখতে গিয়েও লেখার দিকে চোখ পড়ে যাওয়ায় আর রাখলো না কিশোর। বড় বড় হয়ে গেল চোখ।

'কী?' এগিয়ে এলো রবিন।

কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো কিশোর, 'বিশ্বাসই হচ্ছে না! কিন্তু...হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি, সবকিছু পরিষ্কার। 'কি বিড়বিড় করছো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'কি পরিষ্কার?'

কাগজটা বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'নিজেই পড়ে দেখো।'

জোরে পড়লো মুসাঃ 'ডক্স রক্স নক্স এক্স রেক্স বক্স।'

'মানে কি এর?' হাত নাড়লো ডিক।

'এর মানে হলো,' কিশোর বললো, 'সবকিছুর পেছনে এমন একজন লোক রয়েছে, যাকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি।'

'মানে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন কলিনস। কথা শুনে দেখতে এসেছেন আবার, কারা।

'শুনলে খুব খারাপ লাগবে আপনার,' ঘুরে দাঁড়ালো কিশোর। 'ডাক্তার হ্যালোয়েন।'

হাসলেন কলিনস। 'আবার না বুঝে কথা বলছো, কিশোর। ডাক্তার আমার পুরনো বন্ধু। দেখি, কাগজটা?'

তাঁর হাত বাড়ানো থাকতে থাকতেই দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকলো বিশালদেহী একজন লোক। 'ডাক্তারের ব্যাগ নিতে এসেছি। ভুলে ফেলে গেছেন।' ব্যাগটা খোলা দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। মুসার হাতে হলুদ কাগজের টুকরোটা দেখে জ্বলে উঠলো চোখ। চেঁচিয়ে বললো, 'এই ছেলে, ব্যাগ খুলেছো কেন?' টান দিয়ে কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিলো সে। মুচড়ে দলা পাকিয়ে হাত বাড়ালো ব্যাগের দিকে।

এগিয়ে এলেন কলিনস। 'ব্রড, এক মিনিট...'

চোখের পলকে পিস্তল বেরিয়ে এলো ব্রডের হাতে। 'সরো।' ধমকে উঠলো সে। 'নইলে মরবে বলে দিলাম।'

ঢোক গিললো কিশোর। শুকনো কণ্ঠে বললো, 'তুমিই সেই লোক, যে খাঁচাগুলো আনার সময় মিথ্যে করে উইলবার কলিনসের নাম বলে এসেছো?'

কুৎসিত হাসি হাসলো ব্রড। 'বাহ্, চালাক ছেলে।'

জোরে শিস দিয়ে উঠলেন কলিনস।

নরম মাংসের প্যাড লাগানো ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। চমকে ফিরে তাকালো ব্রড। দরজায় বিশাল সিংহটাকে দেখে কঠিন হলো চোয়াল।

দরজা জুড়ে দাঁড়ালো ভিকটর। হলুদ চোখে আগুন। ধীরে ধীরে লেজ নাড়ছে। চাপা ঘড়ঘড় বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে।

সামান্য সময়ের জন্যে ফিরেছে ব্রড, ওই মুহূর্তটার সদ্ব্যবহার করলো মুসা। ধাঁই করে থাবা মেরে বসলো ব্রডের হাতে, উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। খটাস করে পড়লো মেঝেতে।

গাল দিয়ে উঠলো ব্রড। পিস্তলটার দিকে পা বাড়াতেই বাধা দিলেন কলিনস। 'খবরদার, ব্রড। আর একটা পা বাড়ালেই সিংহের খাবার হয়ে যাবে তুমি। ভিকি?'

জবাবে রক্তপানি করা গর্জন ছাড়লো ভিকটর।

থমকে গেল ব্রড। কুৎসিত মুখটাকে আরও কুৎসিত করে দিলো হতাশা। ধপাশ করে বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

'গুড বয়,' হেঁটে গিয়ে পিস্তলটা তুলে নিলেন কলিনস। ব্রডের কাছে এসে তার মুখের সামনে নেড়ে বললেন, 'এবার মুখ খোলো তো, বাপু। চোরাই হীরাব গল্প শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমরা।'

বিশ

'ওই যে, ডাক্তারের বাড়িঘর,' হাত তুলে একটা গোলাবাড়ির ওপাশে ছোট বাড়ি দেখালো ডিক, 'ডিসপেনসারি।'

গোলাঘরের কাছ থেকে খটাং খটাং আওয়াজ ভেসে আসছে।

কিশোর হাসলো। 'আমার চাচামিয়ার কাজ তো, ডাক্তার আন্দাজ করতে পারেনি।'

'মানে?' ডিক বুঝতে পারলো না।

'চলো, নিজের চোখেই দেখবে।'

গোলার পাশে ড্রাইভওয়েতে লরিটা দাঁড়িয়ে আছে। হুডখোলা জীপটাও। পাশে পড়ে আছে চারটে খাঁচা। একটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার, এক হাতে হাতুড়ি, আরেক হাতে প্লায়ার্স।

পায়ের আওয়াজে ফিরে তাকালো সে। ভুরু কোঁচকালো। 'কি হয়েছে, উইলসার? কোনো গোলমাল?'

মাথা ঝাঁকালেন কলিনস। কালো ব্যাগটা ডাক্তারের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'ব্যাগটা নাকি খুঁজছিলে? ফেলে এসেছিলে আমার ঘরে।'

'হ্যাঁ। থ্যাংকিউ। কিন্তু ব্রডকে তো আনতে পাঠিয়েছিলাম। ও গেল কোথায়?' খাঁচার দিকে চেয়ে বিরক্তি ফুটলো ডাক্তারের চোখে। 'আমি একা পারছি না। ওকে দরকার।'

'একটা জরুরী কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি,' বললেন কলিনস। 'আমরা সাহায্য করি? কি করতে হবে?'

হাতের হাতুড়ির দিকে তাকালো ডাক্তার। 'শিকগুলো শক্ত কিনা শিওর হয়ে নিচ্ছি। আর দুর্ঘটনা চাই না। এরপর কোনো জানোয়ার ছুটলে সোজা গিয়ে আদালতে উঠবে সিন।'

হাসলেন কলিনস। 'থ্যাংকস, ডাক্তার। আমার জন্যে অনেক ভাবো তুমি।'

কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কোন শিকে, বের করতে পারবে?'

'আশা করি,' মাথা কাত করলো কিশোর। 'হাতুড়িটা লাগবে।'

'ডাক্তার,' কলিনস বললেন, 'তোমার হাতুড়িটা দাও তো ওকে।'

দ্বিধা করলো ডাক্তার। হাতুড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কি করবে?'

'ওরা গোয়েন্দা,' তিন কিশোরকে দেখালেন কলিনস। 'ওদের আমিই ডেকে এনেছি। ভিকটর কেন নার্ভাস হয়ে যায়, তদন্ত করে দেখার জন্যে। ওরা এসে আজগুবী গপ্পো শোনালো আমাকে, চোরাই হীরার কারবার নাকি চলছে এখানে।'

'আজগুবীই,' মলিন দেখালো ডাক্তারের হাসি। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় আছে হীরা?'

'দয়া করে যদি একটু সরেন, স্যার,' অনুরোধ করলো কিশোর।

'নিশ্চয়,' সরে জায়গা করে দিলো ডাক্তার। 'দেখো, জোরে বাড়ি মেরো না। শিকটিক খুলে ফেলো না আবার। অনেক কষ্টে টাইট দিয়েছি।'

'আপনি দেননি,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'দিয়েছে আমার চাচা, আর রোভার।'

বিস্মিত হলো ডাক্তার।

'দেখছেন না, কি আটকান আটকেছে,' আবার বললো কিশোর। 'কাস্টোমারের কমপ্লেন শুনতে রাজি না চাচা। কাজ যা করবে, তাতে খুঁত থাকতে দেবে না।'

'ইনটারেসটিং,' বললো ডাক্তার।

'সেজন্যেই এতো পিটিয়েও এখনও আলগা করতে পারেননি।' তিনটে শিক দেখালো কিশোর। বাড়ি লেগে বাঁকা হয়ে গেছে। এক এক করে প্রত্যেকটা শিক ঠুকে দেখলো সে। ফিরে চেয়ে বললো, 'এটাতে দুটো আছে।'

কলিনসের দিকে চেয়ে বললো ডাক্তার, 'ছেলেটা কি বলছে?'

'দেখি, কি করে ও,' জবাব দিলেন কলিনস।

'বেশির ভাগ শিকই মরচে ধরা,' নাটক করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না কিশোর। 'তারমানে দীর্ঘদিন বাইরে রোদবৃষ্টির মধ্যে পড়ে ছিলো। মিস্টার কলিনসের ফেলে দেয়া যে কোনো খাঁচার শিক হতে পারে ওগুলো। এই যে এই শিকটা, এটাও মরচে ধরা। এর ভেতরটা ফাঁপা।' হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিলো। 'বাড়ি দিলে দেখছেন কেমন আওয়াজ করে? এটা ভিকটরের খাঁচা থেকে এসেছে।

'আর এই যে, এটা,' খাঁচার আরেক দিকে গিয়ে আরেকটা শিকে বাড়ি দিলো কিশোর, 'এটাও ফাঁপা। এর গায়ে মরচে নেই। তারমানে এটা বাইরে পড়ে থাকেনি খুব একটা। নতুন এসেছে। এটা গরিলার খাঁচার শিক। গরিলাটা যে রাতে এসেছে, খাঁচা থেকে শিকটা সেই রাতেই খুলে নিয়েছে ব্রড। এটা যেখানে ছিলো, তার পাশের দুটো শিক বাঁকিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো গরিলাটা। আমার ধারণা, ব্রডের পিছু

নিয়েছিলো। ভয় পেয়ে যায় ব্রড। দৌড়ানোর সময় হাত থেকে ফেলে দেয় শিকটা। ভয়ে ছোটার সময় আমি আছাড় খেয়ে পড়ি ওটার ওপর।'

'কিন্তু ব্রড জানলো কি করে, এটা তোমার হাতে পড়েছে?' জিজ্ঞেস করলো ডিক।

'কাল রাতে ওর তাড়া খেয়েই তো দৌড়াচ্ছিলাম। পড়লাম আছাড় খেয়ে। হাতে ঠেকলো শিকটা। তুলে নিলাম। আমার হাত থেকে এটা কেড়ে নেয়ার জন্যেই আরও জোরে দৌড়াচ্ছিলো ব্রড, তখন বুঝতে পারিনি। এটা তুলে নিয়েছিলাম আত্মরক্ষার জন্যে, একটা অস্ত্র। আমি এটা নিয়ে গেছি, পরে ব্রড নিশ্চয় বলেছে ডাক্তার হ্যালোয়েনকে। ডাক্তার আমাদের ঠিকানা দিয়েছে, মানে ইয়ার্ডের ঠিকানা। ওখানে গিয়ে শুধু এই শিকটাই নয়, আরও খাঁচা দেখেছে ব্রড। কিনে নিয়ে এসেছে সব। এমনিতেও খুঁজছিলো ওগুলো।'

'এর ভেতরেই আছে, এতো শিওর হচ্ছো কেন?' বললো ডিক।

'হচ্ছি না তো। আন্দাজ করছি। খুললেই বুঝতে পারবো। তবে পাবো আশা করি, সংকেতের সংগে মিলছে তো।'

'যেমন?'

'প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা আর করলাম না। মোটামুটি ধরে নেয়া যায়ঃ বলা হয়েছে, সিংহের খাঁচায় আছে হীরাগুলো। বের করে নাও। এটা, আগের মেসেজ। গরিলার খাঁচা পাঠানোর পর নিশ্চয় নতুন মেসেজ পাঠানো হয়েছে, তাই না ডাক্তার সাহেব?'

জবাব শোনার অপেক্ষায় না থেকে বলে গেল কিশোর, 'গতরাতে খাঁচাটাকে কিভাবে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করেছিলো ডাক্তার, মনে আছে? চিতার খাঁচাটাও। প্রতিটি শিক। তখনই অদ্ভুত লেগেছিলো ব্যাপারটা, কিন্তু সন্দেহ করিনি কিছু। আসলে, ওভাবে ঠুকে ফাঁপা শিক খুঁজছিলো ডাক্তার।' হ্যালোয়েনের দিকে ফিরলো সে। 'প্লায়ারসটা দেবেন, প্লীজ?'

নীরবে যন্ত্রটা বাড়িয়ে দিলো ডাক্তার।

একটা ফাঁপা শিকের মাথার কাছটা প্লায়ারস দিয়ে চেপে ধরে জোরে মোচড় দিলো কিশোর। কয়েকবার মোচড়াতেই প্যাঁচ খুলে গেল। শিকের নিচের দিকের প্যাঁচও ওভাবে খুললো সে। চ্যাপ্টা লোহার বারের সংগে স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে শিকের দুই মাথা। ওগুলো খুলে শিকটা খুলে আনলো সে। সবাই ঘিরে ধরলো তাকে। আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

দেখা গেল, বিশেষ ধরনের ক্যাপ লাগানো রয়েছে শিকের মাথায়। একদিকে। প্লায়ারস দিয়ে চেপে ধরে ওই ক্যাপ খুললো কিশোর। খোলা মাথাটা কাত করতেই ভেতর থেকে হুড়হুড় করে পড়লো হলদেটে অনেকগুলো পাথর।

'ওগুলো হীরা?' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'আনকাট ডায়মণ্ডস, অর্থাৎ, আকাটা হীরা। খনি থেকে তুলে সোজা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'খাইছে! টনখানেকের কম হবে না!'

'বেশি বাড়িয়ে বলো তুমি,' পাথরের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'টন কি এতো সোজা? কাল রাতে ডেইমিং বলেছিলো, ছ'শো কে, মনে আছে? তারমানে, কে দিয়ে ক্যারাট বোঝাতে চেয়েছিলো। এক ক্যারাটের বর্তমান বাজার দর মোটামুটি দুই হাজার ডলার যদি ধরি, তাহলে এখানে যা আছে, কাটার খরচ বাদ দিয়ে, আমার অনুমান, পাঁচ লাখ ডলারের কম হবে না। আরেকটা শিক থেকে যা বেরোবে, তা-ও যদি পাঁচ হয়, তাহলে হবে দশ লাখ ডলার। একথাই বলেছিলো কাল রাতে, ডেইমিং।'

পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন কলিনস, 'তোমার এই কাজ, ডাক্তার!

সাড়া নেই।

ফিরে তাকালো সবাই। কোথায় ডাক্তার? সকলের অলক্ষ্যে চলে গেছে। জীপের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

'পালাচ্ছে তো!' চেঁচিয়ে উঠে দৌড় দিলো মুসা।

পিছিয়ে এসে পথের দিকে নাক ঘোরালো জীপ। ঠিক ওই সময় বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এলো দুটো গাড়ি। জীপের পথরোধ করলো।

জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে বনের দিকে দৌড় দিলো ডাক্তার।

দুই গাড়ি থেকে নামলো দু'জন লোক। ডাক্তারের পিছু নিলো।

'ডেইমিং!' চিৎকার করে বললো রবিন। 'ডারেল!'

পালাতে পারলো না ডাক্তার। ধরে নিয়ে এলো তাকে দুই আগন্তুক।

'এই যে, ওনার কথাই বলেছিলাম,' কলিনসকে বললো কিশোর। 'ওনার নাম ডেইমিং।'

'না না, জিনজার,' প্রতিবাদ করলো ডিক।

হেসে মাথা নাড়লো কোদালমুখো। 'দু'জনেই ভুল। আমার নাম আসলে মাইকেল হ্যামার।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিলো, পরিচয়পত্র।

পড়ে লাল হলো কিশোরের মুখ। 'আপনি কাস্টমসের লোক। আমি ভেবেছিলাম ডাকাত দলের সদস্য।'

'স্পাইদের আচরণ অনেক সময়ই লোকের সন্দেহ জাগায়,' হেসে বললেন মাইকেল হ্যামার। 'ওর নাম ডারেল, ঠিকই আছে,' সঙ্গীকে দেখালেন। 'আমেরিকান ট্রেজারীর লোক। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি আমরা, এই চোরাচালানীর দলকে ধরার জন্যে।'

'অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিলো আমাদের ছেলেটা,' পাথরগুলো দেখিয়ে

বললেন ডারেল। 'হীরাগুলো হ্যালোয়েনের হাতে পড়তে যাচ্ছে, আন্দাজ করেছিলাম,' কলিনসের দিকে তাকালেন তিনি, 'ওকে সন্দেহও করেছিলাম। হাতেনাতে ধরতে না পারলে হবে না, তাই অ্যারেস্ট করতে পারছিলাম না। ঠিক কোথায় আছে হীরাগুলো, তা–ও জানতাম না।'

'আরেকটা শিকের ভেতরে পাবেন বাকিগুলো,' কিশোর দেখালো অন্য শিকটা।

'ওর সঙ্গীটা বোধহয় পালালো,' হ্যালোয়েনকে উদ্দেশ্য করে বললেন ডারেল। 'ব্রুড।'

'না, পালাতে পারেনি,' জানালেন কলিনস। 'আমার ঘরে, হাত–পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রেখে এসেছি। ভিকটর পাহারা দিচ্ছে।'

'ভি···' চোখ বড় বড় হলো ট্রেজারী–ম্যানের, 'মানে সিংহটা?'

মাথা নুইয়ে সায় জানালেন কলিনস।

হেসে কিশোরের কাঁধে হাত রাখলেন হ্যামার। 'ভেরি গুড, শার্লক হোমস। অর্ধেক পাথর বের করেছো, বাকিগুলো তুমিই বের করে ফেলো।'

প্রথম শিকটার মতোই দ্বিতীয় শিকটাও খুলে আনলো কিশোর। 'এই যে দেখুন জেন্টলমেন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করলো সে, 'প্রথমটার মতো এটাতে···'

একে অন্যের দিকে চেয়ে হাসলো রবিন আর মুসা। লেকচার দেয়ার সুযোগ ভালোই পেয়েছে আজ গোয়েন্দাপ্রধান।

একুশ

সাতদিন পর মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

'এসো এসো, বসো,' বললেন পরিচালক।

'থ্যাংকিউ, স্যার,' প্রায় একই সংগে বললো তিন কিশোর।

রিপোর্টের ফাইলটা এগিয়ে দিলো রবিন।

প্রত্যেকটা পাতা মন দিয়ে পড়লেন পরিচালক। মুখ তুললেন, 'কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। ওই বিশ্রী যন্ত্রটা, মেটাল শ্রেডার। ডাক্তার হ্যালোয়েন আর ব্রুড কি তোমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যেই ফেলে রেখে এসেছিলো?'

'না, স্যার,' জবাব দিলো রবিন। 'ডাক্তার বলেছে, আমাদেরকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রাখার জন্যেই ইয়ার্ডে পুরনো গাড়িতে ভরেছিলো। পরে সময়মতো ছেড়ে দিতো। কিংবা এমন কাউকে ফোন করতো, যে গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে পারে। ক্রেন যে আমাদের গাড়িটা তুলে নিয়েছে সেটা নিতান্তই নাকি অ্যাক্সিডেন্টাল।'

'হুঁ,' মাথা ঝোঁকালেন পরিচালক। 'ওরকম বিপজ্জনক জায়গায় রাখাটাই উচিত হয়নি ওদের। আরো কতো জায়গা ছিলো রাখার। আচ্ছা, যা–ই হোক, টোল কিনের

ব্যাপারটা কি? সে এই কেসে কোথায় ফিট করছে? ভিকটরকে কি সেই বের করেছিলো, জখম করেছিলো? গরিলাটা যে রাতে ছাড়া পেলো, সে-রাতে বনের মধ্যে কি করছিলো সে? সে-ও কি চোরাচালানীদের একজন?'

'না, স্যার। চোরাচালানীদের লোক নয় সে। তাড়িয়ে দেয়ার পরেও জাঙ্গল ল্যাণ্ডে এসেছে, তার কারণ ডাক্তারকে সন্দেহ করেছিলো। টোল কিনকে ধরে জিজ্ঞেস করেছে পুলিশ। সে জানিয়েছে, ডাক্তারই নাকি মিস্টার কলিনসের কাছে তার বদনাম করেছে, বলেছে, জন্তুজানোয়ারের সংগে দুর্ব্যবহার করে। তাকে তাড়িয়ে ব্রডকে চাকরি দিয়েছেন কলিনস ডাক্তারের কথায়ই। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে কিন চুরি করে ঢুকেছিলো বটে, কিন্তু ডাক্তারের নজরে পড়ে গিয়েছিলো। আর সেজন্যেই ভিকটরকে ছেড়ে দিয়েছে ডাক্তার, দোষটা কিনের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে।

'ভিকটরের পায়ের কাটাটা একটা দুর্ঘটনা। জঙ্গলের মধ্যে কোনোভাবে কেটেছে। এই দোষটাও কিনের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছে ডাক্তার। আমাদেরকে বনের মাঝে ফেলে রেখে গেছে কিন, শুধু মজা করার জন্যে। সে অন্তত তা-ই বলেছে।

'ব্রডকেও সন্দেহ করেছে কিন। সে-রাতে ব্রডের ওপর চোখ রাখার জন্যেই ঢুকেছিলো বনে। গরিলাটা ছাড়া পাওয়ার পর ব্রডের মতো সে-ও ভয় পেয়ে যায়। দৌড়ে পালানোর সময় দেখে ফেলি আমরা তাকে।'

'চিতাটাকে ছাড়লো কে? ডাক্তার?'

'না। ওটা সত্যি সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট। ডাক্তার বরং আমাদেরকে বাঁচিয়েছে, চিতাটাকে গুলি করে।'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'এই কেসে অ্যাক্সিডেন্ট, কাকতালীয় ব্যাপার বড় বেশি বেশি হয়েছে। তবে হয় এরকম। এসবের কোনো ব্যাখ্যা নেই।' ফাইলের একটা পাতা ওল্টালেন। 'এখানে লিখেছো, মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন সিনের সংগে কাজ করতো মাইকেল হ্যামার।'

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো, 'তিনি ফায়ারআর্ম এক্সপার্ট। ওরকম একজন লোক দরকার ছিলো সিনের। কাজেই ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয়নি হ্যামারের। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে ঢুকে চোরাচালানীদের ওপর চোখ রাখায় সুবিধে হয়েছে এতে। সিন অবশ্য এসবের বিন্দুবিসর্গ জানে না। তার একজন লোকের দরকার ছিলো, কম পয়সায় পেয়েছে ব্যস।'

'চোরাচালানীদের সর্দার কে? ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। আফ্রিকা থেকে শিকের ভেতরে ভরে হীরা আনানোর পরিকল্পনাও পুরোটাই তার। তানজানিয়ার মুয়াদুই আর শিনইয়াঙ্গা জেলার খনি থেকে চুরি করা হয়েছে হীরাগুলো। নিয়ে আসা হয়েছে দারেস সালামে। সেখানে সিলভার কলিনসের পাঠানো জানোয়ারের খাঁচায় ভরে দেয়া হয়েছে। তারপর তার করে দিয়েছে হ্যালোয়েনকে। সিলভার কলিনস কিছু জানেন না এসবের।'

'আসামাত্রই ভিকটরের খাঁচা থেকে কেন হীরাগুলো বের করে নিলো না হ্যালোয়েন?'

'ভেবেছিলো, খাঁচার মধ্যে রয়েছে, থাক না, নিরাপদেই আছে। তার জানা ছিলো, আরেকটা শিপমেন্ট আসছে, গরিলার খাঁচায় করে। দুটো একসংগে বের করে নিয়ে গায়েব হয়ে যেতো জাঙ্গল ল্যাণ্ড থেকে। বিক্রি করে টাকা ভাগাভাগি করে নিতো দলের সবাই। কিন্তু গরিলাটা আসতে দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অসুখে পড়লো হ্যালোয়েন, সর্দিজ্বর। আর ওদিকে ভিকটরকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন উইলবার কলিনস, খাঁচাটা দিলেন ফেলে। ভেঙেচুরে ফেলা হলো ওই খাঁচা।

'এই চোরাচালানের খবর কিভাবে পেয়েছে কাস্টমস, জানায়নি আমাদেরকে হ্যামার। জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললো, "সরি, এটা অফিশিয়াল সিক্রেট, ফাঁস করা যাবে না।"

ফাইলে টোকা দিলেন পরিচালক। 'আসল কথাটাই জানা বাকি এখনও। ভিকটর নার্ভাস হয়ে যেতো কেন?'

'আপনি তো জানেন, স্যার,' জবাবটা দিলো মুসা, 'বাড়ির কাছ দিয়ে অপরিচিত কাউকে যেতে দেখলে অস্থির হয়ে ওঠে কুকুর। আর সেই লোক যদি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করে তাহলে তো ঘেউ ঘেউ করে বাড়ি মাথায় তোলে। ভিকটরের ব্যাপারটাও হয়েছে তাই। বুনো জানোয়ার, কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল। তাকে অস্থির করেছে হ্যামার আর ডারেল। রাতে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে, খোঁজাখুঁজি করেছে। ওই দুটো লোককে আমরাই পছন্দ করতে পারছিলাম না, ভিকটর করবে কিভাবে?'

'তা ঠিক।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পরিচালক। 'একটা ব্যাপার এখনও বুঝতে পারছি না, হ্যালোয়েনের মতো একজন ডাক্তার চোরাচালানে জড়িয়ে পড়লো কি করে?'

'টাকার লোভ, স্যার,' বললো কিশোর। 'জাঙ্গল ল্যাণ্ডে আসার আগে আফ্রিকায় ছিলো। নানা জায়গায় চাকরি করেছে। সবগুলো চাকরিই ছিলো কম বেতনের। টাকার টানাটানি লেগেই থাকতো। এই সময় একদিন পরিচয় হলো সিলভার কলিনসের সংগে। আফ্রিকার অনেক জায়গা ঘুরেছে হ্যালোয়েন। কোথায় কোথায় হীরা পাওয়া যায় জানে। চোরাচালানের চিন্তা ঢুকলো মাথায়। জাঙ্গল ল্যাণ্ডে জানোয়ার পাঠানোর কথা শুনে পাকা করে ফেললো পরিকল্পনা। কথায় কথায় সিলভারকে বললো একদিন, জাঙ্গল ল্যাণ্ডে চাকরি করতে চায়। চাকরিটা পেতে কোনো অসুবিধেই হয়নি হ্যালোয়েনের। তারপর আর কি...'

'হুঁ, সেই পুরনো প্রবাদঃ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

মহাকাশের আগন্তুক

প্রথম প্রকাশঃ জুন, ১৯৮৯

'হাতটা খালি দিয়ে দেখো গাড়িটাতে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আলবার্ট কুপার।

অবাক হয়ে গেল কিশোর পাশা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভালো করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। না, রসিকতার কোনো লক্ষণ নেই। ছিপছিপে শরীর। ধূসর চুল। রাগে লাল হয়ে উঠেছে মুখ।

ইয়ার্ডের কর্মচারী দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের একজন, রোভারও অবাক হয়েছে। মার্সিডিজ গাড়িটা রাস্তা জুড়ে এমনভাবে রেখেছেন মিস্টার কুপার, আরেকটা গাড়ি পাশ কাটানোর জায়গা নেই। তাই সে সরিয়ে রাখার কথা বলেছিলো।

'আমাদের ট্রাকটা এখুনি আসবে,' বোঝানোর চেষ্টা করলো রোভার। 'আপনার গাড়ি না সরালে ওটা আসবে কোনখান দিয়ে? চাবিটা দিন, আমিই সরিয়ে দিচ্ছি...'

'না!' গর্জে উঠলেন কুপার। 'অকর্মণ্য অযোগ্য সব লোক! এরকম আমার ওখানেও আছে কতগুলো। মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আমার। দেখো, গাড়ি আমি ঠিক জায়গায়ই রেখেছি। লোকের সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করো নাকি তোমরা? এ–ভাবেই ব্যবসা চালাও?'

লোহালক্কড়ের স্তূপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। 'মিস্টার কুপার,' শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি, 'ব্যবসা আমরা ভালোই বুঝি। আপনি অন্যায়ভাবে ওকে ধমকাচ্ছেন। বেশ, ওকে সরাতে না দিলে আপনি নিজেই সরিয়ে রাখুন। জলদি করুন। আমার ট্রাকটা এলো বলে।'

মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন আবার কুপার, এই সময় ইয়ার্ডের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে এলেন মাঝবয়েসী একজন মহিলা, মাথায় বাদামী চুল। তাড়াতাড়ি এসে স্বামীর হাত ধরে অনুরোধ করলেন, 'বার্ট, রাখো না গাড়িটা সরিয়ে। ট্রাকের গুঁতো লাগলে তো যাবে শেষ হয়ে।'

গজগজ করতে করতে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন কুপার। সরিয়ে রাখলেন গাড়ি।

গেটে দেখা দিলো ইয়ার্ডের বড় লরিটা। পুরনো কাঠ বোঝাই করে এনেছে।

রোভারের দিকে চেয়ে হাসলেন মহিলা। 'আসলে, আমার স্বামী লোক খারাপ

নন। উনি…উনি মাঝে মাঝে মেজাজ ঠিক…'

'আমি গাড়ি চালাতে জানি,' গোমড়ামুখে বললো রোভার। 'এখানে অনেক বছর ধরে আছি। মিস্টার পাশাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না, কখনও অ্যাক্সিডেন্ট করেছি কিনা?' ঝটকা দিয়ে ঘুরে হেঁটে চলে গেল সে।

'রাগ করেছে, বেচারা!' সেদিকে চেয়ে বললেন মিসেস কুপার। অসহায় ভঙ্গিতে তাকালেন কিশোরের দিকে, রাশেদ পাশার দিকে, তারপর মেরিচাচীর দিকে—চেঁচামেচি শুনে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

'রোভারের কি হলো?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী। 'এতো রেগেছে কেন?'

'আমার স্বামী ওর সাথে দুর্ব্যবহার করেছে, মিসেস পাশা,' বললেন মিসেস কুপার। 'আজ ওর মেজাজ খুব খারাপ। সকালে ওর কাপড়ে কফি ফেলে দিয়েছিলো ওয়েইট্রেস, তখন থেকেই চটে আছে। কাজে ভুল হলে ও রেগে যায়। আজকাল লোকেরও যে কি হয়েছে, অলস হয়ে যাচ্ছে, কাজে ফাঁকি দিতে চায় সুযোগ পেলেই। একেক সময় আমার মনে হয়, ধ্বংসের বুঝি আর বেশি বাকি নেই।'

'ধ্বংস?' ভুরু কোঁচকালেন রাশেদ পাশা।

'হ্যাঁ। ওমেগা থেকে তখন আমাদের উদ্ধার করতে আসবে ওরা,' বুঝিয়ে বললেন মিসেস কুপার।

কিছুই বুঝলেন না রাশেদ পাশা। শূন্য দৃষ্টি।

'একটা বই বেরিয়েছে, চাচা,' এগিয়ে এলো কিশোর। 'নাম, "দে আর কামিং"। সুপারহিট। ওটাতে লিখেছেন লেখক, ওমেগা নামের একটা গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। ওরা নজর রাখছে পৃথিবীর ওপর। ওরা নাকি জেনেছে, শীঘ্রি মহাজাগতিক এক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তখন ওরা, যাতে একটা সভ্যতা চিরতরে বিলীন হয়ে যেতে না পারে।'

'তুমি পড়েছো?' আনন্দে মুখচোখ উজ্জ্বল হলো মহিলার। 'ওমেগাবাসীদের কথা জানো? খুব ভালো, খুব ভালো।'

'পাগ...,' বাধা পেয়ে থেমে গেলেন রাশেদ পাশা।

অফিসের বারান্দা থেকে বলে উঠলেন মেরিচাচী, 'জানবে না মানে? আমার ছেলে অনেক পড়ে, অনেক কিছু জানে। মাঝেমাঝে তো আমার মনে হয়, ও বুঝি দুনিয়ার সব কিছুই জানে।' নেমে এসে মহিলার হাত ধরে টানলেন। 'আসুন, কি কি চান, দেখুন খুঁজে পান কিনা।'

পুরনো কয়েকটা কিচেন-চেয়ারের ওপর নজর পড়লো মিসেস কুপারের। সেদিকে এগোলেন।

এই সময় ইয়ার্ডে ঢুকতে দেখা গেল মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ডকে।

'এই যে, এসেছো তোমরা,' বলে উঠলেন রাশেদ পাশা। 'আছো কেমন?' জবাবের অপেক্ষা না করে এগিয়ে গেলেন মিস্টার কুপারের দিকে। গাড়ির দরজায় তালা লাগাচ্ছেন তিনি।

বন্ধুরা কাছে এলে হেসে বললো কিশোর, 'মিস করলে। মজাই দেখতে পারলে না। তবে আশা করা যায়, আরও হবে।'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলো মুসা।

হাসলো কিশোর। 'বদমেজাজী কাস্টোমার। রোভারের সঙ্গে লেগেছিলো।'

'কি কিনতে এসেছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সে–ও আরেক কাণ্ড। অদ্ভুত সব জিনিস।'

ওদিকে মিসেস কুপারকে পুরনো একটা সেলাইয়ের মেশিন দেখাচ্ছেন কিশোরের চাচা–চাচী। সামান্য মেরামত করে নিলেই চালানো যাবে আবার। ছেলেরা দেখলো, মেশিনটা তুলে নিয়ে গিয়ে আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে রাখছেন রাশেদ পাশা। ওই জিনিসগুলোও বেছে রেখেছেন মিস্টার কুপার। তার মধ্যে রয়েছে দুটো পুরনো স্টোভ, মাখন তোলার একটা প্রাচীন যন্ত্র—হাতলটা ভাঙা, একটা পুরনো তাঁত, একটা আধ–ভাঙা ফোনোগ্রাফ মেশিন।

'বাহ্, দারুণ সব জিনিস তো!' দেখে বললো মুসা। 'ওসব দিয়ে কি করবে?'

'হয়তো অ্যানটিক সংগ্রহের ঝোঁক আছে,' রবিন বললো।

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'কাজের জন্যেই কিনছেন ওগুলো কুপার। ভাঙাচোরা আছে বটে, সেরে নিলেই কাজ করা যাবে।'

'যে–জন্যেই কিনুক,' হাসলো মুসা, 'মেরিচাচীর আজ সুদিন। পাগল নাকি ওরা?'

'কি জানি,' হাত নাড়লো কিশোর। 'মেরিচাচী খুশি, কিন্তু চাচা খুশিও না বেজারও না। আসলে, কুপারকে ভালো লাগছে না তার। ইতিমধ্যেই রাগারাগি হয়ে গেছে একবার, গাড়ি সরানো নিয়ে। সকাল আটটায় এসেছেন কুপার–দম্পতি। ইয়ার্ডের গেট বন্ধ দেখে চেঁচামেচি শুরু করেছেন মিস্টার কুপার। চাচাকে দেখেই বলে উঠেছেনঃ দুপুর পর্যন্ত যারা ঘুমায় তাদেরকে দিয়ে দুনিয়ার কিচ্ছু হবে না।'

'তাই?' বললো রবিন।

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'তার ধারণা, দুনিয়ার সব লোক তাঁর সঙ্গে মিথ্যে বলার জন্যে, তাঁকে ঠকানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবে মহিলাকে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।'

চিন্তিত দেখালো রবিনকে। 'কুপার, না? পত্রিকায় কয়েক হপ্তা আগে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিলো। কুপার নামের কোটিপতি এক লোক, উত্তরে কোথায় যেন

একটা র‍্যাঞ্চ কিনেছেন। খাবার থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় যতো জিনিস, সব নিজের খামারে তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।'

'এজন্যেই বুঝি মাখন তোলার মেশিন,' বললো মুসা। 'নিজের মাখন নিজেই...'

আলোচনা চললো।

জিনিস পছন্দ করে, দামদস্তুর শেষ করে ড্রাইভওয়েতে ফিরে এলেন কুপার-দম্পতি। সঙ্গে এলেন রাশেদ পাশা আর মেরিচাচী।

'স্যান লুই অবিসপোর দশ মাইল উত্তরে থাকি আমরা,' কুপার বলছেন, 'মেইন হাইওয়ে থেকে মাইল চারেক দূরে। ইচ্ছে করলে ট্রাক দিয়ে লোক পাঠাতে পারি জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু সেটা করতে চাই না। আমার লোকেরা এখন খুব ব্যস্ত। লোক দিয়ে জিনিসগুলো পাঠিয়ে দেন যদি, ন্যায্য ভাড়া যা হয় দিয়ে দেবো।'

'ন্যায্য দামের বেশি একটা পয়সাও নিই না আমি,' গম্ভীর হয়ে বললেন রাশেদ পাশা।

'এবং ন্যায্য ভাড়ার বেশি একটা পয়সাও দিই না আমি। তাহলে লোক দিচ্ছেন?'

'আমার লোকেরাও খুব ব্যস্ত,' রেগে যাচ্ছেন রাশেদ পাশা। সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিশোর। 'চাচা, এমনিতেও তো উত্তরে যাওয়ার কথা আছে আমাদের। স্যান জোসের সেই পুরনো বাড়িটাতে, জিনিসপত্র কিনতে। ইচ্ছে করলে জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি আমরা। ন্যায্য ভাড়া যখন দেবেন বলছেন উনি...'

'কাণ্ড দেখো!' চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার। 'এই বয়েসেই দেখি খাঁটি ব্যবসায়ী। নিজেদের কাজে যাবে, অথচ ভাড়াটা আদায় করে নেবে আমার কাছ থেকে।'

'আপনি আপনারটা বোঝেন, আমরা বুঝবো না?' শীতল কণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। 'ঠিক আছে, পৌঁছে দেবো জিনিস। এখান থেকে ট্রাক ভাড়া কতো জানেন তো?'

দরকষাকষি করে একটা রফা হলো অবশেষে। ঠিক হলো, বোরিস যাবে। সঙ্গে যাবে কিশোর, স্যান জোসের বাড়িটা থেকে মাল পছন্দ করে সে-ই কিনবে।

সরে এসে নিচু গলায় দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'তোমরা যাবে?'

'অসুবিধে কি?' মুসা বললো। 'মাকে এখান থেকেই একটা টেলিফোন করে দেবো।'

রবিন জানালো, তারও অসুবিধে নেই। কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো? এতো আগ্রহ কেন তোমার?'

'অদ্ভুত দম্পতি,' জবাব দিলো কিশোর। 'কিরকম জায়গায় থাকেন, দেখতে চাই।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো। 'এতো পুরনো জিনিসপত্র কি ব্যবহারের জন্যে?

মিষ্টার কুপার কি সব সময় অমন রেগেই থাকেন? মিসেস কুপারও কি সত্যি বিশ্বাস করেন উদ্ধারকারীরা আসবে?'

'উদ্ধারকারী?' মুসার প্রশ্ন। 'ওরা আবার কারা?'

'ভিনগ্রহবাসী অতিবুদ্ধিমান প্রাণী।'

'ঠাট্টা করছো নাকি?' রবিন বললো।

'না,' বললো কিশোর। 'কে জানে? হয়তো সত্যি ভিনগ্রহ থেকে আসবে ওরা, স্পেসশিপে করে নিয়ে যাবে আমাদের। বেশ মজাই হবে কিন্তু তাহলে।'

দুই

দুপুরের পর রওনা হলো ওরা। বড় ট্রাকটায় বোঝাই করে নিয়েছে মিষ্টার কুপারের জিনিসপত্র।

কোস্ট হাইওয়ে ধরে উত্তরে চলেছে ট্রাক। পেছনে মালপত্রের সাথে বসেছে তিন গোয়েন্দা। গাড়ি চালাচ্ছে রোরিস।

'আর্টিকেলটা পেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ, এই যে,' পকেট থেকে ভাঁজ করা কয়েক পাতা কাগজ বের করলো রবিন। 'চার হপ্তা আগের পত্রিকা, ফটোকপি করে নিয়ে এসেছি।'

'সংক্ষেপে বলো তো সব।'

কাগজগুলোর ভাঁজ খুললো রবিন। কোথাও আটকে গেলে চোখ বুলিয়ে নেবে। বলতে শুরু করলো, 'পুরো নাম আলবার্ট হেনরি কুপার। টাকার কুমির। বাবা ছিলেন মস্ত এক ট্রাকটর কোম্পানির মালিক।

'মিলওয়াওকিতে বড় হয়েছেন আলবার্ট কুপার। কারখানাটা ছিলো ওই শহরেই। বাবার মৃত্যুর পর মাত্র তেইশ বছর বয়েসে এতোবড় কারখানার মালিক হয়ে বসলেন তিনি। ভালোই চললো কিছুদিন। তারপর শ্রমিকেরা শুরু করলো ধর্মঘট। ওদের সমস্ত দাবিদাওয়া মানতে বাধ্য হলেন কুপার।.আর তাঁতেই রেগেমেগে কারখানা দিলেন বিক্রি করে।

'বসালেন টায়ারের কারখানা। ব্যবসা জমে উঠলো। এই সময় একদিন পরোয়ানা নিয়ে হাজির সরকারী লোক, বাতাস দূষিত করছে কারখানার ধোঁয়া। মোটা টাকা জরিমানা দিতে হলো কুপারকে। দিলেন ওই ব্যবসাও বন্ধ করে। আরেকটা কারখানা কিনলেন। ক্যামেরার ফিল্ম আর ফটোগ্রাফির নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি হয় ওখানে। কি যেন কি করে ওটা নিয়েও পড়লেন সরকারী ঝামেলায়।

কোনোরকম কারখানার মধ্যে গেলেন না আর। এরপর একে একে পত্রিকা

চালালেন, কয়েকটা রেডিও স্টেশন কিনলেন একসঙ্গে, ব্যাংক খুললেন। লোকসান কোনোটাতেই দিলেন না, ভালো লাভ, তা–সত্ত্বেও নানারকম গোলমালে জড়িয়ে বন্ধ করে দিতে হলো সব কিছু।

'শেষমেশ এখন স্যান লুই অবিসপোতে ওই র‍্যাঞ্চে এসে উঠেছেন, যেখানে যে–বাড়িতে জন্মেছিলেন...'

'মিলওয়াওকিতে জন্মেছেন বললে না?' বাধা দিয়ে বললো মুসা।

'জন্মেছেন বলিনি তো। বলেছি, বড় হয়েছেন। যা–ই হোক, তাঁর মতো বড়লোক আরও অনেক আছেন আমেরিকায়, তাঁরা পত্রিকার খবর হন না। তিনি হয়েছেন, তার কারণ, বিশেষ একটা মত পোষণ করেন তিনি। সেটা হলো, খুব তাড়াতাড়িই নাকি এমন দিন আসবে, যখন টাকার কোনো মূল্য থাকবে না। শুধু থাকবে স্বর্ণ আর জমির দাম। কথাগুলো এমনভাবে ছড়িয়েছেন তিনি, পত্রিকাওয়ালাদের চোখ পড়েছে তাঁর ওপর, ছুটে গেছে তাঁর র‍্যাঞ্চ "র‍্যাঞ্চো কুপার"–এ। তাদেরকে তিনি বলেছেন, বাকি জীবনটা ওখানেই কাটিয়ে দিতে চান। বাইরের কারও ওপর কোনো জিনিসের জন্যে নির্ভর করবেন না। বাঁচতে হলে একজন মানুষের যা যা দরকার, মানে নিত্যপ্রয়োজনীয়, সবই তৈরি করে নেবেন নিজের র‍্যাঞ্চে। এককথায়, সব দিক থেকে স্বাবলম্বী।'

কথা শেষ করে কাগজগুলো ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিলো রবিন।

নীরব হয়ে রইলো তিনজনেই।

ছোট ছোট কয়েকটা শহর পেরিয়ে এলো ট্রাক। সামনে খোলা অঞ্চল, এবং তার পর থেকেই শুরু হলো পাহাড়ের সারি। গ্রীষ্মের রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে উঠেছে পাহাড়গুলো।

তিনটে প্রায় বাজে, এই সময় কোস্ট হাইওয়ে থেকে মোড় নিয়ে স্টেট হাইওয়ে ১৬ এস জেতে পড়লো গাড়ি। এগিয়ে চললো পুবে। পাহাড়ী পথ উঠে গেছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ নেমে এলো সরু উপত্যকায়। কোনো বাড়িঘর নেই, কোনো গাড়ি চোখে পড়লো না।

'বুনোই রয়ে গেছে এখনও এলাকাটা,' মন্তব্য করলো মুসা।

'হ্যাঁ,' বললো মুসা। 'আসার আগেই ম্যাপ দেখে নিয়েছি। এখান থেকে স্যান জোয়াকুইন ভ্যালির মাঝে আর কোনো শহর নেই।'

উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ ধরে চলেছে ট্রাক। মাঝে মাঝেই চুলের কাঁটার মতো মোড়। গতি কমাতে হচ্ছে ওসব জায়গায়।

বিশাল এক উপত্যকার দিকে এগিয়ে চললো ট্রাক। চারপাশ থেকে উপত্যকাটাকে ঘিরে রেখেছে উঁচু উঁচু পাহাড়। পথ খারাপ। চাপে পড়ে গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে

এঞ্জিন। সমতলভূমিতে নামলো অবশেষে গাড়ি। ডানে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়, বাঁয়ে কাঁটাতারের বেড়া—এগিয়ে গেছে সমান্তরালভাবে। বেড়ার ওপাশে পাতাবাহারের ঝাড়, আরেকটা বেড়া তৈরি করেছে। তার ওপারে জমি, নতুন শস্য লাগানো হয়েছে। চারা গজিয়েছে।

'র‍্যাঞ্চো কুপার,' বিড়বিড় করলো রবিন।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলো ট্রাক। খোলা ফটক পেরিয়ে খোয়াবিছানো পথে পড়লো। উত্তরে গেছে পথ। দু'ধারে কোথাও চষা জমি, কোথাও লেবুবাগান।

উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। ট্রাকের কেবিনের ওপর দিয়ে দেখছে। দূরে ইউক্যালিপটাস গাছের ঘন ঝাড়ের ফাঁকে একটা বাড়ি চোখে পড়ছে।

আরও এগিয়ে দেখা গেল, ডানে দোতলা একটা র‍্যাঞ্চহাউস—দক্ষিণে, অর্থাৎ পথের দিকে মুখ করে আছে। বাঁয়ে, পথের দিকে পেছন করে রয়েছে আরেকটা পুরনো ধাঁচের বাড়ি, ছাত অনেক উঁচুতে, প্রাচীন আমলের অট্টালিকাগুলোতে যেমন হতো। টাওয়ার আছে। দু'পাশে আর সামনে ছড়ানো বারান্দা আছে।

'নিশ্চয় এ-বাড়িতেই থাকেন মিস্টার কুপার,' বললো রবিন। মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

দুটো বাড়িই পেরিয়ে এলো ট্রাক। ছোট ছোট ডজনখানেক কটেজ পেরোলো। বাড়িগুলোর উঠনে খেলা করছে বাচ্চারা, সবারই কালো চোখ, কালো চুল। ট্রাকটা ওদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ফিরে চেয়ে হাত নাড়ছে। বয়স্ক একজন মানুষকেও চোখে পড়লো না। খোয়াবিছানো পথের শেষে বিরাট এক খোলা জায়গা। বড় বড় ছাউনি আর গোলাবাড়ি ওখানে। গাড়ি পার্ক করার জায়গাও আছে।

ট্রাক থামালো বোরিস।

বেড়া দেয়া একটা ছাউনির দরজায় দেখা দিলো একজন মানুষ। লাল চুল, লাল মুখ। হাতে একটা ক্লিপবোর্ড।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে?'

বোরিস জবাব দেয়ার আগেই ট্রাকের পেছন থেকে লাফিয়ে নামলো কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। এরা দু'জন আমার বন্ধু, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড।' বোরিসের পরিচয়ও দিলো সে।

হাসলো লাল-চুল লোকটা। 'আমি ড্যাম সান। মিস্টার কুপারের ফোরম্যান।'

'হোকে (ওকে),' ড্রাইভিং সিট থেকে বললো বোরিস, 'মাল নামাবো কোথায়?'

'তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমাদের লোকেরাই নামিয়ে নেবে।' ছাউনির দিকে ফিরে ডাক দিলো সান।

বেরিয়ে এলো আরও তিনজন। কটেজের সামনে যেসব বাচ্চাদের খেলতে দেখা গেছে, ওদেরই মতো এই লোকগুলোরও কালো চুল, কালো চোখ, বাদামী চামড়া। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে।

মাল নামাতে শুরু করলো ওরা। ক্লিপবোর্ডের লিস্ট দেখে একে একে মিলিয়ে নিচ্ছে ফোরম্যান। মুখটা এতো বেশি লাল, যেন পুড়ে গিয়েছিলো। চোখ, আর ঠোঁটের কোণের রেখাগুলো বড় বেশি স্পষ্ট।

'কী?' হঠাৎ মুখ তুলে কিশোরকে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো সান, 'কিছু জানতে চাও?'

হাসলো কিশোর। 'না, তেমন কিছু না। লোকের চেহারা আর চালচলন দেখে তাদের চরিত্র কেমন হবে, বোঝার চেষ্টা করা আমার হবি।' চারপাশের রুক্ষ পাহাড়ের দিকে তাকালো সে। উপত্যকাটাকে মনে হয় বদ্ধ একটা মরুদ্যানের মতো। শান্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেল। 'আপনার চামড়ার রঙ দেখে বুঝতে পারছি, এখানে এসেছেন বেশিদিন হয়নি। এর আগে নিশ্চয় খোলা আলো বাতাসে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন।'

ক্ষণিকের জন্যে বিষণ্ণতা ফুটলো সানের চোখে। 'ঠিকই বলেছো। টেক্সাসের অস্টিনে আরেকটা র‍্যাঞ্চে ছিলাম। র‍্যাঞ্চটার নাম ছিলো হেণ্ডারসন র‍্যাঞ্চ। গতবছর ওখানে বেড়াতে গেলেন মিস্টার কুপার। আমাকে দেখে পছন্দ হলো। বড় অফার দিলেন, না এসে পারলাম না। লোভে পড়ে এসেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় এই বদ্ধ জেলখানায় না এলেও পারতাম।'

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা পিকআপের বনেটের উপর ক্লিপবোর্ডটা রাখলো ফোরম্যান। 'তোমরা, ছেলেরা, রকি বীচ থেকে এতো দূরে এসেছো শুধু মাল পৌঁছে দিয়ে যেতে? খুব ভালো, খুব ভালো। ভালো ছেলে তোমরা। তোমাদের বয়সে আমি হলে, কিছুতেই আসতাম না। তবে, এই র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে বেশি কৌতূহল হলে অবশ্য আলাদা কথা।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

মানে বুঝে নিয়ে হাসলো সান। 'ঠিক আছে, এসো, দেখাচ্ছি, দেখার অনেক কিছু আছে এখানে।'

পথ দেখিয়ে ছেলেদেরকে একটা ছাউনিতে নিয়ে এলো সান। ওখানেই রাখা হয়েছে ইয়ার্ড থেকে আনা জিনিসগুলো।

মস্ত এক ভাঁড়ার দেখলো ওরা, যেটার চাল পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, ঠাসাঠাসি হয়ে আছে নানারকম জিনিসপত্র। এই যেমন, মেশিনের পার্টস, চামড়া, কাপড়ের রোল।

ভাঁড়ারের পাশে ছোট একটা বিল্ডিং, ওটা মেশিন শপ। হ্যানস কাপলিং নামে এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো ফোরম্যান। ভোঁতা–নাক লোকটার।

'আমাদের গাড়ি আর অন্যান্য যন্ত্র চালু রাখে হ্যানস,' বললো সান। 'সে-ও আগে এখানে ছিলো না। বড় বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট আর ইরিগেশন সিসটেমের ডিজাইন করতো।'

'করতাম, কিন্তু লোকে পাত্তা দিতো না। শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তো। টেনথ গ্রেডের পরেই স্কুল ছাড়লে তাকে কে আর দাম দেয়, বলো? ভালো চাকরি কি আর দেয়? দুঃখ করে কথাগুলো বললো বটে কাপলিং, কিন্তু দুঃখের ছোঁয়া নেই কণ্ঠস্বরে।

মেশিন শপের পাশে কয়েকটা ছাউনি। কোনোটা খাবার গুদাম, কোনোটা ডেইরি, কোনোটা পশুশালা—এখন পশু নেই ওখানে। দিনের একসময়ে থাকে না।

বাঁধের নিচে মাঠে এখন ওগুলো চরছে,' জানালো ফোরম্যান। 'গরু ছাড়াও শুয়োর আছে আমাদের, ভেড়া আছে, মুরগী আছে। ঘোড়া তো আছেই।'

ছেলেদেরকে আস্তাবলে নিয়ে এলো ফোরম্যান। দেখার কৌতূহল বোরিসেরও আছে, সে-ও রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

অপূর্ব সুন্দর একটা প্যালোমিনো স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার কাছে ঝুঁকে রয়েছে এক তরুণী, মাথায় ছোট করে ছাঁটা লালচে চুল। মেয়েটার নাম জেনি এজটার, জানালো ফোরম্যান।

ঘোড়ার পেছনের বাঁ পায়ের খুর পরীক্ষা করছে জেনি। কিছু একটা দেখে অস্ফুট শব্দ করলো।

'জানোয়ারগুলোর ভার জেনির ওপর,' বললো সান। 'অসুস্থ হলে সেবা করে।'

'কাছে আসবেন না,' সাবধান করলো জেনি। নার্ভাস হয়ে যায় কমেট।'

'ঘোড়াটা খুব মেজাজী,' বুঝিয়ে বললো সান। 'জেনি ছাড়া আর কাউকে কাছে যেতে দেয় না।'

মেহমানদের নিয়ে পার্কিং এরিয়ায় ফিরে এলো ফোরম্যান। ছোট একটা সেডান গাড়িতে চড়লো। একটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগোলো উত্তরে, খেতখামারের মাঝখান দিয়ে।

'সাতচল্লিশজন লোক কাজ করে এখানে,' গাড়ি চালাতে চালাতে বললো সান। 'অবশ্যই বাচ্চা আর মিস্টার কুপারের পার্সোনাল স্টাফদের বাদ দিয়ে। তাদের মধ্যে রয়েছে জেরি, হ্যানস আর সুপারভাইজারেরা। আমি চীফ সুপারভাইজার। এখানকার সব কিছু দেখাশোনার মূল দায়িত্ব আমার ওপর। কি আসছে, কি যাচ্ছে, ওসবও দেখতে হয়। ...ওই যে, হ্যারি ব্যানার।'

হালকা-পাতলা, মাঝারি উচ্চতার একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে চষা খেতের আলের ওপর, তার দিকে হাত নাড়লো সান। খেতে কাজ করছে শ্রমিকেরা, কি যেন বুনছে। 'চাষীদের সর্দার হ্যারি। খুব ভালো চাষী সে নিজেও। ডেভিস-এর ইউনিভারসিটি অভ ক্যালিফোরনিয়ার গ্রাজুয়েট।'

এগিয়ে চলেছে গাড়ি। ছোট একটা বিল্ডিং দেখালো ফোরম্যান। 'ওখানে সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা করছে হ্যানস কাপলিং। পুবে, কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের ঢালের চারণক্ষেত্র দেখালো সে। অবশেষে এসে পৌঁছলো ওখানে। তৃণভূমি ছাড়াও ওখানে রয়েছে তরকারীর খেত। সবুজে ছেয়ে আছে। গাজর-লেটুস থেকে শুরু করে মরিচ পর্যন্ত সবই আছে। তৃণভূমিতে পশু চরছে। তার ওপারে বাঁধ।

'আমাদের নিজস্ব পানির সাপ্লাই,' বাঁধটা দেখিয়ে বললো সান। 'বাঁধের ওধারে বিরাট একটা দিঘী আছে। ওই যে চূড়াটা, ওটার সামান্য নিচেই ঝর্না, ওই ঝর্নার পানি দীঘিতে জমা করে রাখা হয়। তবে ওই পানি জরুরী অবস্থায় কাজে লাগানোর জন্যে। এমনিতে কুঁয়ো আছে অনেকগুলো। জেনারেটর আছে, ডিজেলে চলে। যদি কখনও কোনো কারণে ডিজেল ফুরিয়ে যায়, কাঠ আর কয়লা পুড়িয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবো।'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো ফোরম্যান। ফিরে চললো।

'মৌমাছি পুষি আমরা,' বললো সে। 'চিনির জন্যে। স্মোক-হাউস আছে, সেখানে নোনা মাংস শুকানো হয়, সংরক্ষণের জন্যে। মাটির তলায় অনেক বড় ট্যাংক আছে, সেখানে ভর্তি করে রাখা আছে পেট্রোল। আলু আর অন্যান্য তরকারি সংরক্ষণের জন্যে বিরাট ভাঁড়ার আছে। এতো তাক আছে, জোড়া দিলে কয়েক মাইল লম্বা হয়ে যাবে। ওগুলোতে ঠেসে রাখা হয়েছে টিনের খাবার। ওগুলোর দায়িত্বে আছে জোয়ান।'

'জোয়ান?' জানতে চাইলো কিশোর।

'জোয়ান মারটিংগেল।' হাসলো সান। 'শুধু যে দেখে রাখার ভার তার ওপর, তা-ই নয়, আমাদের কয়েকজনের খাবার রান্নার ভারও তার ওপর। ভালো বাবুর্চি। হ্যানস, হ্যারি, জেনি, আমি এবং কুপারদের খাবার সে-ই রান্না করে। সময় থাকলে ওর সঙ্গে একবার দেখা করে যাও। খুশি হবে ও।'

ছেলেরা জানালো, ওদের সময় আছে। একটা ছাউনির সামনে এনে গাড়ি রাখলো ফোরম্যান। নামলো সবাই। সানের পিছু পিছু চললো পথ পেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে।

হাসিখুশি চমৎকার এক মহিলা জোয়ান মারটিংগেল। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। খাটো, সোনালি চুল। হাসিটা বড় সুন্দর। রান্নাঘরে উজ্জ্বল দিনের আলো, খাবারের মিষ্টি গন্ধ ভুরভুর করছে বাতাসে।

পরিচয় করিয়ে দিলো ফোরম্যান।

তাড়াতাড়ি বড় দু'জনকে দু'কাপ কফি ঢেলে দিলো জোয়ান। ফ্রিজ থেকে ছেলেদেরকে বের করে দিলো তিন বোতল সোডা ওয়াটার মেশানো কমলার রস।

'খাও, খেয়ে ফেলো,' হেসে বললো সে। 'সময় থাকতে খেয়ে নাও। বিদ্রোহ শুরু

হলে আর খেতে পারবে না।'

লম্বা একটা টেবিলে ফোরম্যানের পাশে বসেছে বোরিস। কথা শুনে সোজা হলো। 'বিদ্রোহ? আমেরিকায় আবার কিসের বিদ্রোহ হবে? বড়জোর প্রেসিডেন্টকে অপছন্দ হতে পারে লোকের। তাহলে ভোট দিয়ে নতুন আরেকজনকে বানিয়ে নেবো, ঝামেলা চুকে যাবে।'

'তা নাহয় হলো। কিন্তু ধরুন, গোটা সিসটেমটাই ভেঙে পড়লো। তখন?'

অবাক হলো বোরিস।

ঘরে চোখ বোলাচ্ছে কিশোর। গ্যাসের চুলার পাশে রাখা কাঠের স্টোভটার দিকে তাকালো, এটা ওদের ইয়ার্ড থেকেই কিনে আনা হয়েছে। 'সিসটেম ভেঙে পড়বে? সেজন্যেই বুঝি আগে থেকে তৈরি থাকছেন? ঘুরেফিরে দেখে যা মনে হলো আমার, আস্ত এক দুর্গ বানানো হয়েছে এখানে।মধ্যযুগীয় ব্যাপার স্যাপার।'

'ঠিক বলেছো,' বললো ফোরম্যান। 'পৃথিবী···মানে, মানব সভ্যতা ধ্বংসের সময় এসে গেছে। তার অপেক্ষায়ই আছি আমরা।'

নিজের জন্যে এক কাপ কফি ঢেলে নিলো জোয়ান। টুলে বসে এক চামচ চিনি নিয়ে কাপে ফেলে নাড়তে শুরু করলো। মহিলার ডান হাতের কড়ে আঙুলের বিকৃতি নজর এড়ালো না কিশোরের। নখসহ মাথাটা নেই, সে-জায়গায় ঠেলে বেরিয়ে আছে হাড়, আর তার চারপাশে গোল খানিকটা মাংসপিণ্ড।

'প্রেসিডেন্টকে গদি থেকে টেনে নামিয়ে গুলি করে মারা হবে, সে-রকম বিদ্রোহের কথা বলছি না,' বললো আবার জোয়ান। 'মিস্টার কুপারের ধারণা, খুব শীঘ্রি একটা গোলমাল শুরু হবে । দুর্ভিক্ষ লাগবে সারা পৃথিবী জুড়ে, রক্তপাত হবে, অরাজকতা হবে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, জানোয়ার হয়ে যাবে সব। তখন যাতে আমরা এখানে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারি, তার জন্যেই এই বিপুল ব্যবস্থা।'

'মিস্টার কুপারের তো বিশ্বাস, স্বর্ণ আর চাষের জমি ছাড়া আর কোনো কিছুরই কোনো মূল্য থাকবে না,' বললো কিশোর। 'কাগজের টাকার যে পদ্ধতি এখন চালু আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। কতো লোকই তো আবোল-তাবোল কতো কিছু ভাবে।'

ভুরু কুঁচকে কিশোরের দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো জোয়ান। 'সব সময় এরকম ভাবেই কথা বলো নাকি তুমি?'

হাসলো মুসা। 'সুযোগ পেলে লেকচার দিতে ছাড়ে না, এটুক জানি।'

ওসব কথা কানেই তুললো না কিশোর। জোয়ানের দিক থেকে চোখ ফেরালো ফোরম্যানের দিকে, তারপর আবার মহিলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের কি ধারণা, পৃথিবীর শেষ দিন, মানে কেয়ামত খুব কাছাকাছি?'

'না, তা অবশ্য ভাবি না,' জবাব দিলো জোয়ান।

'তবে আমার মনে হয়,' যোগ করলো ফোরম্যান, 'মিস্টার কুপার সেরকমই ভাবেন। তাঁর ধারণা, জনসাধারণের সমস্ত ব্যাপারে সরকার যেরকম নাক গলাতে আরম্ভ করেছে, যে-কোনো দিন খেপে উঠবে জনতা। তাছাড়া আজকাল লোকে নাকি আর কাজ করতে চায় না, যে যেভাবে পারছে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। এতো আলসেমী চলতে থাকলে⋯'

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রাখলো জোয়ান।

'আসতে পারি?' পর্দার ওপাশ থেকে শোনা গেল মহিলাকণ্ঠ।

'নিশ্চয়, মিসেস কুপার,' তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়ালো জোয়ান। 'আসুন, আসুন। কফি খাচ্ছিলাম। আপনাকে চা দেবো?'

দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিসেস কুপার। 'না, থ্যাংকিউ।' ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলেন। 'তোমাদেরকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখেছি, তাই এলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকো না। আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়েই যাও।'

ঘড়ি দেখলো বোরিস। 'কিশোর, পাঁচটা বেজে গেছে! আমাদের যাওয়া উচিত।'

জোয়ানের দিকে ফিরলেন মিসেস কুপার। 'আজ তাড়াতাড়িই ডিনার সেরে ফেলতে পারি আমরা। পারি না?'

অবাক হলো জোয়ান। 'পারি।'

'তাহলেই হলো,' হাসলেন আবার মিসেস কুপার।

চট করে দুই সহকারীর চোখের দিকে তাকালো কিশোর। কথা হয়ে গেল চোখে চোখে।

'আমার অসুবিধে নেই,' বললো মুসা।

'আমারও না,' বলে, বোরিসের দিকে ফিরলো রবিন। 'ভাববেন না। স্যান জোসেতে ঠিকই পৌঁছতে পারবো আমরা। নাহয় কয়েক ঘন্টা দেরি হলোই।'

'তাহলে, জোয়ান, ওই কথাই রইলো। সাড়ে পাঁচটায় ডিনারে বসছি,' বললেন মিসেস কুপার।

বেরিয়ে গেলেন তিনি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে নেমে যাচ্ছেন।

'আমার এসব ভাল্লাগছে না,' কিশোরের দিকে চেয়ে বললো বোরিস। 'আমাদের যাওয়া উচিত।'

'যাবো তো,' বললো কিশোর। 'আরেক ঘন্টা দেরিতে এমন আর কি ক্ষতি হবে?'

কি যে হবে, সেটা যদি এই মুহূর্তে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতো কিশোর পাশা!

তিন

'বাচ্চাদের খুব পছন্দ করেন, মিসেস কুপার,' বললো সান। 'নিজের ছেলেপুলে হয়নি, দুটো পালক ছেলে নিয়েছিলেন। তোমাদের সমান হতেই চলে গেছে, দু'জনেই। একজন এখন একটা গানের দলে ড্রাম বাজায়। আরেকজন আছে বিগ সার-এ, কাঠের খেলনা বানিয়ে টুরিস্টদের কাছে বিক্রি করে। অবসর সময়ে কবিতা লেখে।'

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'মিস্টার কুপার কি বলেন?'

'দু'চোখে দেখতে পারেন না ছেলেদুটোকে। বলেন, আলসের ঢেঁকি। বাউণ্ডুলে।' হেসে তিন গোয়েন্দাকে হুঁশিয়ার করলো জোয়ান, 'খবরদার, ডিনারে বসে তাঁর সামনে উল্টোপাল্টা কিছু করবে না। শান্ত থাকবে, ভদ্রভাবে খানা খাবে। মিসেস কুপারকে ভয় নেই, কিন্তু মিস্টার কুপার? রাগলে র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে খারাপ হয়ে যান। সাংঘাতিক বদমেজাজী।'

অস্বস্তি ফুটলো বোরিসের চোখে। 'তাহলে বাপু তাঁর সামনে যাওয়ারই দরকার নেই আমার,' হাত নাড়লো সে। 'আমি এখানেই থাকবো। খাওয়ারও দরকার নেই। তোমরা গিয়ে খেয়ে এসো।' জোয়ানের দিকে তাকালো। 'আমি এখানে থাকলে কোনো অসুবিধে হবে?'

'না, অসুবিধে কি? এখানেই আপনার খাবার বেড়ে দেবো। ছেলেরা গিয়ে খেয়ে আসুক ওখান থেকে।'

কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা-তিরিশ মিনিটে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে, ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে বড় বাড়িটার দিকে চললো তিন গোয়েন্দা। দরজা খুলে দিলেন মিসেস কুপার। এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বসালেন একটা বৈঠকখানায়। পুরনো ধাঁচের চেয়ার, সোফা, মখমলে মোড়া গদি।

মিস্টার কুপার ওখানেই আছেন। বিরক্ত হয়ে গজর গজর করছেন। টেলিভিশন সেটটার নাকি কি হয়েছে। 'ছবি নেই কিচ্ছু নেই, খালি ফোঁসফাঁস করছে!' আনমনে ছেলেদের দিকে একবার হাত নাড়লেন। 'কোত্থেকে এগুলোকে...,' হঠাৎ থেমে গেলেন। 'স্কুলে পড়ো, না? শেখো কিছু? পড়াশোনা করো? নাকি খালি আড্ডা মারো আর ঘুরে বেড়াও?'

কুঁকড়ে গেল রবিন আর মুসা।

কিশোর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, এই সময় একদিকের দরজায় দেখা দিলো এক মেকসিকান মহিলা। জানালো, ডিনার রেডি। উঠে, মিসেস কুপারের বাহুতে হাত

ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রায় টেনে নিয়ে চললেন মিস্টার কুপার। পেছনে চললো ছেলেরা।

সত্যি ভালো রাঁধে জোয়ান। খেয়ে মনে মনে প্রশংসা না করে পারলো না কিশোর। ধীরে ধীরে খাচ্ছে, আর মিস্টার কুপারের লেকচার শুনছে। প্লাস্টিক জিনিসটা যে কি পরিমাণ খারাপ, সেটাই ব্যাখা করে বোঝাচ্ছেন তিনি। চামড়ার জায়গা যে দখল করেছে প্লাস্টিক, আর তুলোর সুতার জায়গায় পলিয়েস্টার, এটা মোটেও পছন্দ নয় তাঁর। তারপর পড়লেন উঁইপোকা দমন ইনসপেক্টরকে নিয়ে। 'বোঝো কাণ্ড! উঁইপোকায় ক্ষতি করছে, সেটা দেখার জন্যে ইনসপেক্টর রাখে। একজন দু'জন নয়, শ'য়ে শ'য়ে। ব্যাটাদের কোনো কাজকম্মো আছে? কিচ্ছু নেই। খালি খায় আর ঘুমায়। ফুলে উঁইয়ের রানী হচ্ছে এক্কেকটা। আর ওই মোটর মেকানিকগুলো। একটা গাড়ি ঠিকমতো ঠিক করতে পারে?'

স্বামীর কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মিসেস কুপার। তারপর শুরু করলেন তিনি। তাঁর পালক ছেলেদের গুণের তারিফ করলেন শতমুখে। কবিতা লেখে যে ছেলেটা, তার তো নাকি গুণের সীমাই নেই।

'আরে দূর!' ধমকে উঠলেন মিস্টার কুপার। 'কবিতা! ওটা তো একটা আস্ত গর্দভ। কবিতা দিয়ে কি হয়? কি হয়? খেয়েদেয়ে বসে বসে তো আর কাজ নেই, খালি পাগলামি!'

'বার্ট, ডিয়ার,' কোমল কণ্ঠে বললেন মিসেস, 'তোমার চিবুকে ঝোল লেগেছে!'

একটা ন্যাপকিন নিয়ে থুতনি ঘষতে লাগলেন মিস্টার কুপার।

এই সুযোগে আবার শুরু করে দিলেন মিসেস কুপার, তাঁর পালক ছেলেদের গুণগান। 'গানের দলে এতো ভালো ড্রাম বাজায় ছেলেটা, যে কি বলবো। আসবে, এই আসছে আগস্টেই আসবে। বাজিয়ে শোনাবে আমাদের...'

বিষম খেলেন যেন মিস্টার কুপার। রাগে লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ। 'আস্ত এক রামছাগল ওটা!'

স্বামীর কথা যেন শুনতেই পেলেন না মিসেস কুপার। 'জানো, আমাকে চিঠি লিখেছে। আগস্টে আমাদের এখানে একটা সম্মেলন হবে তো...'

'সম্মেলন না ছাই! পাগল-ছাগলের দল। কি করে না করে তার ঠিক নেই।' টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মিস্টার কুপারের মুখ।

'দা ইউনিভার্স মিশনের বার্ষিক সম্মেলন হবে এখানে,' বলে গেলেন মিসেস কুপার। 'আগস্টে।' কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন। 'নিশ্চয় মিশনটার নাম শুনেছো। তুমি তো অনেক বইটই পড়ো। ওটার যারা সদস্য, সবাই বিশ্বাস করে উদ্ধারকারীরা আসবে ওমেগা গ্রহ থেকে। আমাদের কপাল ভালো হলে, চাই কি, দে আর কামিং বইয়ের লেখক মিস্টার গ্রেগরিসনও এসে পড়তে পারেন। চুপি চুপি একটা কথা

বলে রাখি, এমনও হতে পারে, তিনি আমাদের পৃথিবীর মানুষই নন। হয়তো ওমেগারই লোক।'

'জাহান্নামের লোক!' চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার কুপার। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গত বছর করেছে কি জানো, দা ইউনিভার্স মিশনের পাগলগুলো গিয়ে এক গমের খেতে আস্তানা গাড়লো। বিরাট প্যাণ্ডেল টানালো। তারপর শুরু হলো বক্তৃতা। এক ব্যাটা বললো, আমাদের পৃথিবীটা নাকি ফাঁপা, সেখানে অতিবুদ্ধিমান একজাতের প্রাণী বাস করে। আরেক বেটি উঠলো মঞ্চে। উঠেই শুরু করলো যত্তোসব আজগুবি কথাবার্তা। লোকের চোখ দেখে নাকি অতীত–বর্তমান–ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। সুচকে মন্ত্র পড়ে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখতে পারে। তারপর উঠলো এক ছোকরা, আপেলের মতো টসটসে গাল। খালি খায়, কাজকম্মো করে না তো কিছু, তাই ওরকম হয়েছে। উঠলো। উঠে চোখ বন্ধ করে শুরু করলো শুধু "আউম! আউম!" ইচ্ছে হয়েছিলো এক চড় মেরে দাঁতগুলো সব ফেলে দিই।'

'সম্মেলনে গিয়েছিলেন আপনি?' ফস করে বলে বসলো মুসা।

'যেতে বাধ্য হয়েছি! আমার বেগম সাহেব তো হয়ে গেছেন ওদেরই একজন। তা হোন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। যেখানে খুশি যান, তাতেও অমত করবো না। কিন্তু আমি সংগে থাকবো। পাগলের হাত থেকে বাঁচাবে কে নইলে? সংগে থেকেও কি পারি? এই তো সেবার, ঠেকাতে পারলাম কই? ফুসলে–ফাসলে ঠিক ওর মুখ থেকে কথা আদায় করে নিলো, আসছে গরমে এখানে এসে সম্মেলন করবে। আমি সংগে ছিলাম, তাতেই এই অবস্থা, না থাকলে বোঝো কি হতো?'

'বেশ বড় ধরনের সম্মেলন হবে,' হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মিসেসের মুখে। 'জানো,' কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন, 'অনেকেই জানে। জানে, উদ্ধারকারীরা এখন আমাদের ওপর কড়া নজর রাখছে।'

'হ্যাঁ, রাখছে,' মুখ ভেঙচালেন মিস্টার কুপার। 'তবে তারা উদ্ধারকারী নয়, চোরডাকাত আর সরকারের লোক। তবে আমিও তৈরি। আসুক একবার, বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

কিশোরের দিকে করুণ চোখে তাকালো মুসা। এই চাহনির অর্থ, 'ভাই, আর যে পারছি না। বাঁচাও। কিছু একটা করো!'

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে, ডিনারে দাওয়াত করার জন্যে। এখন তো যেতে হয়। বোরিস বসে আছে ওদিকে। এখন রওনা না হলে স্যান জোসেতে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।'

'নিশ্চয়,' বললেন মিসেস কুপার। 'দেরি করাবো না তোমাদের।'

ছেলেদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তিনি। যতোক্ষণ ণ সিঁড়ি বেয়ে নামলো

ওরা, দাঁড়িয়ে রইলেন একজায়গায়।

'কেমন কাটলো?' ছেলেরা রান্নাঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলো জোয়ান।

'দারুণ!' জবাব দিলো রবিন। 'আর বলবেন না!'

হাসলো জোয়ান।

খাওয়া শেষ করেছে বোরিস। প্লেটটা নিয়ে গিয়ে সিংকে ভেজালো।

জোয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো চারজনে। ট্রাকে উঠলো। র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালো ফোরম্যান সান।

'লোকটা ভালো,' রবিন বললো।

'ভালো ওরা কমবেশি সবাই,' বললো মুসা। 'বদ তো হলো গিয়ে ওদের মনিবটা। বদ্ধ উন্মাদ।'

খোয়াবিছানো পথ ধরে এগিয়ে চলেছে ট্রাক। মাইলখানেক দূরের ফটকের কাছে এসে গতি কমতে কমতে থেমে গেল একেবারে। কেবিনের দরজা খোলার শব্দ হলো। শোনা গেল বোরিসের ডাক, 'কিশোর?'

ব্যাপার কি? পেছন থেকে লাফিয়ে নামলো তিন গোয়েন্দা। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, পরনে সামরিক পোশাক, কোমরে গুলির বেল্ট। হাতে রাইফেল। মাথায় ধাতব হেলমেট। 'সরি,' বললো সে। 'রাস্তা বন্ধ।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'জানি না,' জবাব দিলো সৈনিক। কম্পিত কণ্ঠ, যেন কোনো কারণে ভয় পেয়েছে। 'আমার ওপর আদেশ আছে, কেউ যেন যেতে না পারে। রাস্তা বন্ধ।'

এক হাত থেকে আরেক হাতে রাইফেলটা সরাতে গিয়ে পিছলে গেল। ধরলো আবার। ট্রিগারে আঙুলের চাপ লেগে বিকট শব্দে ফুটলো বুলেট।

চার

গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুললো পাহাড়ে পাহাড়ে। বোকার মতো নিজের হাতের রাইফেলের দিকে তাকিয়ে রইলো সৈনিক। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, বড় বড় হয়ে উঠেছে চোখ।

'গুলি ভরা!' রাগ চাপা দিতে পারলো না বোরিস।

'হ্যাঁ,' কণ্ঠ কাঁপছে সৈনিকের। 'আজ তাজা বুলেট সাপ্লাই করেছে।'

শক্ত করে ধরেছে রাইফেলটা। ভয়, আবার যদি হাত ফসকায়?

এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। একটা জীপ আসছে। কয়েক ফুট দূরে এসে থামলো।

'ড্যান, কি হয়েছে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো জীপে ড্রাইভারের পাশে বসা অফিসার। কড়া চোখে তাকালো বোরিসের দিকে, তারপর ফিরলো ছেলেদের দিকে।

'সরি, স্যার,' মিনমিন করে বললো সৈনিক। 'হাত থেকে পিছলে গিয়েছিলো...।'

'একটা রাইফেল ধরে রাখতে পারো না,' ধমকে উঠলো অফিসার। 'সাগু খাও নাকি?'

'না, স্যার।'

লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে বোরিসের দিকে এগোলো অফিসার। তরুণ, রাইফেলধারী সৈনিকের বয়েসী। গায়ের জ্যাকেটটা নতুন। মাথার হেলমেটটাও। এমনকি পায়ের দামী বুটজোড়াও। 'আমি লেফটেন্যান্ট শেট মরটন,' দস্তানা পরা হাত তুলে স্যালুটের ভঙ্গি করলো সে। কিশোরের মনে হলো, মিলিটারির অভিনয় করছে লোকটা, যুদ্ধের ছবিতে বাজে অভিনেতা যেরকম করে।

'রাস্তা বন্ধ কেন?' জানতে চাইলো বোরিস। 'স্যান জোসেতে যেতে হবে আমাদের। এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার সময় নেই।'

'সরি, এটা খেলা নয়,' বললো লেফটেন্যান্ট। 'ক্যাম্প রবার্টস থেকে পাঠানো হয়েছে আমাদের। কড়া আদেশ আছে, যাতে এপথে কাউকে চলাচল করতে না দিই। স্যান জোয়াকুইন ভ্যালিতে যাওয়ার ইমারজেন্সি রুট এটা। সামরিক যানবাহনের জন্যে পরিষ্কার রাখতে বলা হয়েছে।'

'আমরা তো আর বন্ধ করে রাখবো না,' বললো কিশোর। 'একশো এক নম্বর সড়কে নেমে উত্তরে স্যান জোসের দিকে চলে যাবো।'

'একশো এক নম্বর সড়কও বন্ধ। যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই ফিরে যাও। কাজ করতে দাও আমাদেরকে।' কোমরের খাপে ঝোলানো পিস্তলে হাত রাখলো অফিসার। 'বললামই তো, কড়া আদেশ আছে, এপথ দিয়ে যেন কাউকে যেতে না দিই। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি।'

'ভালো?' লেফটেন্যান্টের কথার প্রতিধ্বনি করলো যেন বোরিস। 'পিস্তল দেখাচ্ছেন, আবার বলছেন ভালো!'

'সরি,' কণ্ঠস্বর নরম করলো অফিসার। 'কিন্তু এদিক দিয়ে যেতে দিতে পারবো না। কেন পারবো না জিজ্ঞেস করবেন না, বলতে পারবো না। জানিই না আমি। ফিরে যান।'

'মিস্টার কুপার এসব বিশ্বাস করবেন না,' বললো কিশোর। 'মিস্টার আলবার্ট হেনরি কুপার, বিখ্যাত ধনী। ভীষণ রেগে যাবেন। হয়তো ওয়াশিংটনে ফোন করে বসবেন। খুব ক্ষমতাশালী লোক, জানেন নিশ্চয়।'

'আমার কিছু করার নেই,' একভাবে বললো অফিসার। 'যেতে দিতে পারবো না।'

আরও কয়েকজন সৈন্য এসে হাজির হলো। হাতে রাইফেল। সবাই সতর্ক।

'হোকে,' হাত নাড়লো বোরিস। 'কিশোর, চলো ফিরে যাই। মিস্টার কুপারকে গিয়ে বলি।'

'হ্যাঁ, তাই করুনগে। সেইই ভালো,' বলে জীপে গিয়ে উঠলো আবার লেফটেন্যান্ট। 'চলুন, আমিও যাচ্ছি। মিস্টার কুপারকে সব বুঝিয়ে বলবো।'

বোরিস উঠলো ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে। তিন গোয়েন্দা পেছনে।

'আশ্চর্য!' বললো মুসা।

'হ্যাঁ, তাই,' কিশোর বললো। ফিরে চলেছে ট্রাক। পেছনে আসছে জীপটা। 'অথচ ঢোকার সময় কোনো গোলমাল দেখিনি, কোনো আভাসই ছিলো না। হঠাৎ এমন কি ঘটে গেল?'

'আল্লাই জানে। কিন্তু সৈন্যদের আচরণ দেখেছো? ভয় পেয়েছে। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে।'

র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে এসে ট্রাক থামালো বোরিস। পেছনে থামলো জীপটা। নেমে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানকার ইনচার্জ কে?'

শব্দ শুনে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে এলো ফোরম্যান সান, পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। পেছনে এলো জেনি, আর জোয়ান। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে রইলো হ্যারি ব্যানার।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো সান।

'আপনি মিস্টার কুপার?' জানতে চাইলো অফিসার।

'না, আমি তাঁর ফোরম্যান।'

বড় বাড়িটার পেছনের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন মিস্টার এবং মিসেস কুপার। বারান্দা থেকেই জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার কুপার 'কি হয়েছে?'

'রাস্তা বন্ধ,' জবাব দিলো কিশোর। 'আমাদেরকে যেতে দিচ্ছে না।'

অফিসারের দিকে চেয়ে জ্বলে উঠলো কুপারের চোখ। 'আমার রাস্তা? বন্ধ?'

সাঁঝের ঠাণ্ডা বাতাসের মাঝেও ঘামতে শুরু করেছে লেফটেন্যান্ট। দেখে মজা পেলো কিশোর।

'মাপ করবেন, স্যার,' তোতলাতে শুরু করলো অফিসার, 'ও–ও–ওটা আ–আপনার রাস্তা না!'

হাসি চাপতে পারলো না কিশোর। মানুষকে শুধু ঘামান না মিস্টার কুপার, তোতলা বানিয়ে ছাড়েন।

'তবে কি তোমার?' চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার। 'বন্ধ! বন্ধ মানে কি? ওটা জনসাধারণের রাস্তা।'

'হ্যাঁ–হ্যাঁ, স্যার। স্যান জোয়াকুইনের দিকের স–সড়কটা...'

'আরে বাবা, ওরকম করছো কেন?' গর্জে উঠলেন কুপার। 'যা বলার বলে ফেলো না সাফ সাফ।'

'আ–আমাদের ওপর অর্ডার আছে, স্যার,' ধমক খেয়ে তোতলামি কমলো লেফটেন্যান্টের, 'এই আজ বিকেলে! ওয়াশিংটন থেকে। কি জানি কি—ঘটছে...'

'লেফটেন্যান্ট!' আরও জোরে গর্জে উঠলেন কুপার।

'টেক্সাসে, স্যার!' তোতলামি একেবারে চলে গেল লোকটার। 'কিছু ঘটেছে।' কথা বলার শক্তি অর্জনের জন্যেই বুঝি হেলমেট খুলে কালো চুলে হাত বোলালো। 'কি হয়েছে, বলতে পারবো না। তবে আমেরিকার প্রধান প্রধান সমস্ত সড়ক বন্ধ করে দিতে বলা হয়েছে, স্যার। কোনো ট্র্যাফিক চলবে না।'

'মাথা খারাপ!'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ওয়াশিংটনকে ফোন করছি আমি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'প্রেসিডেন্ট,' ঘোষণা করলেন কুপার, 'প্রেসিডেন্টকে ফোন করবো।' দুপদাপ করে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। জানালা–দরজা সব খোলা। ভেতরে যে ডায়াল করছেন কুপার, বাইরে থেকেই সেটা শোনা গেল। নিরবতা। খটাস করে ক্র্যাডলে রিসিভার আছড়ে রাখার শব্দ হলো। 'ধ্যাত্তোর!' শোনা গেল চিৎকার।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কুপার। নামতে শুরু করলেন সিঁড়ি বেয়ে। 'ফোনের নিকুচি করি! মরে ভূত হয়ে আছে! নিশ্চয় কোথাও লাইন ছিঁড়েছে।'

'না, স্যার,' বলেই দ্রুত সামলে নিলো লেফটেন্যান্ট। 'মা–মানে আমার মনে হয় না, স্যার।'

'কি মনে হয় তোমার?' থমকে দাঁড়ালেন কুপার। 'কি জানো?'

'কিছু না, স্যার। শুধু এটুকু জানি, এই এলাকার কোনো টেলিফোন কাজ করছে না। রেডিও কাজ করছে না। ওয়াশিংটন থেকে টেলিগ্রাফে এসেছে আমাদের আদেশ।'

'ফোন কাজ করছে না? রেডিও কাজ করছে না?'

কটেজগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন। ভীত। সাঁঝের মলিন আলোয় ফ্যাকাসে চেহারা আরও বেশি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাদের।

'লোকটা ঠিকই বলেছে, মিস্টার কুপার,' বললো একজন শ্রমিক। 'রেডিও কাজ করছে না।'

'টেলিভিশনও না,' এগিয়ে এসে বললো আরেকজন। 'ছবি নেই। খালি ফোঁস ফোঁস করছে। শুধু তাই না, ইলেকট্রিসিটিও চলে গেছে।'

'টেলিভিশন কাজ করে না?' কুপারের কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন ঘটলো। ভয়ের ক্ষীণ ছায়া ফুটলো চেহারায়। 'বিদ্যুৎ নেই?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো জোয়ান মারটিংগেল। 'পথ বন্ধ কেন? ওয়াশিংটন থেকে ঠিক কি আদেশ এসেছে? কি ঘটেছে টেকসাসে?'

'জানি না, ম্যা'ম,' জবাব দিলো লেফটেন্যান্ট। 'আমাকে বলা হয়নি। শুধু…

'জানি জানি,' বাধা দিলো জোয়ান। 'শুধু আপনাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।' ঘুরে, ধুপধুপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বিরাট রান্নাঘরটায় অদৃশ্য হয়ে গেল সে। খানিক পরে জানালা দিয়ে দেখা গেল, একটা রেডিও বের করে নব ঘোরাচ্ছে জোয়ান। হঠাৎ স্পীকার থেকে ছড়িয়ে পড়লো মিউজিক। স্পষ্ট শুনতে পেলো বাইরে দাঁড়ানো সবাই।

'রেডিও চলে না, না?' জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচালো জোয়ান। 'এটা কি চলছে তাহলে?'

'এক সেকেণ্ড!' হাত তুললো কিশোর। 'ওই মিউজিক… ওটা…'

'হেইল টু দা চীফ!' তার কথাটা শেষ করে দিলেন কুপার। 'ম্যারিন ব্যাণ্ড–এর বাজনা। প্রেসিডেন্টের ভাষণের আগে দেয়!'

শেষ হলো মিউজিক। এক মুহূর্ত নিরবতা। তারপর শোনা গেল ঘোষকের কথা, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কথা বলবেন এখন।'

স্বামীর কাছে সরে গেলেন মিসেস কুপার। তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন মিস্টার কুপার।

'মাই ফ্রেণ্ডস,' স্পীকারে ভেসে এলো একটা পরিচিত কণ্ঠ, 'আজ দুপুরের একটু পর খবর এলো আমার কাছে, অপরিচিত আকাশযান দেখা গেছে টেকসাস, নিউ মেকসিকো আর ক্যালিফোরনিয়া উপকূলের আকাশে। এই খানিক আগে আরেকটা খবর এসেছে—সঠিক কিনা যাচাই করা হয়নি এখনও—ওই আকাশযানের কয়েকটা নেমেছে ফোর্ট ওয়ার্দ, ডালাস, টাওস, আর স্যান ফ্র্যানসিসকোয়।আবার বলছি, সঠিক কিনা যাচাই করা হয়নি এখনও।

'আপনারা ঘাবড়াবেন না। কিছু কিছু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সত্য,তবে সেটা সাময়িক। ক্রেমলিনের সংগে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে। ইউরোপ আর দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করা হচ্ছে। আপনারা জানেন, অনেক সরকারের সঙ্গে, যেমন, পুব এবং দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তেমন একটা ভালো নেই। যাই হোক, আপনারা ঘাবড়াবেন না…'

'ওই এক কথাই তো আরেকবার বলেছো, গর্দভ কোথাকার!' রেডিওর দিকে ফিরে ধমকে উঠলেন কুপার।

'অনেকগুলো মিলিটারি ইউনিটকে ছাউনি থেকে বেরোনোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' বলে চললো কণ্ঠটা, 'সমস্ত নাগরিককে সহায়তা করার আবেদন জানাচ্ছি আমরা। মিলিটারিকে সহযোগিতা করুন। ঘর থেকে বেরোবেন না। আর...'

তীক্ষ্ণ কড়কড় খড়খড় করে উঠলো হঠাৎ স্পীকার। নীরব হয়ে গেল রেডিও।

'গরু!' চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার। 'আস্ত একটা গরু! ওটা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলো কিভাবে? দশ মিনিট ধরে বকবক করলো, আসল কথা কিছুই বললো না। কিচ্ছু না!'

'মিস্টার কুপার, একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' বললো ফোরম্যান ড্যাম সান, 'অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে আমাদের দেশে। বাইরের কেউ! আমাদের বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে! আমরা...আমরা এখানে একা, বন্দি! বেরোতে পারবো না, অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো না, কিছুই বুঝতে পারলো না, বাইরে কি ঘটছে!'

পাঁচ

'অপরিচিত আকাশযান!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার। 'হারামজাদার মাথা! আসলে টেরোরিস্টদের কাজ। কয়েকটা রেডিও স্টেশন দখল করে নিয়েছে, ব্যস। ভয় দেখাচ্ছে আমাদের।...যাচ্ছি, আমি শহরে যাচ্ছি। ক্যাম্প রবার্টস পর্যন্ত তো যাবোই। কি ঘটছে, জানে, এমন কাউকে জিজ্ঞেস করা দরকার...।'

'আ-আ-আমার ওপর আ-আ-আদেশ...,' তোতলাতে শুরু করলো আবার লেফটেন্যান্ট, 'কো-কো-কোন গাড়ি রাস্তায় নামবে না।' কুপারের দিকে চেয়ে সোজা হলো সে, দম নিলো। যেন জোর করে সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে বললো, 'আমি অনুরোধ করছি, মিস্টার কুপার, এখানেই থাকুন। বেরোনোর চেষ্টা না করলেই ভালো করবেন। আমার ওপর আদেশ আছে, স্যার, স্যান জোয়াকুইন ভ্যালির সড়ক মুক্ত রাখার। আর র‍্যাঞ্চো কুপার যাতে নিরাপদে থাকে, সেদিকে নজর রাখতেও বলা হয়েছে আমাকে।'

'নিরাপদ?' বলে উঠলো জোয়ান। বেরিয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে। 'কেন? কিসের ভয়? বাইরে কি ঘটছে, লেফটেন্যান্ট?'

'আমি বলতে পারবো না, ম্যা'ম।'

'লেফটেন্যান্ট,' কুপার বললেন 'ঠিকঠাক মতো বলো তো, কি আদেশ দেয়া

হয়েছে তোমাকে?'

চুপ করে রইলো মরটন।

'এই মিস্টার, চুপ করে আছো কেন?' ধমকে উঠলেন কুপার। 'তোমার কমাণ্ডিং অফিসার কি আদেশ দিয়েছে তোমাকে?'

তবু নীরব রইলো লেফটেন্যান্ট।

'রাস্তার ব্যাপারে অতো মাথাব্যথা নেই ওদের, তাই না?' বললেন, কুপার। 'ওই রাস্তার চেয়ে ইমপরটেন্ট আরও অনেক রাস্তা আছে। আসলে র‍্যাঞ্চো কুপারকে পাহারা দিতে এসেছো তোমরা। কেন? আমরা কি? হঠাৎ এতো দামী হয়ে গেলাম কি কারণ?'

'আশেপাশে এরকম জায়গা আর ক'টা আছে, মিস্টার কুপার?' জবাবটা দিলো জোয়ান। 'এতো খাবার কোথায় জমানো আছে! বাইরে থেকে একটা জিনিসও না এনে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারবো আমরা এখানে। সেটাই ওদের লোভ।'

'অ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার। 'তাই তো। শুরু হয়ে গেছে তাহলে।'

'কী, বার্ট?' প্রশ্ন করলেন মিসেস কুপার।

'বলেছিলাম না, হবে? হতেই হবে। এবং হয়েছে। এতো তাড়াতাড়ি হবে আশা করিনি। ওই অপরিচিত আকাশযানের কথা স্রেফ ভাঁওতাবাজি। ধোঁকা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে লোককে যার যার ঘরে আটকে রাখতে চাইছে। এই সুযোগে পালের গোদাগুলো এসে ঢুকবে আমার এখানে, জোর করে ঢুকে পড়বে। তারপর নিরাপদ।'

'মিস্টার কুপার,' বললো সান, 'কি বলছেন, বুঝতে পারছি না···'

'পারছো না? পারবে পারবে। শুরু করে দিয়েছে আরকি। গণ্ডগোল। টেরোরিস্ট, টেরোরিস্টের দল। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কিছু ঘুষখোর অসৎ সরকারী কর্মচারী। এবং মিলিটারি। বর্তমান সরকারকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন সরকার গঠন করবে।'

'কিন্তু তার জন্যে সময় দরকার,' হালকা গলায় বললো কিশোর। 'আজ বিকেলে রকি বীচ থেকে বেরোনোর সময়, এমনকি এখানে ঢোকার সময়ও তো কিছুই বোঝা যায়নি। 'সব কিছুই স্বাভাবিক ছিলো।'

'এখন আর স্বাভাবিক নয়। সাংঘাতিক কিছু ঘটছে। বলদ প্রেসিডেন্টটা কোনো খোঁজই রাখেনি। বুঝবে এখন ঠ্যালা, মরবে। তারপর গিয়ে শিক্ষা হবে।'

'মিস্টার কুপার,' জোয়ান বলে উঠলো, 'কারা আসবে বললেন? এতো লোকের রান্না একা কি করে রাঁধবো···'

'জোয়ান,' ধমক দিলেন কুপার, 'বেশি কথা বলো না। কে রাঁধতে বলেছে তোমাকে? শয়তানগুলোকে জায়গা দিচ্ছে কে এখানে?' লেফটেন্যান্টের দিকে চোখ পড়তেই খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন এখানে? যাও, ভাগো। আমার নিজের লোক আছে, বন্দুক আছে, র‍্যাঞ্চ বাঁচাতে তারাই যথেষ্ট। খবরদার, জোর

করে ঢোকার চেষ্টা করো না। তাহলে মরবে।'

'জ্বী, স্যার,' তাড়াতাড়ি গিয়ে জীপে উঠলো লেফটেন্যান্ট। ড্রাইভারকে চালানোর নির্দেশ দিলো।

চলতে শুরু করলো জীপ।

'ড্যাম,' বললেন কুপার, 'জলদি গিয়ে দশজন লোক বাছো। বিশ্বাসী লোক। রাইফেলে নিশানা ভালো এমন। বেছে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

'তাতে কোনো লাভ হবে?' প্রশ্ন তুললেন মিসেস কুপার। 'দশজনে কি করবে? ওরা যদি অনেক বেশি আসে? হেলিকপ্টার নিয়ে আসে? বলা যায় না, পালিয়ে প্রেসিডেন্টও চলে আসতে পারেন এখানে...'

'চুপ! মাথামোটা মেয়েমানুষ। প্রেসিডেন্টকে অতোদূর আসতে দেবে নাকি? তার আগেই তো খতম করে দেবে।' ঘরের ভেতরে ঢুকতে গিয়েও ঢুকলেন না কুপার। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমার এখানেই থাকো। তোমাদের কোনো দোষও নেই। আমার জিনিস পৌঁছে দিতে এসেই আটকা পড়েছো। থাকো। জোয়ান, আরও তিনজনের রান্না রাঁধতে কোনো অসুবিধে হবে না তো?'

'না, মিস্টার কুপার।'

'ভেরি গুড,' বলে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন কুপার।

ইয়ার্ডের ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বোরিস। তার কাছাকাছি রয়েছে তিন কিশোর। দেখছে, শ্রমিকদের মধ্যে থেকে দশজনকে বেছে নিচ্ছে সান।

এক এক করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মিস্টার কুপারের ঘরে ঢুকলো ওরা।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো আবার। অন্ধকার হয়ে গেছে। তবু ওদের হাতের রাইফেল আর কাঁধে ঝোলানো গুলির বেল্ট দেখতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। খোয়াবিছানো পথ ধরে কাঁটাতারের বেড়া আর মেইন গেটের দিকে চলে গেল লোকগুলো।

শ্রমিকেরা যারা ভিড় করে ছিলো, চলে গেল যার যার কটেজের দিকে। খালি হয়ে গেল জায়গাটা। দাঁড়িয়ে আছে শুধু বোরিস, আর তিন গোয়েন্দা।

মিস্টার কুপারের ঘর থেকে বেরোলো সান। কাছে এসে বললো, 'বাইরে কি হচ্ছে, জানি না। তবে আমার মনে হয়, বেশিক্ষণ থাকবে না এই অবস্থা। কালই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।' র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে চলে গেল সে।

বিদ্যুৎ নেই। র‍্যাঞ্চহাউসের জানালা দিয়ে আসছে হ্যারিকেনের মৃদু আলো। সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বোরিস বললো, 'আমরা দাঁড়িয়ে আছি কেন? চলো, ঘরে যাই।'

মাথা নেড়ে বোরিসকে যেতে ইশারা করলো কিশোর।

ও চলে গেলে রবিন বললো, 'আমরা গেলাম না কেন?'

'কি বলবো বুঝতে পারছি না,' বললো কিশোর। 'বিকেলেও দেখলাম সব কিছু স্বাভাবিক। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এভাবে বদলে গেল?'

'এক কাজ করলে তো পারি আমরা।' পরামর্শ দিলো মুসা। 'গাড়ি আটকাচ্ছে মিলিটারি। কিন্তু হেঁটে যেতে তো কোনো বাধা নেই...,' থেমে গিয়ে নিজেই বললো আবার, 'নাহ্, সেটা বোধহয় উচিত হবে না। এই দুর্গেই এখন নিরাপদ আমরা।'

'আমার সন্দেহ আছে,' কিশোর বললো। 'তবে তোমার ওই কথাটা ঠিক, হেঁটে যেতে পারি আমরা। অন্তত কাছের শহরটায় তো গিয়ে দেখতে পারি। এখানে থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না। হয়তো সত্যি বাইরের শত্রু আক্রমণ করেছে।'

'কিন্তু মিষ্টার কুপারের লোকেরা পাহারা দিচ্ছে,' প্রশ্ন তুললো রবিন, 'বেরিয়ে যেতে দেবে আমাদের?'

'না জানিয়ে যাবো।'

'পথে সৈন্যরা ধরলে?' মুসা বললো।

'ওদের চোখেও পড়বো না। আমার মনে হয় শুধু মেইন গেটের দিকেই নজর রেখেছে ওরা। দূর দিয়ে সরে যাবো আমরা।'

'ঠিক আছে,' রবিন বললো। 'বসে বসে এখানে আকাশের তারা গোণার চেয়ে বেরিয়ে পড়াই উচিত।'

'চলো তাহলে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললো কিশোর। 'অদ্ভুত কিছু ঘটছে। কী, তা জানা দরকার।'

ছয়

অন্ধকারে, নির্জন পথ ধরে নীরবে এগিয়ে চললো তিন গোয়েন্দা।

'আরিব্বাপরে, কি অন্ধকার!' ফিসফিসিয়ে বললো মুসা। 'কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'বেশিক্ষণ থাকবে না,' কিশোর বললো।

ঠিকই বলেছে। একটু পরেই চাঁদ উঠলো। হালকা রূপালি আলো ছড়িয়ে পড়লো উপত্যকায়। লেবুবাগানে গাছের তলায় আলো ঢুকতে পারছে না; সেখানে অন্ধকার ছায়া।

'এখানে থাকলে দেখে ফেলবে,' কিশোর বললো। বাগানের দিকে হাঁটতে শুরু করলো সে। 'ছায়ায় ছায়ায় যাবো।'

দক্ষিণ সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা।

পনেরো মিনিট হাঁটার পর বেড়া চোখে পড়লো।

পাতাবাহারের ঝাড়ের কাছে এসে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, চুপচাপ। উঁকি দিলেই ওপাশের রাস্তা চোখে পড়ে।

মিনিট দু'য়েক কিছুই ঘটলো না। তারপর হেডলাইটের আলো দেখা গেল। একটা জীপ আসছে। জীপের ওপরে সার্চলাইটও বসানো হয়েছে, জ্বলে উঠলো ওটা। ঝট করে বেড়ার কিনারে একেবারে শুয়ে পড়লো তিন কিশোর, আলো এড়ানোর জন্যে।

গেটের পশ্চিমে পাহাড়ের মাথায় একটা আলো জ্বলে উঠলো।

'ওখান থেকে বেড়ার ওপর নজর রাখছে কেউ,' বললো রবিন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'হয়তো কুপারের লোক।'

'আমরা বেড়া ডিঙাতে গেলেই দেখে ফেলবে,' মুসা বললো। 'গেটের কাছেও আছে একজন। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।'

সরে গিয়েছিলো জীপটা। রাউণ্ড শেষ করে ঘুরে এলো আবার। ছেলেরা যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, তার কাছাকাছি এসে থামলো। পশ্চিমের পাহাড় চূড়ায় আবার আলো নেচে উঠলো। জীপের লোকগুলোর ওপর পড়লো সেই আলো। তিনজন। কাঁধে ঝোলানো রাইফেল নামিয়ে নিলো, গুলি ঠিকমতো ভরা আছে কিনা পরখ করে দেখলো যেন। চলতে শুরু করলো আবার জীপ। উঁচু একটা টিলার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আমাদের ঠেকাবে কেন কুপারের লোক?' বললো রবিন। 'তিনি তো আদেশ দিয়েছেন, শুধু বাইরের লোককে যাতে ঢুকতে দেয়া না হয়।'

'তা ঠিক,' কিশোর বললো। 'তবে ওরা দেখলে হৈ-চৈ করতে পারে। তাতে সৈন্যদের চোখে পড়ে যেতে পারি আমরা।'

'তাতে কি? কেন বাধা দিতে আসবে ওরা? আমরা তো আর ওদের গাড়ি আটকাচ্ছি না।'

'শুধু গাড়ির কথা বলেছে বটে লেফটেন্যান্ট। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, র‍্যাঞ্চের কাউকেই বেরোতে দিতে চায় না সে।'

'মিস্টার কুপারকে বলো সেকথা,' মুসা বললো।

'তিনিও কিন্তু বলেছেন। র‍্যাঞ্চের দিকেই লেফটেন্যান্টের নজর, পথের দিকে নয়। আমাদের বেরোতে দেবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে, পথ পেরিয়ে একবার ওদিকের ওই ঝোপঝাড়ে ঢুকে যেতে পারলে আর আমাদের খুঁজে পাবে না।'

'ঢুকলে কি হবে,' মুসা বললো, 'যা কাঁটা-ঝোপ। ওগুলোর ভেতর দিয়ে এগোতে পারবো না। ফালা ফালা হয়ে যাবে চামড়া।'

'হ্যাঁ, তা-ও কথা ঠিক। ম্যাপে দেখেছি, আরেকটা পথ আছে। উত্তরে। তবে সেটায় যেতে হলে পাহাড় ডিঙাতে হবে।'

পশ্চিমের পাহাড়–সারির দিকে তাকালো মুসা। চাঁদের আলোয় কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে চূড়াগুলো। ফাটল আর খাদ বোঝা যায় পরিষ্কার, ঘন কালো অন্ধকার ওসব জায়গায়।

'বেশ, তা না হয় চেষ্টা করা যাবে। তবে দিনের বেলা। এখন সম্ভব নয়। আলো নিয়ে লোক বসে আছে। তাছাড়া অন্ধকারে উঠতে গিয়ে পা ফসকালে···,' বাক্যটা শেষ করলো না মুসা।

'মরবো,' আনমনে বললো কিশোর। 'ঠিক আছে, চলো, ফিরে যাই। ঘুমাইগে। ভোরের আলো ফুটলেই রওনা হবো।'

লেবুবাগানের ভেতর দিয়ে ফিরে চললো ওরা। কুপাররা যে বাড়িটাতে থাকে, মানে মূল বাড়িটার শ'খানেক গজ দূরে বাগান ছেড়ে পথে এসে উঠলো।

'কিশোর?' র‍্যাঞ্চহাউসের এক কোণ ঘুরে বেরিয়ে এলো বোরিস। 'তোমরা ওখানে?'

'হ্যাঁ,' সাড়া দিলো কিশোর।

'কোথায় গিয়েছিলে? আমি এদিকে খুঁজে মরছি।'

ঘরের পেছনের দরজা খুলে মিস্টার কুপার বেরোলেন বারান্দায়। 'কে ওখানে?'

'আমরা, মিস্টার কুপার,' জবাব দিলো মুসা। হঠাৎ, তীব্র নীল–শাদা আলো চোখে পড়লো তার। চেঁচিয়ে উঠলো, 'কিশোর! দেখো দেখো!'

উত্তরের একটা পাহাড় চূড়ায় যেন নীল আগুন জ্বলছে। আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে উজ্জ্বল শিখা।

'আরে, কি কাণ্ড?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার কুপারও।

ক্ষণিকের জন্যে গ্র্যানিটের নগ্ন চূড়াটাকে যেন ঢেকে দিলো আগুন। তারপর, বাঁধের ওধার থেকে উঠতে শুরু করলো ঘন কুয়াশা। নাকি ধোঁয়া?

অনেকগুলো দরজা খোলার শব্দ হলো। রাস্তায় অনেক পায়ের আওয়াজ। ভয় আর বিস্ময় মেশানো চিৎকার।

ওদিকে, ধোঁয়ার মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো, কিংবা বলা যায় উঠে এলো, ডিম্বাকৃতির একটা বস্তু। নীলচে আলোয় চকচক করছে রূপালি রঙ। বাতাসে ভর করে উঠছে ওটা, দ্রুত। চূড়ার ওপরে উঠে গেল চোখের পলকে, দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল রাতের আকাশে।

ধীরে ধীরে নিভে এ... চূড়ার নীল আগুন।

র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে এখানে স্তব্ধ নীরবতা। সেই নীরবতা খানখান করে হঠাৎ আবার চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'খাইছে! এ–তো ফ্লাইং সসার!'

সাত

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলেন কুপার।

কেউ কিছু বললো না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস কুপার। 'বার্ট? দেখেছো ওটা?'

'দেখবো না কেন? অন্ধ নাকি আমি?' চেঁচিয়ে ডাকলেন মিস্টার কুপার, 'হ্যারি! ড্যাম! হ্যানস!' ওরা এগিয়ে এলে হাত তুলে পাহাড়ের চূড়াটা দেখালেন। 'কি হয়েছে দেখতে যাবো। গাড়ি বের করো।'

রাস্তায় গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো। ফিরে তাকালো কিশোর। মিলিটারি জীপ। র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে এসে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলো।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলো লেফটেন্যান্ট পেট মরটন। 'মিস্টার কুপার? আপনারা ভালো? আগুন দেখলাম। কি হয়েছিলো?'

'কিছু হলে, এবং সেটা তোমাকে জানানোর দরকার মনে করলে জানাবো,' ধমকে উঠলেন কুপার। 'এখন ভাগো! যাও এখান থেকে।'

'বার্ট,' কড়া গলায় বললেন মিসেস কুপার, 'সত্যি, তুমি খুব দুর্ব্যবহার করো মানুষের সংগে।'

'আমার খুশি। এই লেফটেন্যান্ট, এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

জীপে গিয়ে উঠলো আবার মরটন।

গাড়িটা রওনা হয়ে যেতেই মিস্টার কুপার ডাকলেন, 'পিনটো?'

আট-ন' বছরের একটা ছেলে এগিয়ে এলো।

'যা-তো, দৌড়ে গিয়ে তোর বাবাকে বল, গেটের ভেতরে ঢুকলেই যেন জীপটার টায়ারে গুলি করে।'

প্রায় সংগে সংগে ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠলো এক মহিলা, 'এরকম একটা খবর নিয়ে পিনটোর যাওয়া উচিত হবে না। আমি যাচ্ছি।'

'বার্ট, সব কিছু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে আমার কাছে। লেফটেন্যান্টের দোষ কি? সে-তো তার কর্তব্য পালন করছে।'

'ও অনধিকার চর্চা করছে। আমার জায়গায় ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছে তাকে? শুরুতেই ঠেকাতে হবে। নইলে আর কয়েক ঘন্টা পরেই সরকারী লোক কিলবিল করবে এখানে।' ফোরম্যানের দিকে ফিরলেন কুপার। 'চলো, যাই।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

'সংগে বন্দুক নেয়া উচিত।' পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে হ্যারি

ব্যানারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন কুপার। 'যাও, চট করে চারটে রাইফেল বের করে নিয়ে এসো। গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নিও।'

'বার্ট, গুলি করবে নাকি?' আঁতকে উঠলেন মিসেস কুপার।

'দরকার না পড়লে করবো না,' কাটা জবাব।

মুসা আর রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে ওখান থেকে সরে গেল কিশোর। দুটো কটেজের মাঝের অন্ধকারে গিয়ে লুকালো।

'কি হয়েছে, সত্যি সত্যি জানতে চাইলে ওদের আগেই আমাদের গিয়ে পৌছতে হবে,' বললো সে। 'কুপার হয়তো সব চিহ্ন মুছে ফেলবেন। পরে গিয়ে আর কিছুই জানবো না। জিজ্ঞেস করলেও হয়তো বলবেন না আমাদের।'

ঢোক গিললো মুসা। 'কিশোর, ওরা রাইফেল নিচ্ছে সংগে।'

'নিক। গুলি করার আগে অন্তত হুঁশিয়ার করবে। দু'হাত তুলে বেরিয়ে আসবো। তবে ওদের নজরে না পড়ার চেষ্টাই করতে হবে।' ছুটতে শুরু করলো গোয়েন্দাপ্রধান।

'কিশোর,' পেছন থেকে বললো মুসা, 'ফ্লাইং সসার দেখলাম। যদি ভিনগ্রহবাসীরা থাকে বাঁধের ওখানে?'

'আছে কিনা সেটা দেখতেই তো যাচ্ছি।'

গুঙিয়ে উঠলো মুসা। কিন্তু গতি কমালো না। রবিনও দৌড়ে চলেছে ওদের সংগে।

কটেজের সারির পর খোলা মাঠ। চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গতি বাড়ালো ওরা। উত্তরে চলেছে। চাঁদের আলোয় দূর থেকেই দেখা গেল বাঁধটা।

তৃণভূমির কিনারে পৌছলো ওরা। ভেড়া চরছে। ওগুলোর মাঝ দিয়েই দৌড় দিলো ছেলেরা। কয়েকটা ভেড়া 'ব্যা-অ্যা-অ্যা' করে উঠে লাফিয়ে সরে গেল।

বাঁধের কাছে এসে পৌছলো ওরা। এক ধারের পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো।

বিকেলে সানের কাছে শুনেছে, বাঁধের অন্য পাশেও ভালো আরেকটা পশুচারণভূমি আছে। যদিও দেখায়নি তখন। আরও অনেক কথা বলেছে। ফোরম্যানের ধারণা, এককালে বড় হ্রদ ছিলো এখানে। র‍্যাঞ্চো কুপার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন আসলে ওই মৃত হ্রদের তলায়। বহুকাল আগে নিশ্চয় জোরালো ভূমিকম্পের ফলে দুই ভাগ হয়ে যায় হ্রদের তলদেশ, সমস্ত পানি ভূগর্ভে সরে যায়। ঠেলা খেয়ে উঁচু হয়ে যায় উত্তর দিকের পাড়।

বাঁধের উপরে উঠে এলো ছেলেরা। পাশ দিয়ে তৃণভূমির দিকে চলে গেছে একটা পথ। ভয়ে ভয়ে তাকালো মুসা। ভিনগ্রহবাসীরা কোথায়? তেমন কাউকে দেখতে পেলো না। আগুনে পোড়ার চিহ্নও চোখে পড়ছে না। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে শুধু নগ্ন পাহাড়ের সারি, পাথর, আর ঘাসের রূপালি কার্পেট। তৃণভূমিটা রয়েছে বাঁধ আর

পাহাড়ের চূড়া যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার মাঝখানে।

'টর্চ আনা উচিত ছিলো,' হাঁটু সমান উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো রবিন। কয়েক পা এগিয়েই হোঁচট খেয়ে পড়লো উপুড় হয়ে।

'দেখে চলো,' হুঁশিয়ার করলো কিশোর।

'এই দেখো,' উঠে বসে বললো রবিন, 'দেখে যাও। কি যেন পড়ে আছে!'

দ্রুত এসে তার পাশে বসলো অন্য দু'জন।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'এ-তো মানুষ! জ্যান্ত আছে, না মরে গেছে?'

পাশে বসে পরীক্ষা করে দেখলো কিশোর। 'জীবিতই। এই যে, শ্বাস পড়ছে।'

বাঁধের কাছে কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পায়ে লেগে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। কুপার আর তার লোকেরা আসছে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে মানুষটা। জোরে এক ঠেলা দিয়ে তাকে চিৎ করলো কিশোর। চাঁদের আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে চেহারা। চোখ বোজা, মুখ সামান্য ফাঁক। এলোমেলো ভাবে শ্বাস টানছে।

অতি হালকা একটা গন্ধ এসে নাকে লাগলো কিশোরের। পোড়া গন্ধ, চুল পোড়া।

'খবরদার!' চেঁচিয়ে বললেন কুপার। 'যেখানে আছো বসে থাকো। নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেবো।'

টর্চের আলো এসে পড়লো চোখেমুখে। চোখ মিটমিট করলো ছেলেরা।

'আরে, এ-দেখি ছেলেগুলো,' কুপারের কণ্ঠ।

'একটা মানুষ পড়ে আছে এখানে, মিস্টার কুপার,' জোরে বললো কিশোর।

দৌড়ে এলেন কুপার আর সান।

'ডা পঞ্চো!' চমকে গেলেন মিস্টার কুপার। 'রোজার ডা পঞ্চো!'

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে লোকটার মুখে আলো ফেললো সান। সাবধানে ছুঁয়ে দেখলো। বিড়বিড় করলো, 'ডান কানের পেছনে ফুলেছে···চুল··· পুড়েছে···'

নড়ে উঠলো অজ্ঞান লোকটা।

'রোজার,' কোমল কণ্ঠে বললো সান, 'আর ভয় নেই। আমরা এসে গেছি।'

চোখ মেললো লোকটা। ফোরম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'কি হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলো সান।

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো পঞ্চো, ব্যথায় মুখ বাঁকালো। 'পড়ে গিয়েছিলাম?' মাথা তুলে চারপাশে তাকালো। 'ভেড়াগুলো কোথায়? ভেড়া?'

'নিচের মাঠে। বাঁধের ওপারে।'

আস্তে উঠে বসলো ডা পঞ্চো। 'বুঝতে পারছি না। ভেড়াগুলোকে দেখতে এসেছিলাম। বাঁধের কাছাকাছি এসেছি, সব কিছু ঠিকঠাক।' অস্বস্তি ফুটলো চোখে।

'সব ঠিক। আমি নিচের মাঠে। ব্যস, এরপর কি যে হলো, আর কিছু মনে নেই। এখানে কি করে এলাম? তোমরা এনেছো?'

'না। ওরা তোমাকে পেয়েছে এখানে,' তিন গোয়েন্দাকে দেখালো সান। 'আচ্ছা, কিছু দেখেছো বলে মনে পড়ে? আগুন? ধোঁয়া? বা অন্য কিছু?'

'কিচ্ছু না,' দুই হাতে মাথা চেপে ধরলো ডা পঞ্চো। 'আরি, আমার চুল? চুলে কি হলো?'

'পুড়েছে।'

আহত লোকটার পাশে এসে বসলো ব্যানার। কোমল গলায় স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে লাগলো। অন্যেরা ছড়িয়ে পড়লো তৃণভূমিতে, খুঁজছে। টর্চের আলোয় মাটিতে পোড়া দাগ পাওয়া গেল। সবুজ ঘাস তো জ্বলেছেই, মাটিও পুড়েছে ভালোমতো। চূড়ার কাছে যেখানে নীল আগুন দেখা গিয়েছিলো, সেখানকার ডাঁটাজাতীয় কিছু উদ্ভিদ, ওগুলোর আগা পুড়ে গেছে, গোড়াটা আছে অবশিষ্ট। ব্যস, আর কিছু নেই। না না, আরেকটা জিনিস খুঁজে পেলো সান, চূড়ার নিচে। মানুষের হাতের সমান। মসৃণ, রূপালি–ধূসর ধাতু দিয়ে তৈরি। মাঝখানে কব্জা। দু'পাশের দুই প্রান্তে কাঁটার সারি, ভেতর দিকে বাঁকানো।

'কোনো ধরনের ক্ল্যাম্প,' বললো সান। 'হ্যানস, দেখোতো, চেনো নাকি?'

ফোরম্যানের হাত থেকে নিয়ে জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখলো কাপলিং। 'বুঝতে পারছি না। কোনো মেশিন থেকে খসে পড়লো না তো?'

'এয়ার ক্র্যাফট?'

'হতে পারে। ধাতুটা কোনো ধরনের অ্যালয়। কী, বলতে পারবো না। ইস্পাত নয়। অনেকটা দস্তার মতো লাগছে। তেলের চিহ্ন নেই। দেখো, এরকম করে বন্ধ করলে কাঁটাগুলো দাঁতে দাঁতে লেগে যায়। সুইচ–টুইচ হতে পারে। এরকম জিনিস জীবনে দেখিনি।'

তৃণভূমিতে চোখ বোলালেন কুপার, জ্বলন্ত চোখে তাকালেন চূড়াটার দিকে। সেদিকে চেয়ে থেকেই বললেন, 'জীবনে দেখনি, না?'

মাথা নাড়লো শুধু কাপলিং।

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা। সবাই একই কথা ভাবছেঃ পোড়া মাটি আর ঘাস, ধোঁয়ার মেঘ, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অদ্ভুত একটা যান। ডা পঞ্চোর চুল পোড়া। চেহারা উদভ্রান্ত।

'কেউ ছিলো এখানে,' অবশেষে বললো কাপলিং। ওর প্রায় চৌকোণা, ভোঁতা নাকওয়ালা চেহারাটা থমথমে। 'কেউ এসেছিলো...এসেছিলো, এবং রোজারকে কিছু করেছে। তারপর চলে গেছে। কিন্তু কোথেকে এলো? কোথায় গেল? ওরা কারা?'

কেউ জবাব দিতে পারলো না।

ওদের মাথার ওপরে একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে ভেসে এলো নিঃসঙ্গ কয়োটের ডাক। লম্বিত, কাঁপা কাঁপা।

গায়ে কাঁটা দিলো মুসার। মনের পর্দায় ভাসছে ফ্লাইং সসারের ছবি। ভাবছে, সত্যি কি এখানে নেমেছিলো ভিনগ্রহবাসীরা? আশেপাশে কোথাও কি লুকিয়ে রয়েছে এখন?

আট

ট্রাকে করে বয়ে আনা হলো রোজার ডা পঞ্চোকে। তার কটেজে এনে শোয়ানো হলো। দেখতে গেল জেনি এজটার আর মিসেস কুপার।

পঞ্চোকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন মিসেস কুপার। চোখের পাতা টেনে ছোট একটা টর্চের আলো ফেলে দেখলেন। ধারণা করলেন, প্রবল উত্তেজনার ফলে এ-অবস্থা হয়েছে লোকটার।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ান।

'এমনভাবে দেখলেন মিসেস কুপার,' রবিন বললো, 'যেন মেডিক্যাল ট্রেনিং আছে তাঁর।'

রান্নাঘরে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। খানিক দূরে বসে বিকৃত আঙুলটা ডলছে জোয়ান মারটিংগেল। অস্বস্তিতে ভুগছে।

'নার্সের ট্রেনিং আছে তাঁর,' জোয়ান জানালো। 'প্রতি হপ্তায় একবার করে শহরের হাসপাতালে গিয়ে ভল্যান্টিয়ারের কাজ করে আসেন, এখনও। ওই খেপাটে লোকটাকে বিয়ে করেই শেষ হয়েছেন। নইলে ভাল নার্স হতে পারতেন।'

গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো।

উঠে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। গেটের কাছে গিয়েছিলেন কুপার। লেফটেন্যান্টকে বলার জন্যে, যে তাঁর একজন পশুপালক অজ্ঞাত কারণে আহত হয়েছে। খবরটা যেন ক্যাম্প রবার্টসে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মরটন।

ফিরে এসেছেন মিস্টার কুপার। তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন মিসেস কুপার। 'কি হয়েছে?'

নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করলেন কুপার। 'আর কি? গাধাটা বললো, ফিল্ড টেলিফোন আছে তার। কিন্তু অন্যান্য টেলিফোনের মতোই খারাপ। কাজ করে না।'

'তা-তো করবেই না,' নিশ্চিন্ত হলেন যেন মিসেস কুপার। 'আমাদের বায়ুমণ্ডলে রয়েছে এখন উদ্ধারকারীরা। স্পেসশিপে। বৈদ্যুতিক গোলমাল তো ঘটবেই।

ইলেকট্রিক ফিল্ড নষ্ট হয়ে গেছে।'

'মাথামোটা মেয়েমানুষ!' খেঁকিয়ে উঠলেন কুপার। 'ইলেকট্রিক ফিল্ড কাকে বলে, সেটা জানো?'

'না, জানি না। তবে এটুকু জানি, স্পেসশিপ এলে সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায়, কিংবা উল্টোপাল্টা কাজ করে। মোটরগাড়ির এঞ্জিনও বন্ধ হয়ে যায়।'

'তোমার মাথা হয়ে যায়। আমাদের গাড়িগুলো চলছে কিভাবে তাহলে?'

'হয়তো বেশি কাছে আসেনি। এলে দেখবে, বন্ধ হয়ে গেছে,' শান্তকণ্ঠে স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন মিসেস।

'সেটা কখন আসবে?'

'আসার আগে জানাবে। জানিয়েই আসবে ওরা,' ঘুরে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন মিসেস কুপার।

বিড়বিড় করে কি বললেন মিস্টার কুপার, তিনিই জানেন। তারপর স্ত্রীকে অনুসরণ করলেন।

'পাগল!' বললো কিশোরের পাশে দাঁড়ানো জোয়ান। ফিরে গিয়ে বসলো তার আগের জায়গায়। 'কি করে যে সহ্য করেন মিসেস কুপার, জানি না। সুস্থ মানুষকে একরাতে পাগল করে দিতে পারে উন্মাদটা। মিসেস যদি বলেন এটা কালো, কালো হলেও সেটাকে শাদা বলবে বুড়োটা । তবে আজ রাতে মিসেসই জিতলেন। তাঁর ধারণা ছিলো, উদ্ধারকারীরা এসেছে। আর বুড়োর ধারণা, কম্যুনিস্ট আর টেররিস্টদের কাজ। ফ্লাইং সসারটা সমাধান করে দিয়ে গেল। মিসেসের কথাই ঠিক হলো।'

'আপনারও কি তাই মনে হয়?' বললো কিশোর। 'সত্যি কি বিশ্বাস করেন, ভিনগ্রহ থেকে ওরা এসেছে?'

অন্য দিকে চোখ ফেরালো জোয়ান। 'তাছাড়া আর কি?' হঠাৎ উঠে গিয়ে তাক থেকে মোম আর মোমদানী পেড়ে আনলো। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এগুলো নিয়ে যাও। শুয়ে পড়োগে।' একটা হ্যারিকেন হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে তাকে ওপরে উঠে যেতে শুনলো ছেলেরা। তার পরপরই উঠে গেল জেনি এজটার।

ব্যানার, সান আর কাপলিংও র‍্যাঞ্চহাউসেই থাকে। খানিক পরে তাদেরও সাড়া পাওয়া গেল—কোথাও গিয়েছিলো, ফিরে এসেছে।

বোরিস আর তিন গোয়েন্দাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিলো ব্যানার। বাড়ির সামনের দিকে বড় একটা ব্যাংকরুম। ঘোষণা দিলো বোরিসঃ শোয়ার কোনো অর্থ নেই, দু'চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারবে না। কিন্তু বিছানায় শোয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার জোরালো নাসিকাগর্জন শোনা গেল।

ছেলেরাও শুয়ে আছে বিছানায়। একটা মোম গলে গলে শেষ হলো। অন্ধকার। ওদের চোখে ঘুম নেই। কান পেতে শুনছে নানারকম শব্দ। কাছেই অস্থিরভাবে বিছানায় বার বার পাশ ফিরছে কেউ। পায়চারি করছে কে যেন। সব শোনা যাচ্ছে অন্ধকার নীরবতার মধ্যে।

ভোরের অন্ধকার কাটার আগেই ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। আর ঘুমাতে পারলো না। গতদিনের সমস্ত ঘটনা এক এক করে ভেসে উঠতে লাগলো মনের পর্দায়। শেষে, আর শুয়ে থাকতে ভালো না লাগায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানালার ধারে।

চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকার, স্তব্ধ নীরবতা র‍্যাঞ্চ এলাকায়। কারও সাড়া নেই, কোনো নড়াচড়া নেই। ঠিক ক'টা বাজে আন্দাজ করতে পারলো না কিশোর, তবে তার মনে হলো, ভোরের বেশি বাকি নেই।

বিছানায় ফিরে এসে কাপড় পরে নিলো। পা টিপে টিপে এগোলো মুসার বিছানার দিকে। নিঃশব্দে তাকে জাগালো। রবিনকেও। ওরাও কাপড় পরে নিতে লাগলো।

মিনিট কয়েক পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সিঁড়ি বেয়ে নামলো। তারার ম্লান আলোয় পথ দেখে এগোলো। আগে আগে চলেছে কিশোর, পেছনে অন্য দু'জন। শ্রমিকদের কটেজ পেরিয়ে, পার্কিং এরিয়ার ছাউনির কাছে এসে পড়লো। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসে দাঁড়ালো একটা গাছের নিচে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। আনমনে বললো, 'প্রেসিডেন্টের গলা নকল করা কি খুব কঠিন? আর মেরিন ব্যাণ্ডের বাজনা, হেইল টু দা চীফ ক্যাসেটে রেকর্ড করে নিতে পারে যে কেউ।'

'ব্যাপারটা ধাপ্পাবাজি মনে হচ্ছে?' রবিন বললো।

'জানি না। তবে বিখ্যাত একটা রেডিও ব্রডকাস্টের কথা মনে পড়ছে। অরসন ওয়েলস।' গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে গলা পরিষ্কার করলো কিশোর। ১৯৩০ সালে ঘটেছিলো ঘটনাটা। টেলিভিশন চালু হয়নি তখন। রেডিও তখন দারুণ জনপ্রিয়। সে-বছর এক দুর্যোগের রাতে প্রচার করা হলো একটা নাটক, এইচ জি ওয়েলসের বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী "ওঅর অভ দা ওয়ার্ল্ডস"-এর নাট্যরূপ। নাটকটা তৈরি করেছিলেন অরসন ওয়েলস। জানো তোমরা গল্পটা। ভিনগ্রহ থেকে আসা কিছু অতিবুদ্ধিমান প্রাণীর পৃথিবী দখলের চেষ্টার কাহিনী। নাটকের শুরুতেই ঘোষক ঘোষণা করে দিলো, এটা নিছকই একটা নাটক। কেউ যেন ভয় না পায়, বা অন্য কিছু মনে করে না বসে।

'শুরু হলো নাটক। এতো জীবন্ত হয়েছিলো নাটকটা, অনেক শ্রোতাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। যারা ঘোষণা শোনেনি তাদের অনেকেই মনে করেছিলো, ব্যাপারটা সত্যি। মঙ্গল গ্রহের ভয়াবহ দানবদের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছিলো তারা।

নিউ জারসির হাজার হাজার মানুষ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালিয়েছিলা শহর ছেড়ে।

'তাহলে ধরো, আমরা আজ যে ব্রডকাস্ট শুনতে পেলাম সেটা ওয়াশিংটন থেকে তো না–ও আসতে পারে? এমনও হতে পারে, ওটা প্রেসিডেন্টের গলাই নয়। হতে পারে, কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে প্রচার করা হয়েছে ওটা।' কাছাকাছি বলতে, হাত তুলে পাহাড়ের চূড়াটা দেখালো কিশোর।

'বেশ,' রবিন বললো, 'ধরলাম, চূড়ার কোথাও একটা ট্র্যান্সমিটার বসানো হয়েছে। নানারকম নয়েজ সৃষ্টি করে রেডিওর স্বাভাবিক ওয়েভলেংথ জ্যাম করে দিচ্ছে। ভুয়া একটা বক্তৃতাও নাহয় প্রচার করেছে। কিন্তু মিলিটারি…'

'ওরাও মেকি হতে পারে। ওই লেফটেন্যান্টটা এতো বেশি আর্মি আর্মি ভাব করছিলো, ওর সবকিছুতে এতো বেশি চকচকে পালিশ, আসল আর্মির মতো লাগে না।'

'হতে পারে, নতুন ঢুকেছে। শুনেছি, নতুন নতুন ঢুকলে ওরকমই করে অনেক অফিসার।'

'আচ্ছা, নাহয় মেকিই হলো,' বললো মুসা। 'ধরলাম, পুরো ব্যাপারটাই দাপ্পাবাজি। কিন্তু কেন? এতো কষ্ট কেন করতে যাবে? পাহাড়ের চূড়ার ওই নীল আগুন, অদ্ভুত। ওভাবে ওরকম একটা জায়গায় আগুন জ্বালানো সোজা কথা না, তা–ও আবার নীল রঙের। আর স্পেসশিপটাকে তো সবাই দেখলাম। তাছাড়া ওই মেষপালক, ওর চুল পুড়লো কি করে? ক্ল্যাম্পের মতো ওই আজব বস্তুটাই বা কি?'

'সবই বুঝলাম। সবই নিখুঁতভাবে সাজিয়েছে, হয়তো। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। মুসা, তুমি তো সিনেমার ছবি তৈরি সম্পর্কে অনেক কিছু জানো। ধরো, একটা সাইন্স ফিকশন তৈরি করা হবে। রাতে যা যা ঘটলো, ওরকমভাবে সেট সাজানো যায় না?'

'ন্–না। আমার মনে হয় না।'

তর্ক করলো না কিশোর। 'জানার একটাই উপায়। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। কাছের শহরটায় গিয়ে দেখতে হবে কি ঘটছে।'

'তারমানে পাহাড় ডিঙাতে হবে, এই তো?' রবিন বললো। 'বেশ, চলো।'

'মারছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। 'আবার ওই বাঁধের কাছে? যদি কেউ…মানে, সত্যি সত্যি কিছু থাকে?'

'কাল রাতেও এ–কথাই বলেছিলে,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর। 'কিন্তু "কিছুকে" পাওয়া যায়নি। আর এতো ভয় পাচ্ছো কেন? রাত শেষ। দিনের বেলা ভয় নেই।'

ভোরের অপেক্ষায় রইলো ওরা।

ফ্যাকাসে হতে শুরু করলো অন্ধকার।

বাঁধের দিকে রওনা হলো ওরা, দ্রুত পায়ে। চষা খেত পেরিয়ে তৃণভূমির ধারে পৌঁছলো, এই সময় চোখে পড়লো কুয়াশা। বাঁধ থেকে উঠছে হালকা ধোঁয়ার মতো।

এগিয়ে চললো ওরা। ভেড়াগুলোকে পাশ কাটালো। আগের বারের মতো মাঝখান দিয়ে গিয়ে ভয় পাইয়ে দিলো না, তাহলে ব্যা—ব্যা করে উঠবে।

বাঁধের গোড়ায় এসে থামলো। বুকের ভেতর দুরুদুরু করছে তিনজনেরই। চোখে ভাসছে রোজার ডা পঞ্চোর আহত হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্যটা। মাটি পোড়া। চুল পোড়া।

বাঁধের পাশের টিলাটক্কর আর ঝোপকে পাশ কাটিয়ে উঠতে শুরু করলো ওরা। ওপরে উঠে, বাঁধকে একপাশে রেখে এগোতে লাগলো। কুয়াশার ভেতর দিয়ে চলেছে এখন। আসতে ভয় পাচ্ছিলো যে মুসা আমান, সে-ই এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো সে।

পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে হালকা-পাতলা একটা শরীর, দেহের তুলনায় মাথা বড় লাগছে। পরনে চকচকে সুট, সাদা মতো—কি দিয়ে তৈরি কে জানে। কুয়াশার মাঝে সামান্য আলোতেও চমকাচ্ছে। মাথায় হেলমেট, মাহাকাশচারীরা যেমন পরে অনেকটা তেমনি।

আবার চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

কিশোর দেখলো, জীবটার একটা হাত উঠে এসে আঘাত করলো মুসাকে।

ঠিক ওই মুহূর্তে, কিশোরের গলা জড়িয়ে ধরলো কিসে যেন। চাপে পড়ে মুখ ওপরের দিকে তুলে ফেলতে বাধ্য হলো সে। চোখে পড়লো ধূসর আকাশ; আর ভোরের নিবু নিবু তারা। আচমকা তীব্র ব্যথা লাগলো ঘাড়ে। চোখের সামনে কালো হয়ে গেল ফ্যাকাসে আলো, দপ করে নিভে গেল তারাগুলো।

নয়

আবার চোখ মেললো কিশোর। দেখলো, মাথার ওপরে আকাশ নীল। কুয়াশা অদৃশ্য। পাশে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে বোরিস।

'কিশোর, ঠিক আছো তো তুমি?' বোরিসের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'হোকে?'

গুঙিয়ে উঠলো কিশোর। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছুটে চলে গেল যেন ডান কাঁধ থেকে কানের কাছে। মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলো কোনোমতে।

কাছেই, মুসাকে উঠে বসতে সাহায্য করছে ব্যানার। রবিনের সংগে মোলায়েম গলায় কথা বলছে কাপলিং। হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে প্রায় গোল হয়ে বসে আছে রবিন।

'খুঁজে পেলেন কি করে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

হাসি ফুটলো বোরিসের মুখে। 'সহজেই। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম তোমরা নেই। ভাবলাম, আমি কিশোর পাশা হলে কোথায় যেতাম? যেখানে রহস্য আর উত্তেজনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেকে তুললাম এমাদের।' তিনজনকে দেখালো সে।

পেছনে ফিরে সানকে দেখতে পেলো কিশোর।

'কি হয়েছিলো?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো ফোরম্যান।

'স্পেসসুট পরা একটা লোক। মুসাকে আঘাত করতে দেখলাম।'

'যাহ্, কি বলছো!'

'হ্যাঁ।' মাথার একপাশ ছুঁয়ে ককিয়ে উঠলো মুসা। 'কষে লাগিয়েছে।'

নিজের ঘাড়ে হাত বোলালো কিশোর। 'আরেকজন এলো আমার পেছন থেকে। গলা জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলো, বেহুঁশ হয়ে গেলাম।'

'নিশ্চয় তিনজন ছিলো,' রবিন বললো। 'আমাকে ধরলো একজন। গায়ে ঘোড়ার গায়ের মতো গন্ধ।'

'কী!' মিস্টার কুপারের কণ্ঠ শোনা গেল, তৃণভূমিতে উঠে আসছেন। 'কিসের গায়ে ঘোড়ার মতো গন্ধ? ড্যাম, কি হচ্ছে এখানে?'

'চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়েছিলো ছেলেগুলো,' জানালো সান। 'এখানে চলে এসেছিলো। এসে মার খেলো কাদের হাতে কে জানে। বলছে, স্পেসসুট নাকি পরা ছিলো। রবিন বলছে, একজনের গায়ে নাকি ঘোড়ার গায়ের গন্ধ।'

'আরে দূর! যত্তোসব!' এগিয়ে এলেন মিস্টার কুপার। 'স্পেসম্যানের গায়ে ঘোড়ার গন্ধ আসবে কোত্থেকে? ড্যাম, ট্রাক নিয়ে এসেছি আমি। ছেলেগুলোকে ধরে ধরে নামাও।'

দশ মিনিট পর, বাংকহাউসে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। যার যার বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো।

দেখতে এলো জেনি আর জোয়ান।

'কপাল ভালো তোমাদের,' শুকনো গলায় বললো জেনি। 'কাল রাতে মরতে মরতে বাঁচলো রোজার, আজ সকালে তোমরা। আর যেও না ওদিকে। কোনো কারণে খারাপ হয়ে উঠেছে জায়গাটা।'

ওরা দু'জন বেরিয়ে গেলে কিশোর বললো, 'জেনির গায়ে ঘোড়ার গন্ধ ছিলো কাল। আজ নেই।'

'তুমি কি ভাবছো ও-ই আমাকে ধরেছিলো?' রবিনের প্রশ্ন।

হাত নাড়লো কিশোর। 'কে জানে? হতে পারে। তবে আমাদের আক্রমণকারীরা পৃথিবীর মানুষ, এটা ঠিক। আরেক গ্রহ থেকে এসে ঘোড়ায় চড়বে কেউ, এটা ভাবতে পারছি না।'

ছাতের দিকে তাকিয়ে বললো রবিন, 'তাতে সন্দেহের মাত্রা কমছে না। ড্যাম সান, যেহেতু র‍্যাঞ্চে কাজ করে অনেক বছর ধরে, নিশ্চয় ঘোড়ায় চড়ে। জেনি তো ধরতে গেলে নিজেই ঘোড়া হয়ে গেছে। নিশ্চয় ব্যানার আর কাপলিংও ঘোড়ায় চড়ে। শ্রমিকদের কেউ কেউ চড়তে পারে। ওদের সম্পর্কে তো কিছুই জানি না আমরা।'

'কাদের সম্পর্কে কিছু জানো না?' দরজা থেকে বললেন মিসেস কুপার। নিঃশব্দে উঠে এসেছেন সিঁড়ি বেয়ে।

হেসে ঢুকলেন ঘরের ভেতরে। 'আমার স্বামী তো খুব দুশ্চিন্তা করছে। বললো···উদ্ধারকারীরা নাকি হামলা চালিয়েছিলো তোমাদের ওপর।'

'তিনজন হামলা চালিয়েছিলো আমাদের ওপর,' জবাব দিলো কিশোর। 'ওদের একজনের পরনে স্পেসসুট দেখেছি।'

কিশোরের বিছানার কিনারে বসলেন মিসেস কুপার। হাতে খুদে একটা টর্চ। সেটা দিয়ে, এবং আরও নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করে বললেন, 'তুমি ঠিকই আছো।'

এরপর মুসাকে পরীক্ষা করতে গেলেন। 'তা তোমরা ওখানে গিয়েছিলে কেন?'

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম আমরা,' কিশোর বললো। 'সব চেয়ে কাছের শহরটায় কি হচ্ছে দেখার জন্যে। মিসেস কুপার, উদ্ধারকারীরা আসবেই এ-ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস কিন্তু খুব গভীর। একথা র‍্যাঞ্চো কুপারের আর কেউ জানে?'

'আমার তো মনে হয় এখানকার সবাই জানে। তবে আমি শিওর না। কাল রাতে উদ্ধারকারীরা এসেছিলো, এটাও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'পারছেন না?'

মাথা নাড়লেন মহিলা। মুসাকে দেখা শেষ করে গিয়ে রবিনের পাশে বসলেন। 'রাতে যেটা দেখলাম, ফ্লাইং সসারের মতোই লাগলো অবশ্য। কিন্তু তোমাদের ওপর হামলা চালালো কেন? উদ্ধারকারীরা তো আসবে উদ্ধার করতে, মারার জন্যে নয়। ওরা তো আসবে আমাদের সাহায্য করতে।'

'ঠিক বলেছেন।'

'অথচ আমার স্বামী কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না, যে ওরা আসবে। গতরাতে সসারটাকে দেখে আর ঘুমাতে যায়নি। সসার আর ভিনগ্রহবাসীদের ওপর যতো বই পেয়েছে, সব বসে বসে ঘেঁটেছে। অনেক পড়েছে। সকালে মনে হলো বিশ্বাস করি করি একটা ভাব এসেছে তার মধ্যে।'

'তাহলে তো ভালোই।'

'কিন্তু এভাবে যদি হামলা চলতে থাকে, তাহলে যাবে আবার বিগড়ে। আমার বিশ্বাস হয় না ওরা উদ্ধারকারী।'

'আমারও না,' বললো কিশোর।

'আমার কি মনে হয় জানো?' মলিন হাসি হাসলেন মিসেস কুপার। 'কেউ আমাদেরকে নিয়ে মজা করছে। সব সাজানো ব্যাপার। এই সন্দেহের কথা সকালে বার্টকে বললাম।' সে তো চটে লাল। তর্ক শুরু করে দিলো আমার সংগে, ভিনগ্রহ-বাসীরাই এসেছে।'

'আচ্ছা, মিসেস কুপার,' উঠে বসলো কিশোর। 'এখানে আপনাদের কর্মচারীদের কথা কিছু বলবেন?'

অবাক মনে হলো মিসেস কুপারকে। 'পুলিশের মতো কথা বলছো?'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিলো কিশোর।

পড়ে মাথা নাড়লেন মহিলা। 'হুঁ। গোয়েন্দা।' মুখ তুললেন। 'আচ্ছা, এক কাজ করো না। আমাকে তোমাদের মক্কেল করে নাও। যা ফিস, দেবো।'

হেসে বললো কিশোর, 'ফিস লাগবে না। নিজের আগ্রহেই কাজ করি আমরা। যান, করে নিলাম আপনাকে আমাদের মক্কেল। এখন স্টাফদের কথা কিছু বলুন। ড্যান সানকে দিয়েই শুরু করুন।'

'বেশ।' কিশোরের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে এসে বসলেন তিনি। 'টেক্সাসের এক র‍্যাঞ্চে গিয়ে দেখা হয়েছে ওর সংগে। ওর কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বার্ট। ভালো অফার দিলো। রাজি হয়ে গেল সান।

'হ্যারি ব্যানার ডেভিসের ইউনিভারসিটি অভ ক্যালিফোরনিয়ার গ্র্যাজুয়েট। ছ'বছর আগে পাশ করে বেরিয়ে ওয়েস্ট কোস্ট সাইট্রাসে কাজ করছিলো। ভালো রেকর্ড।

'হ্যানস কাপলিঙের নিজের গ্যারেজ ছিলো ইনডিওতে। ওপথে যাওয়ার সময় আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। ওর গ্যারেজে গাড়ির কাজ করিয়ে বার্ট তো মহাখুশি। হ্যানসকে তুলে নিয়ে এলো ওখান থেকে।

'ওর রেকর্ড কেমন?' জানতে চাইলো কিশোর।

'ভালো। তবে জোয়ানের রেকর্ড ভালো না। দোকানের টাকা বাকি পড়লে দিতে চাইতো না। কয়েকবার ব্যাংকে টাকার টান পড়েছে। চেক ক্যাশ হয়নি। ওর একটা ছোট ভাই আছে, ওকে টাকা পাঠাতে হতো। বোঝা যায়, সেজন্যেই টাকার টানাটানি লেগে থাকতো। সগার্স-এর ছোট একটা রেস্টুরেন্টে বাবুর্চির কাজ করতো। বেতনের টাকা থেকে অনেক কষ্টে কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে ওই শহরেই তার ভাইকে একটা ছোট রেডিওর দোকান করে দিয়েছে। রাঁধে খুব ভালো, তাই বার্ট নিয়ে নিয়েছে ওকে।'

'জেনি এজটার?'

'সানল্যাণ্ডে এক আস্তাবলে চাকরি করতো। সান্টা মারিয়ায় তার এক বন্ধু থাকে। ওর মুখে র‍্যাঞ্চো কুপারের নাম শুনে এসে বার্টের সংগে দেখা করে চাকরি চায়।

খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেল জেনির রেকর্ড খুব ভালো। ওর বাবা চাকরি করে একটা সেভিংস অ্যাণ্ড লোন কোম্পানিতে, ওখানেও খোঁজ নেয়ালো বার্ট। ওরাও ভালোই বললো।'

'কটেজে আর সব শ্রমিকেরা যে থাকে, তারা কেমন?'

'ওদের অনেকেই এখানকার লোক। আগে থেকেই এই র‍্যাঞ্চে চাকরি করতো। কয়েকজন তো জন্মেছেই এই র‍্যাঞ্চে। অন্যদেরকেও অনেক দেখেশুনে খোঁজখবর নিয়ে তারপর কাজ দিয়েছে বার্ট।'

উঠে দাঁড়ালেন মিসেস কুপার। 'আমার মনে হয় না, এখানকার কেউ ওসব শয়তানীতে জড়িত। তাতে লাভ কিছু নেই ওদের। বরং সবদিক থেকেই ক্ষতি।'

'আপনার স্বামী ধনী লোক। হয়তো ডাকাতি করার প্ল্যান করেছে কেউ।'

'কি ডাকাতি করবে? বেশি দামী কিছুই নেই এখানে। দামী কিছু রাখিই না আমরা। এমনকি ক্যাশ টাকাও না। টাকা ব্যাংকেই রাখে বার্ট, প্রয়োজনের বেশি তোলে না। সান্টা বারবারার প্যাসিফিক কোস্ট ন্যাশনাল ব্যাংকে তার একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। একটা সেফ ডেপোজিট বক্সও আছে। আমার গহনা আর বার্টের সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র সব ওই বক্সে রাখা হয়।'

'আর কিছুই নেই এখানে? এমন কিছু, আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে? হয়তো আপনার নজরই পড়েনি ওগুলোর দিকে। কিংবা এমনও হতে পারে, আপনার স্বামীকে ফাঁদে ফেলে কেউ কিছু আদায় করে নিতে চায়?'

'এটা হতে পারে।'

'ফ্লাইং সসারের ব্যাপারটা ধাপ্পাবাজী হলে, তার পেছনে জোরালো কোনো কারণ থাকবে। থাকতেই হবে।'

আবার বসে পড়লেন মিসেস কুপার। ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছি না কি আছে এখানে। কিছুই নেই। ইচ্ছে হলে তুমি নিজে খুঁজে...' থেমে গেলেন। কিশোরের দিকে চেয়ে আবার কি ভাবলেন। 'হ্যাঁ, খুঁজে দেখতে পারো।'

'কোথায়, মিসেস কুপার?'

আমাদের ঘরে, আমাদের বাড়িতে। যেখানে খুশি তোমার, খুঁজতে পারো। যা কিছু আছে, সব দেখাতে পারি। লাঞ্চের পরে জেনি চলে যায় নিজের ঘরে, ঘুম দিতে। বার্ট ঘোড়া নিয়ে বেরোয়, ঘুরে ঘুরে দেখে র‍্যাঞ্চে কাজকর্ম কেমন চলছে—এটা তার নিয়মিত কাজ। ওই সময় আসতে পারো তুমি। কিছু বের করতে পারলে তো ভালো কথা।'

'ভালো প্রস্তাব,' বললো কিশোর।

'তবে বার্ট শুনলে রাজি হবে না।'

'তাঁকে না জানালেই হলো।'

'হ্যাঁ, জানানো চলবে না।'

হাসলো কিশোর। 'আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, মিসেস কুপার।'

'হ্যাঁ। বুঝতে পারছি।'

মিসেস কুপার বেরিয়ে গেলে বালিশে হেলান দিলো কিশোর। চিমটি কাটতে শুরু করলো নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

হেসে জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'শার্লক হোমস, কি ভাবছো? এই কিশোর?'

'কয়েকটা উদ্ভট সম্ভাবনার কথা।'

'যেমন?' জানতে চাইলো রবিন।

'যেমন, কারো কোনো শয়তানী মতলব আছে, তাই বাইরের দুনিয়া থেকে র‍্যাঞ্চো কুপারকে আলাদা করে দিয়েছে। হয়তো ব্ল্যাকমেল করতে চায়। কিংবা অন্য কোনো কায়দায় টাকা আদায় করে নিতে চায়। কিংবা শত্রুতার জের হিসেবে হয়তো নিছক প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে মিস্টার কুপারের ওপর। এখানে বন্দি করে কষ্ট দিতে চায়। আর এর কোনোটাই যদি না হয়...'

'তাহলে কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'তাহলে বুঝতে হবে, সত্যিই মহাকাশের কোনো ব্যাপার। অন্য কোনো গ্রহের প্রাণী নেমেছে আমাদের পৃথিবীতে। কোনো উদ্দেশ্য আছে তাদের।'

দশ

র‍্যাঞ্চহাউসের রান্নাঘরে লম্বা টেবিলে বসে দুপুরের খাওয়া সারছে তিন গোয়েন্দা। ওদের সংগেই বসেছে ড্যাম সান, জোয়ান মারটিংগেল আর মিস্টার কুপারের অন্যান্য কর্মচারীরা। সবাই নীরব। যার যার মতো ভাবছে। এতো নীরবতা, যে রেফ্রিজা-রেটরের মোটর চালু হওয়ার শব্দেই চমকে উঠলো রবিন।

'কারেন্ট এলো?' মুসা বললো।

'জেনারেটর চালানোর ব্যবস্থা করে এসেছিলাম,' জানালো কাপলিং।

'ও, হ্যাঁ, জেনারেটরের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

মুসার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজলো সান। আরেকটা কথা ভুলো না, মিস্টার কুপার কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন তোমরা যাতে আর তৃণভূমির দিকে যেতে না পারো। দু'জন গার্ড পাঠানো হয়েছে ওখানে।'

'মানে?' জোয়ান কথাটা ধরলো। 'ছেলেদের কথা ভেবে তিনি একাজ করেছেন? নাকি ভাবছেন, ভিনগ্রহবাসীরা আবার আসবে ওখানে?'

'হয়তো দু'টোই। ভিনগ্রহবাসীরা তাদের লোক ফেলে গেলে সসার নিয়ে আবার

আসবেই। তুলে নেয়ার জন্যে নামবে।'

'যারা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদেরকে?' কিশোরের প্রশ্ন।

ভ্রূকুটি করলো সান। 'এই একটা কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। স্পেসসুট। ও ব্যাটা আর তার সঙ্গীরা কোথায় লুকালো?'

'হয়তো চূড়ার ওধারে।'

'কি জানি,' চুপ হয়ে গেল সান।

নীরবে খাওয়া চললো আবার।

খাওয়া শেষ হলে বেরিয়ে চলে এলো তিন গোয়েন্দা। পেছনের সিঁড়ির ধারে বসলো। এই সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আস্তাবলের দিকে রওনা হলেন মিস্টার কুপার। ছেলেদের দেখে দাঁড়ালেন। 'আর যাবে না ওদিকে। আবার যদি যাও, ধরে এনে ঘরে তালা দিয়ে রাখবো।'

'যাবো না, স্যার,' জবাব দিলো কিশোর।

চলে গেলেন মিস্টার কুপার। একটু পরেই জেনি বেরোলো ঘর থেকে। ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসলো, চলে গেল তার কটেজের দিকে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কিশোর। তারপর উঠে দাঁড়ালো। দুই সহকারীকে সংগে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো বড় বাড়িটার দিকে।

বারান্দায় বসে আছেন মিসেস কুপার। লোহার তৈরি, সাদা রঙ করা কয়েকটা চেয়ার–টেবিল আছে ওখানে। কোলের উপর তাঁর হাত, চোখে উত্তেজনা।

ছেলেরা আগেই আলোচনা করে ঠিক করে নিয়েছে, শুধু কিশোর খুঁজবে বাড়িটায়। রবিন আর মুসা যাবে গেটের কাছে, সৈন্যদের ভাবগতিক লক্ষ্য করতে।

'যাও,' বন্ধুদের বললো কিশোর। 'বেড়ার কাছে লুকিয়ে থেকে চোখ রাখবে।'

'আচ্ছা,' ঘাড় কাত করলো মুসা।

সামনের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠলো কিশোর। তাকে নিয়ে হলে ঢুকলেন মিসেস কুপার। দরজাটা বন্ধ করে দিলো কিশোর। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো সিঁড়ির ধারে বসানো গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়িটার টিকটিক শব্দ।

'কোত্থেকে শুরু করবে?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস কুপার।

এখান থেকেই। চমৎকার তুর্কী কার্পেটটা দেখলো কিশোর। নজর ফেরালো মখমলে মোড়া গদিওয়ালা চেয়ার আর সোফার দিকে। এগুলো নিতে আসবে না চোর। ঘুরে, হেঁটে এসে মিউজিক রুমে ঢুকলো সে। একটা বেবি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো, কয়েকটা চেয়ার, কয়েকটা কেবিনেট—সেগুলোতে ঠাসা শুধু স্বরলিপির পাতা, আর আছে বাচ্চাদের আঁকা কিছু ছবি।

'আমার ছেলেরা এঁকেছে,' মিসেস কুপার বললেন, 'প্রাইমারি স্কুলে থাকতে। খুব

সুন্দর হয়েছে, না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো বটে কিশোর, মনে মনে হাসলো। কিছুই হয়নি। কেবিনেটগুলো আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো সে। স্বরলিপি, ছবি আর কয়েকটা বই ছাড়া কিছু নেই। ওগুলো আবার জায়গামতো ভরে রেখে খাবার ঘরে এলো। দেয়ালের তাকে রূপার কিছু তৈজসপত্র।

'রূপার দাম আছে,' বললো সে। 'কিন্তু এগুলোর জন্যে এতো কাঠখড় পুড়িয়ে চোর আসবে না।'

'আমারও মনে হয় না,' মিসেস কুপার বললেন।

রান্নাঘরে আলমারি আর তাক ভরতি খাবার। টিন আর বয়ামের গায়ে লেবেল লাগানো, তারিখ লেখা। বছরখানেকের বেশি পুরনো একটাও পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরে দেখা শেষ। মাটির তলার ভাঁড়ারে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো কিশোর।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন মিসেস কুপার। চাবি দিয়ে তালা খুলে দরজা খুললেন। কিশোরের সাথে নেমে এলেন ছায়াময়, ধুলোয় ঢাকা একটা ঘরে। শুকনো জ্বালানী কাঠের গাদা আর কয়লার স্তূপ রয়েছে ওখানে।

কয়লার পাশে ফেলে রাখা পুরনো আমলের একটা চুলা।

সিমেন্টের মেঝেতে অসংখ্য বাক্স আর ট্রাঙ্ক একটার ওপর আরেকটা ফেলে রাখা হয়েছে। একপাশের দেয়ালে আরেকটা দরজা। উঁকি দিয়ে দেখলো কিশোর, আরেক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপাশ থেকে। সিঁড়ির মাথায় কাঠের ঢাকনা, দরজার কাজও সারছে, ছাতের কাজও।

ঘরের এক কোণে ঘেরা দেয়া একটা জায়গা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কিশোরের। ধাতব বেড়ার ধাতব দরজা, শক্ত খিল। এগিয়ে গেল সে। মাথা উঁচু করে দেখলো, দেয়ালে বসানো র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো রাইফেল। মেঝেতে গুলি আর বিস্ফোরকের বাক্স। আরেকদিকের দেয়ালেও র‍্যাক আছে, তাতে শটগান আর নানারকম হ্যাণ্ডগান।

'বাপরে বাপ, আস্ত এক অস্ত্রাগার,' বললো কিশোর।

বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন মিসেস কুপার, 'মাস ছয়েক হলো কেনা হয়েছে। বার্টের ধারণা...কোন না কোন সময় ওগুলো আমাদের কাজে লাগবেই।'

'তাই?' বলে বেড়ার কাছ থেকে সরে এলো কিশোর। একটা ট্রাঙ্কের ডালা তুললো। খালি। অন্য ট্রাঙ্ক আর বাক্স যতগুলো সম্ভব, দেখলো। সব খালি।

'কিছুই নেই,' অবশেষে বললো সে।

'না। এখানে খুব একটা আসা পড়ে না আমাদের।'

রান্নাঘরে ফিরে এলো দু'জনে। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো,

আগে আগে রয়েছেন মিসেস কুপার।

সিঁড়ির কাছে চাকরদের ঘর, সবগুলো শূন্য, অব্যবহৃত।

দোতলার ঘরগুলোতে বিরাট বিরাট বিছানা, এতো পুরনো আমলের, অ্যানটিক হিসেবে বিক্রি করা যাবে। দেয়ালের ধার ঘেঁষে তৈরি হয়েছে অসংখ্য দেরাজ, কিছু আছে মার্বেল পাথরে তৈরি, তাতে রঙিন কাঁচের অলঙ্করণ। আলমারির দরজা, দেরাজের ড্রয়ার সব খুলে দিলেন মিসেস কুপার।

'কিছুই নেই, কি আর দেখবে? গহনাও খুব একটা রাখি না এখানে। পরিই না, রাখবো কি। একছড়া মুক্তার মালা, আর এনগেজমেন্ট রিংটা আছে, ব্যস। বাকি সব সেফ ডিপোজিট বক্সে।'

চিলেকোঠা আছে? মূল্যবান কোনো ছবি-টবি? কিংবা এমন কেনো দলিল, যার মূল্য অনেক?'

হাসলেন মিসেস কুপার। 'ছবি আছে, কোনোটাই দামী নয়। কাগজপত্রের কথা বলতে পারবো না, বার্ট জানে। ওসব তার অফিসে'।'

মহিলার পিছু পিছু দক্ষিণ-পূর্ব কোণের আরেকটা ঘরে এলো কিশোর। অফিস ঘর। এটার জিনিসপত্র আরও পুরনো। অনেক পুরনো ডেস্ক। আর্মচেয়ারের গদি চামড়ায় মোড়া। একটা ওক কাঠের সুইভেল চেয়ার আছে, আর আছে কিছু কেবিনেট। ফায়ারপ্লেস আছে। ফায়ারপ্লেসের ওপরে ম্যানটেলে রয়েছে ইস্পাতের ওপর খোদাই করা একটা ফ্যাক্টরি বিল্ডিঙের ছবি।

'কুপার ইন্টারন্যাশনালের ছবি,' বললেন মিসেস কুপার। 'ওটা দিয়েই কুপারদের যাত্রা শুরু।...এঘরে বিশেষ আসি না আমি...' থেমে গেলেন। নিচে থেকে তাঁর নাম ধরে কে যেনি ডাকছে। জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালেন। 'কি হয়েছে?'

'মিসেস কুপার,' বলে উঠলো পথে দাঁড়ানো একটা মহিলা কণ্ঠ, 'ন্যানি গাছ থেকে পড়ে গেছে। হাতে খুব ব্যথা পেয়েছে। একটু আসবেন?'

'এখুনি আসছি।' জানালার পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে এলেন মিসেস কুপার। 'তুমি চালিয়ে যাও,' কিশোরকে বললেন। 'এখানে আমার থাকার দরকার নেই। যাই, মেয়েটাকে দেখে আসি। তুমি কিন্তু বেশি দেরি করো না। বার্ট চলে আসবে।'

'তাড়াতাড়িই করবো।'

বেরিয়ে গেলেন মিসেস কুপার।

পাশের জানালার কাচের ভেতর দিয়ে দেখলো কিশোর, নিচে নেমে একজন মহিলার সংগে তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছেন মিসেস কুপার। সামনের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। নিচে লন, তার পরে লেবুবাগান। নির্জন।

জানালার ধার থেকে আবার ফায়ারপ্লেসের কাছে ফিরে এলো সে। হাতে তুলে

নিলো কুপার ইন্টারন্যাশনালের প্রতিকৃতিটা, হাসলো আপনমনেই।

ছবিটা যেখানে ছিলো, তার নিচে একটা সেফ। পুরনো ধাঁচের পুরনো তালা-চাবির সিসটেম।

মিসেস কুপার কি জানেন এটা এখানে আছে? হয়তো কোন অ্যানটিক স্টোর থেকে কিনে এনেছে মিস্টার কুপার।

হাতল ধরে টানলো কিশোর। সেফের ডালা খুললো না। তালা লাগানো।

টেনে টেনে দেখলো, ডেস্কে তালা লাগানো, কেবিনেটগুলোতে তালা লাগানো।

আর্মচেয়ারে বসে পড়ে ভাবতে শুরু করলো কিশোর। যদি সে আলবার্ট কুপার হতো, তাহলে সেফটায় কি রাখতো? সেফের চাবি কি সবসময় নিজের কাছে রাখতো? নাকি ঘরেই কোথাও ফেলে যেতো? একটা চাবি, নাকি দুটো?

তার মনে হলো, চাবি নিশ্চয় এ-ঘরেই কোথাও লুকানো আছে।

খুঁজতে শরু করলো। চেয়ারের তলায় দেখলো, ডেস্কের তলায় দেখলো। জানালা-দরজার ফ্রেমের ওপরে হাত বুলিয়ে দেখলো। আরও কয়েকটা জায়গা দেখে সব শেষে টান দিলো কার্পেটের কোণ ধরে। খানিকটা তুলতেই চোখে পড়লো, মেঝের খানিকটা জায়গার রঙ একটু অন্যরকম। নখ দিয়ে খোঁচা দিতেই নড়ে উঠলো। ডালাটা তুলতে কষ্ট হলো না। একটা খোপ বেরিয়ে পড়লো, তাতে চাবির রিং।

'চালাকিটা পুরনো,' বিড়বিড় করলো কিশোর। রিংটা তুলে নিলো। মোট তিনটে চাবি। একটা দিয়ে খুলে ফেললো সেফের তালা।

ভেতরে অসংখ্য ছোট ছোট বাক্স। গহনার বাক্স। একটার পর একটা খুলতে লাগলো সে। দামী দামী সব জিনিস। হীরা-চুনি-পান্না বসানো পুরনো আমলের সোনার গহনা। হার, আংটি, ঘড়ি, জামার পিন, ব্রেসলেট···কিশোর অনুমান করলো, এগুলো ছিলো মিস্টার কুপারের মায়ের। পরে স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে মিসেস কুপার পেয়েছেন। কিন্তু তিনি জানেন না এগুলো এখানে আছে।

মিস্টার কুপার জানেন শুধু। শুধু? আর কেউ জানে না? অনেক টাকার জিনিস এখানে। ফ্লাইং সসার দেখাতে যে পরিমাণ খরচ, তাতে এই জিনিস চুরি করে চোরের পোষাবে? মনে হয় না। কিন্তু এগুলো এভাবে এখানে রেখেছেন কেন কুপার? অবিশ্বাস। ব্যাংককেও বিশ্বাস করেন না তিনি। মিসেস কুপারকে বলেছিলেন বটে সেফ ডিপোজিটে রেখেছেন, আসলে রাখেননি। তাঁর একমাত্র বিশ্বাস জমি আর স্বর্ণ!

বাক্সগুলো আগের মতো সাজিয়ে রেখে সেফের তালা লাগিয়ে দিলো কিশোর।

আরেক চাবিতে ডেস্কের তালা খুললো। ডালা তুলেই প্রথমে চোখে পড়লো ক্ল্যাম্পের মতো জিনিসটা, যেটা আগের রাতে তৃণভূমিতে পাওয়া গেছে। হাতে নিয়ে দেখলো একবার কিশোর। রেখে দিলো। চেকবইয়ের অভাব নেই। সুইভেল চেয়ারে

আরাম করে বসে ওগুলো এক এক করে দেখতে লাগলো সে।

অনেক শহরের অনেক ব্যাংকের চেকবই আছে এখানে। মিলওয়াকির 'দা প্রেইরী ব্যাংক', সল্ট লেক সিটির 'দা ডেজার্ট ট্রাস্ট কোম্পানি', নিউ ইয়র্কের 'দা রিভারসাইড ট্রাস্ট কোম্ ..এ', এবং মধ্য ইলিনয়ের 'ন্যাশনাল ব্যাংক অভ স্প্রিংফিল্ড'। প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি চেক ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। বাকি যে অংশটুকু আছে, তাতে লেখা টাকার পরিমাণ দেখে বোঝা গেল, অ্যাকাউন্টে অবশিষ্ট যা ছিলো সব তুলে নেয়া হয়েছে শেষ চেকটা দিয়ে! মাত্র একটা রেখে বাকি যতো অ্যাকাউন্ট ছিলো, সব ক্লোজ করে দিয়েছেন কুপার। যেটা আছে, সেটা সান্টা বারবারার 'সান্টা বারবারা মার্চেন্ট ট্রাস্ট'। অনেকগুলো পাতা ছেঁড়া। শেষ বারে দশ হাজার ডলার তুলেছেন তিনি।

দেখতে দেখতে আনমনে শিস দিয়ে উঠলো কিশোর। লাখ লাখ ডলার রাখা ছিলো ব্যাংকটায়। এককেবারে মোটা অঙ্কের চেক কাটা হয়েছে। র‍্যাঞ্চের যন্ত্রপাতি কিনতে ব্যয় হয়েছে। কয়েকটা তেল কোম্পানিকে চেক দেয়া হয়েছে। মোটর কোম্পানি, নানারকম এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, চাষের যন্ত্রপাতি তৈরি করার কোম্পানি, সিমেন্ট কোম্পানি···বাপরে! এই র‍্যাঞ্চ সাজাতে অনেক টাকা খরচ করেছেন মিস্টার কুপার!

তবে, অস্ত্র কিনতেও মোটা টাকা ব্যয় করেছেন তিনি। বিভিন্ন গান কোম্পানির নাম লেখা রয়েছে। মোট দশটা চেক কাটা হয়েছে ওগুলোর নামে। আরও কয়েকটা চেক কাটা হয়েছে প্যাসিফিক স্ট্যাম্প এক্সচেঞ্জের নামে, সেগুলোর টাকার অঙ্ক চমকে দেয়ার মতো।

বইটা রেখে দিলো কিশোর। কুপার কি স্ট্যাম্পে আগ্রহী? কই, মিসেস কুপার তো ঘুণাক্ষরেও সেকথা বললেন না একবার।

আরও কাগজপত্র আছে ডেস্কে। লস অ্যাঞ্জেলেসের উইলশায়ার বুলভারের একটা ব্রোকারেজ ফার্ম স্টেটমেন্ট দিয়েছে। কুপারের হয়ে আট মাসে কয়েক লাখ ডলারের সিকিউরিটি বণ্ড বিক্রি করেছে ওরা। একটাতেও উল্লেখ নাই, ওই আট মাসে নতুন কোনো সিকিউরিটি কিনেছেন তিনি। শুধু বিক্রি করেই যাচ্ছেন, করেই যাচ্ছেন।

স্টেটমেন্টগুলো রেখে আরেক বাণ্ডিল কাগজ তুলে নিলো কিশোর। ওগুলো ইনভয়েস, জিনিস কিনেছেন র‍্যাঞ্চের জন্যে। টাকার অঙ্ক দেখে আরেকবার থ হবার জোগাড় তার। শুধু লনের আসবাবপত্রের জন্যেই যা ব্যয় করেছেন, অনেক বাড়ির ভাঁড়ার থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সেই টাকায় সাজিয়ে দেয়া যাবে।

একটা ইনভয়েসের লিস্ট পড়ে না হেসে পারলো না সে। তেতাল্লিশটা লোহার চেয়ার—সুইডিশ আইভি ডিজাইন। দশটা টেবিল, ওই একই ডিজাইন। উল্লেখ করা আছে, মিস্টার কুপারের পছন্দমতো তাঁর অর্ডারে তৈরি হবে, নব্বই দিনের মধ্যে র‍্যাঞ্চো কুপারে সাপ্লাই দিতে হবে।

কোটিপতিদের নানারকম খেয়ালের কথা সে শুনেছে, কিন্তু মিস্টার কুপার যেন সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছেন। ওই ধরনের চেয়ার–টেবিল যে কোনো সাধারণ ফার্নিচারের দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসা যায়। তার জন্যে আবার অর্ডার? ইনভয়েস?

বাণ্ডিলটা রেখে টেবিলের ডালা নামিয়ে দিলো কিশোর। তালা লাগালো। বসেই রইলো ওখানে। কোথায় যেন একটা খটকা? ধরতে পারছে না। জরুরী কিছু দেখেছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। আরও গভীরভাবে ভাবতে যাবে, এই সময় কানে এলো শব্দ। নিচে।

রান্নাঘরের দরজা খোলা হয়েছে। মেঝেতে ভারি জুতোর শব্দ। মিসেস কুপার নন। নিশ্চয় মিস্টার…

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। নিঃশব্দে চাবির রিংটা আগের জায়গায় রেখে খোপের ডালা লাগিয়ে দিলো। তার ওপর আগের মতো করে টেনে দিলো কার্পেট।

খাবার ঘর পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলো পায়ের আওয়াজ।

সিঁড়িতে উঠলো শব্দ। উঠছে, উঠে আসছে।

আর সময় নেই। এখান থেকে হলঘর দিয়ে বেরোতে পারবে না কিশোর, চোখে পড়ে যাবেই। আটকা পড়েছে সে!

এগারো

লেবুবাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে রবিন আর মুসা, দক্ষিণের বেড়ার দিকে।

পাতাবাহারের বেড়ার কাছে এসে থামলো। লুকিয়ে বসে নজর দিলো পথের দিকে।

গেটের খানিক দূরে, ঝোপের কিনারে একটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। সামনের চত্বরে মাটিতে বসে টিনের মগে করে চা খাচ্ছে সামরিক পোশাক পরা দু'জন লোক। গেটের কাছে পাহারারত মিস্টার কুপারের গার্ডের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। সে-ও তাকাচ্ছে না। গেটের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে রাইফেল। ছেলেদের দিকে পিঠ। ওরা রয়েছে গেটের পশ্চিমে।

তাঁবুর কাছে একটা গাছ থেকে ঝুলছে একটা যন্ত্র, ইঙ্গিতে সেটা রবিনকে দেখালো মুসা।

'কি?' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

'জানি না। বোধহয় ফিল্ড টেলিফোন।'

যেন তার কথার সমর্থন জানাতেই ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো ফোন। একজন

এগিয়ে গেল গাছের দিকে। রিসিভার খুলে এনে কানে ঠেকালো। কিছু বললো, এখান থেকে শুনতে পেলো না ছেলেরা।

'লেফটেন্যান্ট না বললে ওদের টেলিফোনও কাজ করে না?' বললো রবিন।

মুসা সেকথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছে সে, লোকটা কি বলছে। রবিনও কান খাড়া করলো। একটা কি দুটো শব্দ কানে এলো। কয়েক মিনিট পর আবার রিসিভার রেখে আগের জায়গায় এসে বসলো লোকটা। বললো কিছু। হেসে উঠলো দু'জনে। চুপ হয়ে গেল হঠাৎ। পুবে তাকিয়ে আছে। কাঁটাতার আর পাতাবাহারের বেড়ার মাঝের জায়গা দিয়ে হেঁটে আসছে কুপারের একজন গার্ড।

টহল দিচ্ছে লোকটা। গেটের কাছে এসে থেমে অন্য লোকটার সংগে দু'চারটা কথা বললো। তারপর ঘুরে আবার ফিরে চললো যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে।

'এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার,' মুসা বললো। 'পশ্চিম দিক থেকে কেউ এলেই দেখে ফেলবে। আমার মনে হয় আছে ওদিকে।'

কাছেই একগুচ্ছ ইউক্যালিপটাসের ঝাড়। তার মধ্যে এসে ঢুকলো ওরা।

ঠিকই আন্দাজ করেছে মুসা, খানিক পরেই পশ্চিম থেকে এলো আরেকজন গার্ড। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে সে ফিরে যেতেই শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। জীপ। গেটের কাছ দিয়ে পশ্চিমে চলে গেল। জীপে দু'জন সৈনিক। গেটে পাহারারত প্রহরীর দিকে ফিরেও তাকালো না, সে-ও তাকালো না ওদের দিকে।

'দু'পক্ষই এড়িয়ে যাচ্ছে,' বললো মুসা। 'কেউ কারও সাথে কথা বলে না।'

'ওই ব্যাটারা কি আলোচনা করছে, যদি শুনতে পারতাম,' সৈন্য দু'জনকে দেখিয়ে বললো রবিন। তাঁবু আর কাঁটাতারের বেড়ার দূরত্ব অনুমান করে নিলো। হঠাৎ বললো, 'আমি বেড়ার কাছে যাচ্ছি।'

'অ্যাঁ!' অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকালো মুসা।

'বেড়ার কাছে যেতে চাই,' আবার বললো রবিন। 'দেখো, ওই যে বাঁকটা। ওখানে গিয়ে যদি বসতে পারি, গেটের কাছের গার্ড দেখতে পাবে না আমাকে। সৈন্য দু'জনও না। যারা টহল দিচ্ছে, ওখানটায় যাচ্ছে না।'

সন্দেহ গেল না মুসার।

'যাওয়ার সময় কারো চোখে না পড়লেই হলো,' বলে গেল রবিন। 'ব্যাটারা কি আলোচনা করছে শোনা দরকার।'

'যদি দেখে ফেলে? কিছু করতে আসে?'

'চিল্লাবো। গলা ফাটিয়ে। গার্ডেরা বাঁচাবে আমাকে, ধরে নিয়ে যাবে মিস্টার কুপারের কাছে। তিনি নিশ্চয় মেরে ফেলবেন না।'

'বলা যায় না।'

'কিশোর এখানে থাকলে কি করতো? চুপচাপ বসে থাকতো? না! আমি যা করতে চাইছি, তা-ই করতো।' বলে আর দেরি করলো না রবিন। উঠে দৌড় দিলো। মাথা নিচু করে ছুটে গেল পাতাবাহারের বেড়ার ধার দিয়ে। কিছু দূর এসে একটা ঝোপে ঢুকে পড়লো। ঝোপ থেকে বেরিয়ে, বেড়ার মাঝখান দিয়ে ঢুকে ওপাশে বেরিয়ে চলে এলো আরেকটা ইউক্যালিপটাসের ঝাড়ের মধ্যে। একেবারে কাঁটাতারের বেড়ার কিনারে।

বাঁয়ে তাকিয়ে গেট বা তাঁবু কিছুই চোখে পড়লো না। ডানে শূন্য নির্জন রাস্তা।

বাঁয়ে মোড় নিয়ে হালকা গাছপালার আড়ালে আড়ালে চলে এলো বাঁকের কাছে। ওখান থেকেও কিছুই দেখতে পেলো না।

না, এখানে থেকেও হবে না। সৈন্যদের কথা শুনতে হলে, ওদের ওপর চোখ রাখতে হলে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। তারমানে মিস্টার কুপারের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। মস্ত ঝুঁকি! ঝুঁকিটা নেবে ঠিক করলো রবিন।

আরেকবার তাকালো নির্জন পথের দিকে। কাঁটাতারের বেড়ার নিচে ফাঁক কতোখানি দেখলো। তার হালকা-পাতলা শরীর, চেষ্টা করলে তলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে।

লম্বা হয়ে শুয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিলো বেড়ার নিচ দিয়ে। আঙুল দিয়ে মাটি আর ঘাস খামচে ধরে টেনে বের করে আনলো অর্ধেকটা শরীর। পিঠে লাগলো তারের কাঁটার খোঁচা। শার্টে বেধে গেল। পরোয়া করলো না সে। শার্ট ছিঁড়লো, পিঠে আঁচড় লাগলো। বেরিয়ে এলো অবশেষে অন্য পাশে। উঠে, এক দৌড়ে ঢুকে গেল ঝোপের ভেতর।

ছোট একটা টিলার ওপাশে তাঁবু খাটিয়েছে সৈন্যরা।

টিলার ওপরে উঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো রবিন। দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, ওদের কথাও কানে আসছে এখন, অস্পষ্ট। যথেষ্ট আড়াল রয়েছে এখানে। ঝোপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললো সে, ওদের আরও কাছে।

পরিশ্রম আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে শরীর। তবু সতর্ক রইলো রবিন, যাতে এতটুকু শব্দ না করে ফেলে। একটা পাথর খসে পড়লো, কিংবা শুকনো ডাল মট করে ভাঙলেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে সৈন্যরা।

'পুরনো জিনিস!' পরিষ্কার কানে আসতেই থেমে গেল রবিন, আর এগোনোর দরকার নেই। শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শুনলো ওদের কথা।

'হ্যাঁ, যতো পুরনো হয় ততো ভালো,' বললো দ্বিতীয়জন।

'দেখি, দাও ওটা,' বললো প্রথম জন।

কি দিচ্ছে দেখার জন্যে মাথা উঁচু করলো রবিন। দু'জনের মধ্যে খাটো লোকটা অন্যজনের হাত থেকে চ্যাপ্টা একটা বোতল নিচ্ছে। ছিপি খুলে ঢালতে শুরু করলো তার

টিনের মগে।

'আরে, রক, সবই ঢেলে নিচ্ছো দেখি,' বললো লম্বা লোকটা। বোতল প্রায় কেড়ে নিয়ে তার মগেও ঢাললো খানিকটা। বোতলটা রাখলো মাটিতে।

তাঁবুর ভেতর থেকে বেরোলো লেফটেন্যান্ট শেট মরটন। ভুরু কোঁচকালো। 'এই বেন, কি করছো? এখানে ওসব শুরু করছো? ড্রিংক–ট্রিংক চলবে না।'

'ক্ষতিটা কি?' বললো বেন।

'ক্ষতি আর কি? মাতলামি শুরু করবে,' বোতলটা তুলে নিয়ে ঝোপের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিলো লেফটেন্যান্ট।

'এই, কি করলে!' চেঁচিয়ে উঠলো রক।

'হ্যাঁ, করলাম,' জবাব দিলো মরটন। 'গেটের কাছের লোকটা যদি দেখে ফেলে, আর গিয়ে বলে কুপারকে তোমরা মদ খাচ্ছিলে? কেমন হবে? তোমরা আমেরিকান আর্মি সেজেছো, মনে রেখো। ডিউটির সময় মদ খায় না সৈন্যরা।'

'ওদের রক্তে দেশ বাঁচানোর নেশা, না খায় না খাক। আমার তাতে কি?'

'দেখো, ফালতু কথা বলো না...'

'আহা কি আমার দেশপ্রেমিকরে,' ব্যঙ্গ করলো রক। 'তাহলে এসব করছো কেন?'

'তোমরা যে কারণে করছো। দেশপ্রেমের সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যেভাবে করতে বলবো পারলে করো, নইলে সগাসে ফিরে যাও। এতোখানি এগিয়ে সব কিছু নষ্ট করতে চাই না এখন।'

'এতোসবের দরকারটা কি? গিয়ে ঢুকে পড়লেই হলো। জোর করে কথা আদায় করবো বুড়োটার মুখ থেকে।'

'জোর করে? পঞ্চাশজন লোকের সংগে পারবে? ভুলে যেও না, আস্ত এক গোলাবারুদের ডিপো আছে ওর মাটির তলার ঘরে।

'চাষীগুলোকে একটা ভাগ দিয়ে দিলেই হবে। লুফে নেবে ওরা। দল বদল করবে চোখের পলকে।'

'তুমি কি ভাবো সে চেষ্টা করিনি? অনেক চেষ্টা করেছি। বুঝেছি, ওদেরকে দলে টানা যাবে না। কিছুতেই ওরা কুপারের সঙ্গে বেঈমানী করবে না।'

'ওর হয়ে লড়াইও করবে?'

'দরকার পড়লে জান দিয়ে দেবে। যেভাবে এগোচ্ছি সেভাবেই এগোতে হবে। আর কোনো উপায় নেই। রাগলে কিংবা কোণঠাসা হলে র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে খারাপ হয়ে যায় বুড়োটা।'

আবার বাজলো টেলিফোন।

রিসিভার খুলে কানে ঠেকালো লেফটেন্যান্ট। 'নতুন কোনো খবর?'

চুপচাপ শুনলো ওপাশের কথা। তারপর বললো, 'ঠিক আছে। নতুন কিছু হলে জানাবে।' রিসিভার রেখে ফিরলো সংগীদের দিকে। 'রোজকার মতোই ঘুরতে বেরিয়েছে কুপার। চাষীরা খেতে কাজ করছে। সব কিছু স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে ওরা। যা ভেবেছি তা-ই করছে।'

'শেষ পর্যন্ত হলে হয়,' সন্দেহ প্রকাশ করলো বেন।

'কুপারকে খোকা ভেবেছো নাকি? ভয় দেখালেই কুঁকড়ে যাবে? ডেঞ্জারাস লোক।'

তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো আবার লেফটেন্যান্ট।

'নিজেকে নেপোলিয়ন ভাবতে আরম্ভ করেছে,' সেদিকে চেয়ে বললো রক। 'হুঁহ।'

একটা পাথরে হেলান দিয়ে চোখ মুদলো বেন। রকের কথার জবাব দিলো না।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো রবিন। তারপর ফিরে চললো। আসার সময় যতোটা সাবধান হয়েছিলো, তার চেয়েও সাবধানে।

নিরাপদেই এসে ঢুকলো কুপারের সীমানায়। ফিরে এলো ঝোপের ভেতর, মুসা যেখানে বসে আছে উৎকণ্ঠিত হয়ে।

'জানতে পারলে কিছু?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'অনেক কিছু! ব্যাটারা শয়তান। জলদি গিয়ে কিশোরকে জানানো দরকার।

লেবুবাগানের ভেতর দিয়ে আবার র‍্যাঞ্চে ফিরে চললো ওরা।

বাগান থেকে বেরিয়ে কুপারের বাড়ির সামনে লনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ওপর দিকে।

কিশোর! বাড়ির সামনে বারান্দার ছাতে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে পিঠ, চেয়ে আছে কোণের জানালাটার দিকে। বাতাসে দুলছে জানালার পর্দা।

'নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছে,' বললো মুসা। 'কিছু একটা করা দরকার। তাড়াতাড়ি।'

বারো

কিশোর এদিকে ফিরতেই হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো মুসা। তারপর ছুটলো লনের ওপর দিয়ে, পথে উঠবে। পেছনে ছুটলো রবিন, জানে না মুসার মনে কি আছে।

র‍্যাঞ্চহাউস আর মূল বাড়িটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো মুসা। ঘুরে তাকালো। এখান থেকে কিশোরকে দেখা যায় না।

'এক ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দেবো।' রবিনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'ফাজলেমির আর জায়গা পাওনি।'

তাজ্জব হয়ে গেল রবিন। 'কি বলছো?'

'চুপ! আরও জোরে গর্জে উঠলো মুসা। রবিনের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাহুতে আলতো চাপড় দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'বুঝতে পারছো না?' চেঁচিয়ে বললো, 'দেখাচ্ছি মজা।' ঘুসি তুললো।

'বুঝেছি,' ফিসফিস করেই জবাব দিলো রবিন। তারপর মুসার সংগে পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি করবে তুমি? কি করবে অ্যাঁ? মারবে?' সেও কিল তুললো।

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মুখ বের করলো জোয়ান। 'আরে এই, কি শুরু করেছো তোমরা? এই?'

তার কথা কানেই তুললো না ছেলেরা। লেগে গেল। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এলো জোয়ান। ছেলেদের ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

'হয়েছে কি?' ওপর থেকে শোনা গেল একটা ভারি কণ্ঠ।

মুসার ওপর থেকে টেনে রবিনকে সরিয়ে আনলো জোয়ান। ওপর দিকে চেয়ে বললো, 'না, কিছু না, মিস্টার কুপার। বনিবনা হয়নি হয়তো...'

বড় বাড়িটার কোণ ঘুরে আসতে দেখা গেল কিশোরকে। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, 'গণ্ডগোল?'

'নাআহ, কিছু না,' রবিনকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে চললো জোয়ান।

ওপরে দ্রাম করে জানালার পাল্লা বন্ধ করলেন কুপার, অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর মুখ।

মাটি থেকে উঠলো মুসা। কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে হেসে বললো, 'শরীরটা ছোট হলে কি হবে? জোর আছে রবিন মিয়ার।'

হাসতে হাসতে বড় বাড়িটার পেছনে চলে এলো তিনজনে।

'ওখানে উঠেছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'কুপারের অফিসে খোঁজাখুজি করছিলাম। এই সময় শুনি উঠে আসছেন। আর কোনো পথ না দেখে জানালা দিয়ে বেরিয়ে ছাতে নেমে পড়লাম। নেমে যেতে পারতাম আরও আগেই, ভরসা পাচ্ছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না উনি কোথায় আছেন। নামার সময় যদি দেখে ফেলেন?'

'কিছু পেলে?'

'শিওর না। ভাবতে হবে। তোমরা কিছু পেলে?'

'অনেক। ব্যাটারা মিথ্যুক। ওদের ফিল্ড টেলিফোন ঠিকই কাজ করছে। দু'বার

ফোন এলো, ধরলো, কথা বললো, নিজের চোখে দেখলাম। বেড়ার তলা দিয়ে পেরিয়ে রবিন চলে গিয়েছিলো ওদের তাঁবুর কাছে। অনেক কিছু শুনে এসেছে।'

সব খুলে বললো রবিন।

'হুঁ,' মাথা দোলালো কিশোর। 'যা সন্দেহ করেছিলাম। কুপারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে কেউ।'

'গোলাবারুদের ডিপোর কথা বললো ওরা। সত্যি কি আছে?'

'আছে। মাটির তলার ঘরে। অস্ত্রাগার।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললো কিশোর, 'একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল, এখানকার কেউ, অর্থাৎ শ্রমিকেরা কেউ এই ষড়যন্ত্রে নেই। কিন্তু র‍্যাঞ্চো কুপারে স্পাই একজন নিশ্চয় আছে, নইলে অস্ত্রাগারের কথা জানলো কিভাবে বাইরের লোকে? কুপার যে নিয়মিত র‍্যাঞ্চ দেখতে বেরোন, এটাও জানে। স্টাফদের কারও নাম বলেছে মরটন? হ্যানস? কাপলিং? ব্যানার?'

মাথা নাড়লো রবিন।

বার কয়েক নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। বিড়বিড় করলো, 'রাগলে র‍্যাটলস্নেকের···,' ঝট করে মাথা তুললো। তুড়ি বাজালো। 'ঠিক। মিস্টার কুপার।'

'কি যা-তা বলছো?' হাত নাড়লো মুসা। 'মিস্টার কুপার স্পাই হতে যাবেন কেন?'

'আরে না, সেকথা বলছি না। বলছি, সোনা ছাড়া তো আর কিছু বোঝেন না মিস্টার কুপার। তার ওই সোনা লুটের চেষ্টাই করছে ষড়যন্ত্রকারীরা। হ্যাঁ, তাই। ইহ্‌হি, আরও আগেই বোঝা উচিত ছিলো···'

'সোনা? অবাক হলো রবিন। 'কিসের সোনা?'

'মিস্টার কুপার যেগুলো এখানে, এই র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রেখেছেন।'

'দেখেছো তুমি?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'না। তবে আমি শিওর, কোথাও আছেই। স্টেটমেন্ট দেখলাম, লক্ষ লক্ষ ডলারের সিকিউরিটি বণ্ড বিক্রি করেছেন মিস্টার কুপার। সমস্ত ব্যাংকের সব টাকা তুলে নিয়েছেন। অনেক, অনেক টাকা। কি করলেন সেগুলো? নিশ্চয় সোনা কিনেছেন। একটা স্ট্যাম্প কোম্পানির নাম দেখলাম। স্ট্যাম্প যারা বিক্রি করে, অনেক সময় সোনার মোহরও বিক্রি করে তারা—বড় বড় কোম্পানিগুলো। কুপার তো বলেই বেড়ান, সোনা আর জমি ছাড়া আর কোনো কিছুর ওপর তাঁর ভরসা নেই।'

'নিশ্চয়!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন? 'সোনাই কিনেছেন তিনি। এবং যেহেতু ব্যাংককে বিশ্বাস করেন না, সেই সোনা রেখেছেন এখানেই কোথাও। মিসেস কুপারকে সত্যি কথা বলেননি। সান্টা বারবারার ব্যাংকে সেফ ডিপোজিটে কিছুই নেই। গহনাও সব এখানে, কুপারের অফিসে।

'এখন কথা হলো আমরা যেমন বুঝতে পারছি এখানে সোনা লুকিয়ে রেখেছেন কুপার, আরও কেউ সেটা বুঝে থাকতে পারে, এবং সে এই র‍্যাঞ্চের লোক। ডাকাতদের সংগে হাত মিলিয়েছে। তারপর সবাই মিলে প্ল্যান করে ওই ফ্লাইং সসারের খেল দেখাচ্ছে। ওরা জানে না সোনাগুলো কোথায় লুকানো আছে, চালাকি করে কুপারকে দিয়েই ওগুলো বের করানোর চেষ্টা করছে।'

'কিন্তু ফ্লাইং সসার দেখলেই কেন বের করবেন?'

'সসার-ফসার বিশ্বাস করেন না তিনি। নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস না করে পারবেন না। উদ্ধারকারীরা এসেছে ভেবে পৃথিবী থেকে পালানোর জন্যে তৈরি হবেন। তখন অবশ্যই আর কিছু না হোক, অন্তত সোনাগুলো নিয়ে যেতে চাইবেন সংগে করে। কারণ সোনা আর জমি ছাড়া...'

'অবিশ্বাস্য!' বললো মুসা।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা কঠিন। তবে এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'কুপারকে গিয়ে বলবো একথা?' ভুরু নাচালো রবিন।

'মিস্টারকে না হলেও মিসেসকে বলতেই হবে। তিনি এখন আমাদের মক্কেল। আর কুপারকে এক্ষুণি বলে লাভ হবে না, আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।'

'এখন আমাদের করণীয় কি? আরেকটা ফিল্ড টেলিফোনের খোঁজ করা? এবং সেটা কে ব্যবহার করে, জানার চেষ্টা করা?'

'খুব কঠিন হবে কাজটা,' বললো মুসা। 'বিরাট এলাকা। কোথায় লুকিয়ে আছে খুদে একটা টেলিফোন, কি করে জানবো?'

আবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করলো কিশোর। 'বাইরে খোঁজাখুজির দরকার হবে না। ওটা ব্যবহার করতে হবে স্পাইকে। আর করতে হলে এমন কোথাও রেখে করতে হবে, যাতে বাইরের কেউ দেখে না ফেলে।'

'কিন্তু সেটাও কম কঠিন না। ঘরবাড়ি কি একটা দুটো...'

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ফিরে তাকালো ওরা। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে জোয়ান মারটিংগেল। বাহুতে ঝোলানো নীল রঙের একটা কাপড়। হেসে বললো, 'মিসেস নিকারার কাছে যাচ্ছি। স্কার্টটা লম্বা হয়, ছোট করে দিতে বলবো। রান্নাঘরের তাকে কুকিস আছে, ফ্রিজে দুধ আছে। খিদে পেলে খেয়ে নিও।'

তাকে ধন্যবাদ জানালো ছেলেরা।

কটেজগুলোর দিকে চলে গেল জোয়ান।

বন্ধুদের দিকে তাকালো মুসা। 'বোধহয় এইই সুযোগ। র‍্যাঞ্চহাউসে এখন কেউ নেই। সবাই যে যার কাজে গেছে। চলো, টেলিফোনটা খুঁজি।'

'কিন্তু ওই বাড়িতে কি থাকবে?' প্রশ্ন করলো রবিন।

'থাকতেও পারে,' কিশোর বললো। 'যারা ওখানে থাকে, হয়তো তাদেরই কেউ স্পাই।'

তেরো

তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। যে কোনো সময় যে কেউ ফিরে আসিতে পারে।

শুরু করলো ড্যাম সানের ঘর থেকে। কয়েকটা ট্রফি পাওয়া গেল, কোনো প্রতি-যোগিতায় জিতে পেয়েছে বোধহয়। কোনো চিঠি নেই। কারও কাছে লেখেও না, কারও কাছ থেকে পায়ও না। ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও বিশেষ কিছু নেই।

'নিঃসঙ্গ,' মন্তব্য করলো কিশোর। 'জিনিস-টিনিসের লোভ নেই।'

'তাহলে সোনার লোভও নেই, ঠিক?' বললো মুসা।

'সেকথা বলা যায় না। ভালো অফার পেয়েই তো এক র‍্যাঞ্চ ছেড়ে আরেক জায়গায় এলো। তবে সেটা টাকার লোভ না হয়ে কাজের লোভেও হতে পারে। ওরকম মানুষ আছে। জিনিসপত্র যা আছে, দেখে তো মনে হয় সহজ সরল জীবন যাপনই পছন্দ ওর।'

হ্যানসকাপলিঙের ঘরে ঢুকলো ওরা। একটা বুককেস বইয়ে ঠাসা। অধিকাংশই বিজ্ঞানের বই। হাইড্রলিক পাওয়ার, ইলেকট্রিসিটি, এইরো-ডিনামিকস, এসব। বিছানার নিচেও স্তূপ হয়ে আছে বই, ওগুলোর বেশির ভাগ ফিকশন। পেপারব্যাক আছে অনেক। মহাকাশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রচুর, বোঝা গেল। কিছু বইয়ের নামও অদ্ভুত।

'দেখো,' একটা বই তুলে নিলো মুসা। 'দা এনশেন্ট ফিউচার। করসাকভের লেখা। এর লেখা একটা বইই পড়তে দেখেছি মিসেস কুপারকে…'

'হ্যাঁ, প্যারালেলস,' বললো কিশোর।

'এই যে, আরও,' একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে আছে রবিন, দরজা খুলেছে। জোরে জোরে বইয়ের নাম পড়লো, 'দা ক্রাউডেড কসমস। দা সেকেণ্ড ইউনিভার্স। ব্ল্যাক হোলস অ্যাণ্ড ভ্যানিশিং ওয়ার্ল্ডস।' আরও অনেক আছে, একই ধরনের বই।

'বাব্বাহ্‌রে,' বললো মুসা। 'মহাকাশে কি এতোই ভিড়?'

'কি জানি,' হাত নাড়লো রবিন। 'তবে মহাকাশের ব্যাপারে কাপলিঙের মেলা আগ্রহ। মিস্টার কুপারের ব্যাপারেও কি?'…কিন্তু উল্টো কাজ করছে ডাকাতেরা। সসারের ব্যাপারে মিস্টার নন, মিসেস কুপার আগ্রহী। সসার দেখিয়ে কি মিস্টার কুপারের কিছু করতে পারবে? তিনি ভয় পাবেন?'

'নিজের চোখকে অবিশ্বাস তো করতে পারবেন না,' কিশোর বললো, আর নিজ ধারণার ওপর বিশ্বাস তাঁর খুব বেশি। ভয় পান আর না পান, আগ্রহী তো হয়ে উঠেছেন। মিসেস কুপার বললেন না, সারারাত না ঘুমিয়ে সসারের বই ঘেঁটেছেন। তারমানে ডাকাতদের ধারণাই ঠিক হচ্ছে। কিন্তু ওরা মিস্টার কুপারের স্বভাব

এতোখানি জানলো কিভাবে?'

'কিশোর,' মুসা বললো, 'আমরাই হয়তো ভুল করছি। সত্যি হয়তো স্পেসশিপ নেমেছিলো।'

'না। তাহলে ডাকাতগুলো সৈন্য সেজে গেটের ধারে আস্তানা গেড়েছে কেন?'

'তা বলতে পারবো না। কিন্তু ফ্লাইং সসার দেখালেই মিস্টার কুপারের মতো লোক সোনা বের করে ফেলবেন? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'বেশ, তোমার কথাই ধরো। তোমাকে পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহে যেতে বাধ্য করা হলো। সংগে কি নেবে?'

'যেটা আমার কাছে সব চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে হবে। কিন্তু এখনও কেউ মিস্টার কুপারকে বলেনি, সোনাগুলো নিয়ে জলদি এসো, উড়ে যাই।'

'নরম করে নিচ্ছে। বিশ্বাস করিয়ে নিচ্ছে, ফ্লাইং সসার সত্যি আছে,' জবাবটা দিলো রবিন। আলমারির বইগুলো দেখালো। কিন্তু এসব কেন?'

'হয়তো সাইন্স ফিকশন ভালো লাগে কাপলিঙের,' কিশোর বললো, 'তবে ওর ওপর চোখ রাখা দরকার।'

সে-ঘর থেকে বেরিয়ে হল পেরিয়ে এসে জোয়ান মারটিংগেলের ঘরের দিকে এগোলো ওরা।

'নোংরা,' দরজা খুলেই বলে উঠলো মুসা।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জিনিসপত্র, অগোছালো। কাচের টিউব, বোতল, শিশি পড়ে আছে যেখানে সেখানে। হালকা ম্যাগাজিন, শস্তা প্রেমের উপন্যাস আর জুতো স্যাণ্ডাল জড়াজড়ি করে আছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর মেকআপের উপকরণ কোনোটা ওল্টানো, কোনোটা কাত হয়ে আছে, কিছু বন্ধ কিছু মুখ খোলা। চুলের কাঁটা আর ফিতে তালগোল পাকিয়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারেরও একই দুর্গতি।

বসে, খাটের নিচে উঁকি দিলো মুসা।

'সাইন্স ফিকশন পড়ে? আছে বইটই?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'না,' মুসা বললো। 'ধুলো আর একজোড়া জুতো ছাড়া কিচ্ছু নেই।'

বিছানার পাশে রাখা ছোট টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। ড্রয়ার খুললো। কিছু লোশন আর ফিতে। আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ।

ছবিগুলো তুলে নিলো সে। সৈকতে তোলা জোয়ানের একটা ছবি। আরেকটা ছবিতে, একটা কাঠের বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে আছে। হাসছে। কোলে একটা ছোট জাতের কুকুর। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছবিতে শাটিনের ব্লাউজ আর কাগজের টুপি পরে আছে সে। একটা টেবিলের সামনে বসা। তার পাশে বসা কালোচুল ঘাড়-মোটা এক লোক। পেছনে বেলুনের সমারোহ। লম্বা লালচে চুলওয়ালা একটা মেয়ে

নাচছে দাড়িওয়ালা এক তরুণের সঙ্গে।

'নিউ ইয়ারস ইভ পার্টি?' রবিন বললো।

মাথা ঝোঁকালো কিশোর। ছবিগুলো রেখে দিলো ড্রয়ারে। এরপর চললো ওরা জেনি এজটারের ঘরে।

সাজানো গোছানো, ছিমছাম, জোয়ানের ঘরের ঠিক উল্টো। যেখানে যেটা রাখা উচিত, সেখানেই রাখা আছে। কসমেটিক খুব সামান্য। দেরাজে হ্যাঙারে ঝোলানো কিছু কাপড়, বাকিগুলো সুন্দরভাবে ভাঁজ করে একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। চীনামাটির তৈরি ছুটন্ত ঘোড়ার একটা প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে দেরাজের ওপরে। জানালার নিচে একটা বুককেস, তাতে কিছু বই, জন্তুজানোয়ারের যত্ন কি করে নিতে হয়, তার ওপর লেখা।

'জানোয়ারের পাগল,' বললো মুসা।

'কিছুই নেই,' একটা ড্রয়ার ঠেলে বন্ধ করে সোজা হলো কিশোর। 'চলো, ব্যানারের ঘরে।'

ওখানেও পাওয়া গেল না কিছু। চাষবাষের ওপর কয়েকটা বই। কখন কোন্ শস্য বুনতে হবে তার কিছু লিস্ট আর শিডিউল।

নিচতলার বড় লিভিংরুমটায় নেমে এলো ওরা। পুরনো সোফা, চেয়ার; প্রাচীন ম্যাগাজিন।

ভাঁড়ারঘরেও কিছু পাওয়া গেল না, শুধু খাবারে বোঝাই।

'অনেক সময় খুঁজলে পাওয়া যায় না,' অবশেষে বললো কিশোর। 'অথচ অন্য সময় আপনিই চোখে পড়ে। চলো, মিসেস কুপারের সঙ্গে কথা বলি। সৈন্যগুলো যে ভুয়া, এটুকু অন্তত জানানো দরকার।'

দরজায় টোকা দিলো কিশোর। সাড়া নেই। থাবা দিলো। তবু জবাব এলো না। শেষে হাতল ঘুরিয়ে ঠেলে খুলে ফেললো পাল্লা। ডাকলো, 'মিসেস কুপার?'

খাবার ঘরে আঁচড়ের শব্দ, আর বিচিত্র খসখস আওয়াজ হচ্ছিলো, কিশোর ডাকতেই থেমে গেল।

'কে?' মহিলা কণ্ঠ।

'আমরা। আমি কিশোর।'

রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে খাবার ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। জেনি এজটার বসে আছে। সামনে টেবিলে রাখা ছোট একটা রেডিও আর একটা টেপ রেকর্ডার।

মুখ তুলে তাকালো জেনি। 'মিসেস কুপারকে খুঁজছো? দোতলায়।'

রেডিওটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো কিশোর, 'কথা বলে?'

'খালি খড়খড় করে। মিসেস কুপার বললেন, চালু করে দিয়ে বসে থাকতে। কিছু

বললে, রেকর্ড করে রাখতে।' একটা সুইচ টিপে তারপর নব ঘুরিয়ে ভল্যুম বাড়িয়ে দিলো সে। শুরু হলো খড়খড়। হঠাৎ থেমে গেল, তার জায়গায় ঠাঁই নিলো গুঞ্জন।

'আরি!' বলে উঠলো জেনি। 'কি হলো?'

রেকর্ডারের রেকর্ডিং সুইচ টিপে দিলো সে।

'আলবার্ট কুপার,' বেজে উঠলো রেডিওর স্পীকার—সুরেলা, ভারি একটা যান্ত্রিক কণ্ঠ, 'আলবার্ট হেনরি কুপার। মারকারি শিপ এক্স ও টেন থেকে বলছি। আলবার্ট এবং জেলডা কুপারকে চাইছি। আবার বলছি, আলবার্ট এব জেলডা কুপারের সংগে যোগাযোগ করতে চাইছি। মিস্টার কুপার!'

'সব্বোনাশ!' চেঁচিয়ে উঠলো জেনি। 'এ-তো মেসেজ! এই,' ছেলেদের দিকে ফিরলো, 'জলদি ডাকো! ডেকে আনো। তাড়াতাড়ি!'

চোদ্দ

'মারকারি শিপ এক্স ও টেন থেকে বলছি!' আবার শোনা গেল রেডিওর স্পিকারে। 'আলবার্ট এবং জেলডা কুপারকে চাইছি। তোমাদের বায়ুমণ্ডল থেকে তিনশো মাইল দূরে আছি এখন আমরা।'

খাবার ঘরে ঢুকলেন মিস্টার এবং মিসেস কুপার।

এতো বেশি কুঁচকে গেছে কুপারের ভুরু, দু'দিকের দুই মাথা প্রায় মিশে যাওয়ার অবস্থা। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন রেডিওর দিকে।

'তোমাদের গ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল লক্ষ্য করছে আমাদের ইনফ্রা-রেড স্ক্যানার। খুব তাড়াতাড়িই ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটতে যাচ্ছে। আগ্নেয়গিরির ভেতরেও গোলমাল দেখা যাচ্ছে, বড় বেশি অশান্ত হয়ে উঠেছে। কাত হয়ে গেছে পৃথিবী। সরে যাচ্ছে মেরুর বরফ, পুরো মেরু অঞ্চল সরে যাবে মনে হচ্ছে বিষুব রেখার কাছে। ইতিমধ্যেই গলতে শুরু করেছে বরফ। সাগরের উষ্ণতা বাড়ছে। সমুদ্র সমতলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে শহরগুলো।'

'মাই গড!' কেঁদে ফেলবে যেন জেনি। 'বাজে কথা বলছে, তাই না মিসেস কুপার? বাজে কথা!'

জবাব দিলেন না মিসেস কুপার।

'বেছে বেছে কিছু মানুষকে তুলে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের ওমেগা গ্রহের সুপ্রীম কাউনসিল,' বলে চললো রেডিও। 'পৃথিবী একেবারে ধ্বংস হয়ে না গেলে, আবার সব ঠিক হয়ে গেলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে আসা হবে পৃথিবীতে। যাতে নতুন

করে আবার সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে। বাছাই করা লোকদের মধ্যে আলবার্ট আর জেলডা কুপারের নামও আছে। গতরাতে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। আজ রাতে মিশন শেষ করার চেষ্টা করবো আরেকবার। রাত ঠিক দশটায় নামবো আমরা, পৃথিবীতে আমাদের যেসব লোক আছে তাদের তুলে নিতে। সাহস থাকলে, আমাদের কথা বিশ্বাস করলে মিস্টার এবং মিসেস কুপারকে তাদের র‍্যাঞ্চের বাঁধের ধারে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি। আবার বলছি, রাত দশটায় নামবো ওখানে আমরা। ইচ্ছে করলে তারা তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে, যদি ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায়।'

চুপ হয়ে গেল কণ্ঠ। মুহূর্ত পরেই আবার খড়খড় করে উঠলো স্পীকার।

এগিয়ে এলেন মিস্টার কুপার। রেকর্ডারের রেকর্ডিং সিসটেম অফ করে দিয়ে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলেন ঘর থেকে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল, দোতলায় যাচ্ছেন।

'মিসেস কুপার,' কিশোর বললো, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।'

মাথা নাড়লেন মিসেস কুপার। চেহারা ফ্যাকাসে। 'পরে,' বলে তিনিও বেরিয়ে গেলেন।

রেডিওটার দিকে তাকিয়ে স্থির বসে আছে জেনি। 'শুনলে?' ফিসফিস করে বললো সে। 'মনে হচ্ছে···মনে হয় আমরা···' চেয়ার ঠেলে উঠে রেডিওটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন। বাইরে গিয়ে জোয়ান মারটিংগেলের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলো।

কিশোরের দিকে তাকালো মুসা। 'কি হবে?'

'মরবো না আমরা,' বললো গোয়েন্দাপ্রধান।

'শিওর?'

'শিওর।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয়,' মুসার গলা কাঁপছে।

বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরে শেষ বিকেলের রোদ।

জেনি কিংবা জোয়ানের ছায়াও দেখা গেল না। একদল পুরুষ আর মহিলা এগিয়ে আসছে এদিকে। হাতে কাজের যন্ত্রপাতি। কথা বলতে বলতে আসছে।

ছেলেদের কাছাকাছি এসে তাদের দিকে চেয়ে মাথা নোয়ালো এক তরুণ।

'এক মিনিট,' লোকটার হাত ধরলো কিশোর।

'কি?'

'পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের কি ধারণা?'

ফিরে তাকালো লোকটা। তার সঙ্গীদের কয়েকজন ঘরে ঢুকে গেছে। কয়েকজন

পথেই দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়ে আছে; তার অপেক্ষাতেই।

'কেউ বলছে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে,' অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বললো লোকটা। 'কেউ বলছে, পৃথিবী না, শুধু ক্যালিফোর্নিয়া তলিয়ে যাবে সাগরের তলায়, চিরকালের জন্যে।'

'সৈন্যদের কথা কি বলে ওরা?'

কি আর বলবে? সৈন্যরাও তো মানুষ। ওরাও ভয় পেয়েছে। শুনলাম, অফিসারের কথা মানছে না, সমানে মদ খেয়ে চলেছে। কিছুতেই নাকি থামাতে পারছে না অফিসার। ওরাও বুঝতে পেরেছে, ভয়ানক কিছু ঘটবে পৃথিবীতে।'

'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে কেউ? অন্য কোথাও চলে যাবার কথা?'

'না। দুপুরে মিস্টার কুপারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের। তিনি বললেন, কারও যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে চলে যেতে পারে, তিনি বাধা দেবেন না। কিন্তু কেউ যেতে রাজি না। এখানে প্রচুর খাবার আছে, উঁচু জায়গা আছে, বাঁচার চেষ্টা তো করা যাবে। অন্য কোথাও গেলে এই সুবিধেও পাবো না।'

'তাই?' বললো কিশোর।

সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল লোকটা।

বোরিসকে আসতে দেখা গেল। পার্কিং এরিয়ার দিক থেকে আসছে। কাছে এসে বললো, 'এই, কিশোর, কি সব শুনছি? একটু আগে মাঠে গিয়েছিলাম। সবাই ভয়ে অস্থির। কি সব নাকি বলছেন মিস্টার কুপার?'

'শুনেছি,' জবাব দিলো কিশোর।

'আমাদের তাহলে রকি বীচে চলে যাওয়া দরকার। এখানে মোটেই ভাল্লাগছে না আমার!'

'প্লীজ, বোরিস, থামো। এতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

কিশোরের মুখের দিকে তাকালো বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। 'তুমি বলছো?' যেন কিশোর বললেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। 'মনে হচ্ছে তুমি কিছু জানো?'

'জানি। সব শয়তানী। আগে এতো শিওর ছিলাম না, খানিক আগে রেডিওর মেসেজ শুনে পুরোপুরি হয়েছি।'

'মানে?' মুসা মুখ ফেরালো। 'আমার কাছে তো সত্যি বলেই মনে হলো।'

'গত হপ্তায় টেলিভিশনে "দা স্যাটার্ন সিনড্রোম" ছবিটা দেখেছো?' ওখানে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা দৃশ্য আছে। বাইরের গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা স্পেসশিপ নিয়ে উদ্ধার করতে আসছে এক বিজ্ঞানী আর তাঁর মেয়েকে। স্পেসশিপ নামার আগে একটা মেসেজ পাঠানো হয়।'

'ঠিক বলেছো, একেবারে নকল!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'একটু আগে যে মেসেজটা শুনে এলাম, তার হুবহু নকল।'

'শুধু যাদের উদ্ধার করবে তাদের নামগুলো ছাড়া,' শুধরে দিলো কিশোর। 'এমনকি, পৃথিবী যে কাত হয়ে গেছে, মেরুঅঞ্চল সরে চলে আসছে বিষুব রেখার দিকে, তা-ও বাদ দেয়নি।'

'দূর!' হতাশ মনে হলো রবিনকে। 'আর আমি ভাবছিলাম সত্যি সত্যি বুঝি কিছু ঘটতে চলেছে। মজাটাই মাটি।'

'তোমরা দু'জনেই পাগল!' কেঁপে উঠলো মুসা। 'আল্লাহরে আল্লা! কেয়ামতের সময় পৃথিবীর ধারেকাছে থাকতে চাই না আমি।'

পনেরো

র‍্যাঞ্চহাউসের বাঙ্করুম। যার যার বিছানায় বসে আছে রবিন আর মুসা। কিশোর গেছে কুপারদের বাড়িতে। বোরিস নিচে, রান্নাঘরে। তাকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তিন গোয়েন্দা যে কিছু সন্দেহ করছে এটা যেন স্টাফদের কাউকে না বলে।

পনেরো মিনিট পর ফিরে এলো কিশোর। ধীরে ধীরে উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে। ঘরে ঢুকলো। গম্ভীর।

'মিস্টার কুপার বিশ্বাস করেননি তো?' জানতে চাইলো রবিন।

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'বললেন, কবে কোন সিনেমা হয়েছে, তার সংলাপ হুবহু মনে থাকার কথা নয় আমার।'

'বলোনি ওঁকে,' মুসা বললো, 'তোমার মগজে একটা টেপ রেকর্ডার বসানো আছে?'

'অনেক রকমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। শুনলেনই না।'

'ছোট হওয়ার এই এক জ্বালা,' তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'বড়রা বিশ্বাসই করতে চায় না। চাপাচাপি করতে গেলে ধমক লাগিয়ে দেয়!'

'ভুয়া সৈন্যদের কথা বললে না?' রবিন বললো। 'আর সোনার কথা?'

সুযোগই দেননি বলার। কিছু বললেই খেঁকিয়ে ওঠেন।'

'মিসেস কুপারকে বলতে পারতে।'

'তাঁকেও বলার সুযোগ পাইনি। তবে, সিনেমার সংলাপের কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন। আসার সময় স্বামীর কাছ থেকে উঠে এসে বলে গেলেন, রাতের খাওয়ার পর গিয়ে তাঁকে সব শুনিয়ে আসতে।'

'বসে আছি কেন আমরা?' রেগে উঠলো মুসা। 'অন্যদের গিয়ে বললেই পারি।

ভয় তো সবাই পেয়েছে। সব কথা খুলে বলবো তাদেরকে।'

'তাতে স্পাইটাও জেনে যাবে আমাদের সন্দেহের কথা। কুপারদের বিপদ আরও বাড়বে তাতে। হয়তো তখন জোর করেই সোনা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাবে ডাকাতেরা।'

'হ্যাঁ,' সায় জানালো রবিন। 'গোলাগুলি চলবে। মানুষ মরবে।'

'অপেক্ষাই করতে হবে আমাদের,' বললো কিশোর। 'মিসেস কুপারকে বোঝানো হয়তো শক্ত হবে না। কিন্তু তাতেও বিশেষ লাভ হবে না। তিনি গিয়ে বলবেন স্বামীকে, এবং মিস্টার কুপার করবেন ঠিক তার উল্টো। ওই যে, জোয়ান সেদিন বললো, মিসেস সাদা বললে মিস্টার বলেন কালো।'

'এবং রাগলে র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে খারাপ হয়ে যান,' যোগ করলো রবিন।

চুপ করে এক মুহূর্ত রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিশোর। 'অ্যাঁ!'

'কি হলো?'

'কি যেন বললে?'

'না, বললাম, রাগলে র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে খারাপ হয়ে যান মিস্টার কুপার।'

'এই, ছেলেরা,' সিঁড়ির গোড়ায় জোয়ানের ডাক শোনা গেল। 'খাবার দেয়া হয়েছে। খেতে এসো।'

রান্নাঘরে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

বাটিতে বাটিতে সুপ ঢেলে দিচ্ছে জোয়ান। গরম বিসকুটের প্লেটগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে জেনি।

'তোমরা তো ছিলে ওখানে,' ছেলেদের দেখে বললো জেনি। 'বলো ওদেরকে কি শুনেছো। আমার কথা তো বিশ্বাসই করতে চায় না।'

ড্যাম সানের পাশে বসলো কিশোর। সানের অন্য পাশে বোরিস। কাপলিং আর ব্যানার বসেছে আরেক দিকে।

'মেসেজ এসেছে মিস্টার এবং মিসেস কুপারের জন্যে,' বললো কিশোর। 'একটা স্পেসশিপ থেকে। পৃথিবীকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে এখন ওটা।'

মুসা আর রবিন বসলো। ওদের সামনে সুপের বাটি রাখলো জোয়ান। 'আমি হলে এসব কথা কাউকে বলতাম না। শ্রমিকদের তো নয়ই। এমনিতেই ভয়ে আধমরা হয়ে আছে ওরা।'

'ছেলেমানুষ নয় ওরা, জোয়ান,' বললো সান। 'জানার অধিকার আছে ওদের।' চামচ তুলে নিয়ে সেটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার রেখে দিলো ফোরম্যান। 'বাঁধের কাছ থেকে সমস্ত পাহারা সরিয়ে আনার হুকুম দিয়েছেন মিস্টার

কুপার। কড়া আদেশ দিয়ে দিয়েছেন, কেউ যেন ওখানে না থাকে।'

কেউ কোনো মন্তব্য করলো না।

'পাগলামি!' আবার বললো সান। 'এইমাত্র কথা হলো তাঁর সঙ্গে। তিনি চান না কেউ ওখানে থাকুক। তারপর এসে জোয়ানের কাছে শুনি এই কথা। পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায়ই মরবো আমরা। কাজেই হুঁশিয়ার থাকা উচিত আমাদের। বাঁচার চেষ্টাটুকু অন্তত করা উচিত।'

'ড্যাম,' জোয়ান বললো, 'মেসেজের কথা শুনলে সবাই আতঙ্কিত হয়ে যাবে।'

'এমনিতেও আতঙ্কিত হয়ে আছে। গিয়ে বোঝানো উচিত, কেউ যেন ছোটাছুটি না করে, এখান থেকে পালানোর চেষ্টা না করে। এখানে খাবার আছে, না খেয়ে মরবে না। উঁচু জায়গা আছে, পানি উঠলে ডুবে মরবে না।' কিশোরের দিকে তাকালো ফোরম্যান। 'জেনি বলছিলো, স্পেসশিপ এসে নাকি মিস্টার এবং মিসেস কুপারকে তুলে নিয়ে যাবে।'

মাথা ঝোকালো কিশোর। 'রাত দশটায়। নিজেদের কয়েকজনকেও নাকি নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো ওরা, তাদেরকেও তুলে নেবে। তারাই বোধহয় আজ সকালে হামলা চালিয়েছিলো আমাদের ওপর। ওরা নেমেছে, র‍্যাঞ্চো কুপারের কেউ যেন বাইরে যেতে না পারে সেটা দেখার জন্যে। বাইরের কোনো শহরে গিয়ে যাতে খবর দিতে না পারে।'

এক চামচ সুপ তুলে মুখে ফেললো কিশোর। গিলে নিয়ে বললো, 'ওরা নামার সময় জনতার ভিড় থাকুক ওখানে, শিপে ওঠার জন্যে হুড়াহুড়ি করুক, এটা নিশ্চয় চায় না।'

'শুধু কুপারদের তুলে নিয়ে যাবে, এই তো?'

'আর কারও নামতো বলিনি।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করলো ফোরম্যান। 'হাসবো কিনা বুঝতে পারছি না। কুপারদেরকে চাইবে কেন ওরা? কুপাররা জিনিয়াস নয়। বড় ধনী, ব্যস। কেয়ামতের দিনও কি তাহলে ধনীদেরই কদর বেশি হবে নাকি?'

'শয়তানী,' বলে উঠলো কাপলিং। 'রসিকতা করছে কেউ আমাদের নিয়ে। ইচ্ছে করলেই রেডিও ব্রডকাস্টিঙে বাধা সৃষ্টি করা যায়, নতুন ব্রডকাস্ট করাও যায়। সেটা এমন কোনো ব্যাপার না। জোয়ানের ভাই এখন এখানে থাকলে খুব ভালো হতো। রেডিও এক্সপার্ট তো, অনেক কিছুই বলতে পারতো।

জবাব দিলো না জোয়ান। শুধু বিকৃত কড়ে আঙুলওয়ালা হাতটা উঠে গেল গলার কাছে।

'আচ্ছা, রসিকতাই বা করবে কেন?' বললো জনি। 'কেন করতে যাবে এতো

ঝামেলা, টাকা খরচ?'

'হয়তো মিস্টার কুপারের কোনো শত্রু,' বললো ব্যানার। নিচু, শান্ত কণ্ঠ। 'ধনী লোকের শত্রু থাকেই। কিন্তু আরও একটা কথা, সত্যি কি কোনো স্পেসশিপ আসতে পারে না? বহুদূরের কোনো গ্রহ থেকে? পারে। যে ধ্বংসের কথা বলা হচ্ছে তা-ও ঘটতে পারে। অতীতে বহুবার পৃথিবীর আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে আমরা জানি। আরও একবার পরিবর্তন হতেই পারে। আবার ফিরে আসতে পারে বরফযুগ, কিংবা মেরুর বরফ গলে গিয়ে পানিতে সয়লাব হয়ে যেতে পারে সমস্ত দুনিয়া। তা-ই যদি ঘটে কি করবো আমরা তখন? কোটি কোটি লোকের তো একই সমস্যা হবে। তখন যদি স্পেসশিপ আসে তুলে নিতে, ক'টা আসবে? ক'জনকে তুলে নেবে? যদি সেই ভাগ্যবানদের মাঝে আমাকেও একজন ধরা হয়, বলা হয়, এসো; আমি যাবো না। কোথায় যাবো? পরিচিত এই জন্মভূমি ছেড়ে আরেক দুনিয়ায়, সব কিছুই যেখানে অপরিচিত। সূর্যটা হয়তো অন্য রকম, এখানকার মতো চাঁদ উঠবে না ওখানকার আকাশে, হয়তো ঘাসের রঙও সবুজ না। না ভাই, আমি যাবো না, এখানেই থাকবো। মরলে মরবো।' বক্তৃতা থামালো চাষীদের সর্দার।

'আর কিছুই যদি না ঘটে?' প্রশ্ন রাখলো সান। 'যদি স্পেসশিপ না আসে? আজকের কথা বলছি আমি।'

'তাহলে রসিকতা ছাড়া আর কি?'

নীরবে খেয়ে চললো এরপর সবাই। খাওয়া বলতে, তিন গোয়েন্দা খাচ্ছে, বোরিসও। অন্যেরা খালি খুঁটছে। জেনি আর জোয়ান তো প্রায় কিছুই মুখে তুললো না।

খাওয়া শেষে বাইরে বেরোলো তিন কিশোর। কুপারদের ঘরের জানালার দিকে তাকালো। খুলে গেল জানালাটা, বেরিয়ে এলো মিসেস কুপারের মুখ। বললেন, 'সামনে দিয়ে ঢোকো।'

তা-ই করলো ছেলেরা। বারান্দায় লোহার চেয়ারে বসে আছেন কুপার।

'গুড ইভনিং মিস্টার কুপার,' বললো কিশোর।

ভুরু কোঁচকালেন শুধু তিনি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো গোয়েন্দাপ্রধান, পেছনে তার দুই সহকারী। 'মিস্টার কুপার, আজ যা যা ঘটেছে...'

'ইয়াং ম্যান,' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিলেন না কুপার, 'যা বলার তখনই বলে দিয়েছি তোমাকে।' উঠে চলে গেলেন ঘরে।

খানিক পরে বারান্দায় বেরোলেন মিসেস কুপার। একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'বসো তোমরা।'

বসলো সবাই।

'বার্ট কেন কিছু শুনতে চায় না জানো?' বললেন মিসেস কুপার, 'ও মনস্থির করে ফেলেছে, যাবে। আমাকেও নিয়ে যাবে।' পরনের সবুজ সোয়েটার আর স্কার্ট দেখালেন। 'এগুলো বদলে ফেলতে বললো। দূরের যাত্রায় এসব স্কার্ট–ফার্ট নাকি সুবিধে হবে না। স্ল্যাকস অনেক ভালো।'

হাসলো কিশোর। 'আর কি কি ভাবে তৈরি হচ্ছেন? সঙ্গে কি নেবেন ঠিক করলেন আপনার স্বামী? কি বাঁচাতে চান?'

'ও বললো, ওর জিনিসপত্র অন্ধকারে গুছিয়ে নেবে।'

'তাই নাকি?' বলতে বলতে চেয়ারের পেছনে হাত নিয়ে গেল কিশোর। হেলান দেয়ার জায়গার ওপাশে ওপরের দিকে একটা গর্তো মতো লাগলো আঙুলে। কৌতূহল হলো। উঠে এসে দেখলো ভালো করে। মাটির 'ব্যাংকে' পয়সা ফেলার যেমন ছিদ্র থাকে, অনেকটা সেরকমই ছিদ্র। তবে আরেকটু বড়।

'বিচ্ছিরি, না?' বললেন মিসেস কুপার। 'সবগুলো চেয়ার টেবিলের মধ্যে আছে ওরকম। টেবিলগুলোতে তো কয়েকটা করে। বানানোর খুঁত।'

ঘুরে এসে আবার চেয়ারে বসলো কিশোর। 'মিসেস কুপার, এই যে যাওয়াটা, এটাকে বিপজ্জনক মনে করছেন না আপনার স্বামী? একবারও কি ভাবেননি, তাঁকে ফাঁদে ফেলার একটা কায়দা বের করেছে কিছু শয়তান লোক?'

'মানে?'

'আমরা এখন এখানে বন্দি হয়ে আছি, মিসেস কুপার। চাইলেও আমাদেরকে বেরোতে দেয়া হবে না এখান থেকে।'

কিশোরের কথার সমর্থনে মাথা ঝাঁকালো রবিন আর মুসা।

'কেন?' শান্ত থাকতে পারলেন না আর মিসেস কুপার। 'কারা ওরা? কি চায়?'

'গেট আগলে বসে আছে যারা, তারা। এবং আরো কিছু লোক। মিস্টার কুপারের সোনার ওপর চোখ পড়েছে তাদের।'

সামনের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন মিস্টার কুপার। স্ত্রীর অস্বস্তিভরা চাহনি দেখে হেসে আশ্বস্ত করলেন। তাঁর পাশে বসতে বসতে বললেন, 'জেলডা, নিশ্চয় বুঝতে পারছো, আমিও শুনবো এখন ওদের কথা। কিশোর, সোনার কথা কি যেন বললে?'

'হ্যাঁ, স্যার, বলছি। দেখুন, আপনি ব্যাংক বিশ্বাস করেন না, জমি আর সোনা ছাড়া আর কোনো কিছুর ওপর ভরসা করেন না। জমি কেনার পর আপনার টাকা যা অবশিষ্ট ছিলো, সব দিয়ে সোনা কিনে আপনি এই র‍্যাঞ্চেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবলেই এটা বোঝা যায়।'

'বার্ট!' স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস কুপার। 'এখানে সোনা রেখেছো? কই,

কোনোদিন তো বলোনি?'

'ওটা তোমার জানার দরকার ছিলো না, তাই বলিনি।'

'ষড়যন্ত্রকারীরাও এটা বুঝেছে,' আবার বলে গেল কিশোর। 'ওরা জানে সোনাগুলো এখানেই আছে, কিন্তু কোথায় আছে জানে না। তাই এক অদ্ভুত কৌশল করেছে। ফ্লাইং সসারের খেল দেখিয়ে সোনাগুলো বের করে নেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এবং বলা যায়, সফল হতে চলেছে ওরা।'

লম্বা দম নিলেন মিস্টার কুপার। 'হ্যাঁ, আরেকটু হলেই হয়ে যাচ্ছিলো। গাধা প্রায় বানিয়ে ফেলেছিলো আমাকে। সোনা নিয়েই স্পেসশিপে চড়তে যেতাম আমি।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তবে এইবার ওরা টের পাবে। নাক টিপলে দুধ বেরোয়, ওরকম একটা ছেলে মিলিটারি সেজে এসে···দেখাবো মজা!'

'হ্যাঁ, তা পারতেন, স্যার,' বললো কিশোর, 'যদি আপনার সব লোকই বিশ্বাসী হতো।'

'বিশ্বাসী?' জ্বলে উঠলো কোটিপতির চোখ। 'কি বলতে চাও?'

'স্পাই আছে আপনার এখানে। এখানকার সমস্ত খবরাখবর বাইরে পাচার করে দিচ্ছে।'

'আজ দুপুরে চুরি করে বেরিয়ে গিয়েছিলাম আপনার সীমানা থেকে,' কি করে বেরিয়েছিলো, সংক্ষেপে জানালো রবিন। তারপর বললো, 'তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছি। আপনি যে অন্য গ্রহে যেতে রাজি হয়ে যাবেন, এ-ব্যাপারে ওরা শিওর। ফিল্ড টেলিফোনে কার সঙ্গে জানি কথা বললো লেফটেন্যান্ট, বোধহয় স্পাইটার সঙ্গে। আপনি যে দুপুরের খাওয়ার পর র‍্যাঞ্চে ঘুরতে বেরিয়েছেন, সেটা জানানো হলো লেফটেন্যান্টকে।'

'ফিল্ড টেলিফোন? কাজ নাকি করে না। আরও আগে জানালে না কেন আমাকে?'

'জানাতে তো চেয়েছিলাম,' বললো কিশোর, 'আপনি শুনতে চাইলেন না।···যা-ই হোক, ষড়যন্ত্রকারীরা এতোটা এগিয়ে এখন আর সহজে পিছাতে চাইবে না। যা নিতে এসেছে, নেয়ার চেষ্টা ওরা করবেই। সেটা ঠেকাতে হবে। আর ইতিমধ্যে জানার চেষ্টা করতে হবে, স্পাইটা কে?'

'কিভাবে?'

'যেভাবে যা করতে যাচ্ছিলেন, তা-ই করবেন। ওদের বুঝতে দেয়া চলবে না যে আমরা বুঝে গেছি।'

'হুঁ, দাঁড়াও, আসছি,' উঠে ঘরে চলে গেলেন মিস্টার কুপার। খানিক পরে ফিরে এসে জানালেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। একটা বন্দুকও রাখেনি। দরজাটা কেউ খুলে রেখেছিলো। সব নিয়ে গেছে। এইবার সত্যি সত্যি বিপদে পড়লাম!'

ষোলো

রাত ন'টার কিছু পরে। চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে বোরিস আর মুসা। র‍্যাঞ্চহাউসের উত্তরে, বাঁধের কাছের তৃণভূমিতে।

'বুঝতে পারছি না,' বললো বোরিস। 'সবই যখন জানা গেছে, স্পেসশিপে চড়ার জন্যে আবার কেন যেতে চাইছেন মিস্টার কুপার। শিপই তো আসছে না।'

'ওরা তাঁর সঙ্গে চাতুরি করেছে, এবার উনি ওদের সঙ্গে চাতুরি করবেন। এটা কিশোরের বুদ্ধিতে।'

'ওর অনেক বুদ্ধি। আমাদের সঙ্গে এলো না কেন?'

'র‍্যাঞ্চের লোকের ওপর চোখ রাখতে চায়। দেখতে চায়, কুপাররা চলে আসার পর কে কি করে।'

'ও এলে ভালো হতো।'

'হতো। আমাদেরকে যা যা করতে বলেছে, তা করলেও খারাপ হবে না। তৃণভূমির ওপরে উঠে লুকিয়ে থাকবো। মিস্টার কুপার একটা খেলা দেখাবেন। তারপর আপনি আর মিসেস কুপার পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাবেন ওপাশে, পুলিস আনতে। সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো?'

'আছে। আচ্ছা, মিসেস কুপার পাহাড় পেরোতে পারবেন?'

'বললেন তো পারবেন। পাহাড়ে চড়ার নাকি অভ্যাস আছে তাঁর।'

বাঁধের নিচে খেতের ধারে চলে এসেছে ওরা। চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় রূপালি লাগছে সবুজ ঘাস। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে গভীর ছায়া, ওগুলো খাদ আর খাঁজ।

বাঁধের পাশ ঘুরে ওপরে উঠতে শুরু করলো দু'জনে।

মেঘের মতো সাদা কুয়াশায় ছেয়ে আছে ওপরের তৃণভূমি।

কুয়াশার ভেতরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা ঝোপ বের করলো মুসা। দু'জনে লুকিয়ে বসলো ওটার আড়ালে।

সময় কাটছে খুব ধীরে।

মনে হলো, দীর্ঘ কয়েক যুগ পর কথা শোনা গেল বাঁধের নিচে।

ভালো দেখা যায় না। কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবছামতো চোখে পড়লো মুসার, টর্চের আলো। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো। উঠে আসছেন মিস্টার এবং মিসেস কুপার।

মুসা আর বোরিস যেখানে লুকিয়েছে, তাদের কয়েক হাত সামনে দিয়েই চলে গেলেন দু'জনে। মুসা দেখলো, মিস্টার কুপারের বগলের তলায় বড় একটা পুঁটুলি। তাঁর

পাশে শান্ত পায়ে হাঁটছেন মিসেস, হাতেও বড় আরেকটা পুঁটুলি।

দশ মিটার মতো এগিয়ে থামলেন দু'জনে। কুয়াশায় ঘিরে রেখেছে।

'যদি না আসে?' জোরে জোরে বললেন মিসেস কুপার।

'আসবেই। ওরা কথা দিয়েছে।'

হঠাৎ জ্বলে উঠলো উজ্জ্বল নীল—সাদা আলো।

চমকে উঠলেন মিসেস কুপার। স্বামীর কাছ ঘেঁষে এলেন।

পাহাড়ের চূড়াটা যেন জ্বলছে। কুয়াশাকে চিরে ফালা ফালা করে ধোঁয়া বানিয়ে রাতের আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছে যেন সেই আগুন।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো বোরিস। ইশারায় মুসাকে দেখালো। গোল কিছু একটা নেমে আসছে উপত্যকায়, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে। ক্ষণিকের জন্যে চূড়ার আগুন আড়াল করে দিলো ওটা। আরেকটু নামতেই জিনিসটার গায়ে প্রতিফলিত হলো আগুন, চকচক করে উঠলো ওটার রূপালি শরীর।

'স্পেসশিপ!' ফিসফিসিয়ে বললো বোরিস।

'শ্‌শ্‌!' চুপ করতে বললো মুসা।

মাটিতে নামলো বিরাট গোল জিনিসটা। যেমন জ্বলেছিলো, তেমনি হঠাৎ করেই নিভে গেল নীল আগুন।

কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটলো না। তারপর দেখা গেল দুটো মূর্তি, এগিয়ে আসছে। পরনে স্পেসসুট, মাথায় হেলমেট। একজনের হাতে একটা টর্চ, নীল আলো বেরোচ্ছে ওটা থেকে।

কুয়াশা অনেক হালকা হয়েছে। মুসা দেখলো, মূর্তি দুটো কুপারদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'আলবার্ট কুপার?' স্পষ্ট শোনা গেল কথা। 'জেলডা কুপার?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন কুপার। 'ও আমার স্ত্রী।'

'যাওয়ার জন্যে তৈরি? সংগে জিনিসপত্র এনেছেন?'

'একটাই জিনিস এনেছি আমি, যেটা আমার কাছে অমূল্য,' জবাব দিলেন মিস্টার কুপার। হাতের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বললেন, 'দ্য ডাংকি।'

'কী!'

'দ্য ডাংকি। বইয়ের নাম, যেটা আমি এখন লিখছি। আমেরিকার সরকারী লোকদের নিয়ে লিখছি, ওদের সম্পর্কে আমার যা ধারণা, তা বিষদভাবে তুলে ধরা হবে এ-বইতে। আশা করি, ওমেগাতে গিয়ে বইটা শেষ করার সুযোগ পাবো। ভালোই হলো। এখানে তো কাজের চাপে লেখারই সময় পাই না।'

'শুধু এই?' ওমেগাবাসীর গলা যেন সামান্য কেঁপে উঠলো।

হাসি চাপতে কষ্ট হলো মুসার।

'হ্যাঁ, এই তো,' বললেন মিস্টার কুপার। 'আমার স্ত্রীও তার পছন্দের জিনিস নিয়ে এসেছে।'

পুঁটুলিটা দেখালেন মিসেস কুপার। 'দুটো ছবি আছে এতে, আমার ছেলেদের আঁকা। আর আমার বিয়ের পোশাক। ফেলে আসতে পারলাম না, কিছুতেই মন মানলো না।'

'ও,' বললো মহাকাশের আগন্তুক। 'বেশ। আসুন।'

যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে ফিরে হাঁটতে শুরু করলো মূর্তি দুটো। তাদের পেছনে চললেন স্বামী-স্ত্রী।

মুসা আর বোরিস দেখলো, এগিয়ে যাচ্ছে চারটে মূর্তি।

কয়েক পা এগিয়েই থামলো স্পেসসুটধারীরা। যার হাতে টর্চ, সে সরে দাঁড়ালো একপাশে। চকিতে ঘুরলো অন্য লোকটা। হাত উদ্যত!

এ--রকম দৃশ্য টেলিভিশনে অসংখ্যবার দেখেছে মুসা।

পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে স্পেসসুটধারী। 'খবরদার! নড়বে না।'

বড় গোল বস্তুটার দিকে এগিয়ে গেল টর্চ-হাতে লোকটা। নিচু হয়ে কি জানি কি করলো। হঠাৎ পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলে উঠলো আবার আগুন। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে শুরু করলো আবার ফ্লাইং সসার। গতি বাড়ছে; দ্রুত, আরও দ্রুত উঠে হারিয়ে গেল চূড়ার ওপরের আকাশে।

নিভে গেল নীল আগুন। আবার শুধু রূপালি জ্যোৎস্না তৃণভূমিতে।

'বাজি পোড়ালে না?' বললেন মিস্টার কুপার। 'আমার লোকেরা ভাববে আমি চলে গেছি। সৈন্যরা ভাববে এবার স্বচ্ছন্দে র‍্যাঞ্চে ঢোকা যায়।'

এক হাতে হেলমেট সরালো পিস্তলধারী। অতি সাধারণ চেহারার একজন মানুষ। মাথায় লম্বা চুল। 'সংগে সোনাগুলো নিয়ে এলেই ভালো করতে। যাকগে। পাবো শেষ পর্যন্ত।'

জবাব দিলেন না মিস্টার কুপার।

এক পা এগোলো লোকটা। পিস্তলটা আরও সামনে বাড়িয়ে ধরে বললো, 'দেরি করা যাবে না। এমনিতেই অনেক সময় নিয়েছি। এখন ঝটপট বলে ফেলো তো কোথায় রেখেছো?'

ভয়ার্ত শব্দ করে উঠলেন মিসেস কুপার।

'বলো,' আবার বললো পিস্তলধারী। 'অন্তত স্ত্রীর স্বার্থে মুখ খোলো। কোথায় রেখেছো সোনাগুলো?' পিস্তলটা মিসেস কুপারের কপাল বরাবর ধরলো সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কুপার। 'ভেবেছিলাম, কেউ জানবে না। জেনেই গেল। কি

আর করা? টাকার চেয়ে জীবন বড়। হ্যাঁ, শোনো। ওগুলো মাটির নিচের ঘরে, আমাদের বড় বাড়িটার।'

এগিয়ে এসে দ্বিতীয় লোকটাও সব শুনছিলো। ঘুরে, সরে গেল একপাশে। এক ধরনের ঝনঝন শব্দ হলো, অনেকটা কলিংবেলের মতো।

'বাহ্!' বললেন মিস্টার কুপার। 'ফিল্ড টেলিফোন।'

জবাব দিলো না পিস্তলধারী। দাঁড়িয়ে রইলো একভাবে।

'সংগে আনেনি,' শোনা গেল দ্বিতীয় লোকটার কথা। 'হ্যাঁ, বলছে বড় বাড়িটার মাটির নিচের ঘরে।'

ফিরে এলো দ্বিতীয় লোকটা।

মুসা বুঝলো, কোনো বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে টেলিফোন সেটটা।

'সোনাগুলো পাওয়া গেলে বেঁচে যাবে,' হুমকি দিলো পিস্তলধারী। 'নইলে তোমাকে আর তোমার বউকে শুদ্ধ পুঁতে ফেলবো ওই ঘরে মাটির তলায়।'

'তাই নাকি?' বলতে বলতে, নড়ে উঠলেন মিস্টার কুপার। এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিলেন মিসেস কুপারকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেল পিস্তলধারী, দ্বিধা করলো এক মুহূর্ত।

গর্জে উঠলো পিস্তল।

চেঁচিয়ে উঠলো লোকটা। হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল।

'নড়বে না!' ধমক দিলেন কুপার। তাঁর বাড়ানো হাতে আরেকটা পিস্তল। 'জেলডা, ওটা তুলে নাও।'

কুপারের কথা শেষ হওয়ার আগেই মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিলেন মিসেস কুপার।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো লোকটা, একটু আগে যে কুপারকে শাসাচ্ছিলো। আহত হাতটা আরেক হাতে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলো।

'পিস্তল পেলে কোথায়? সব তো সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো,' জিজ্ঞেস করলো টর্চ-ধারী।

'আমার বাবার পিস্তল,' জানালেন মিস্টার কুপার। 'সব সময় বালিশের তলায় রাখি। অস্ত্রাগার লুট করেছে তোমার সংগীসাথীরা, এটার কথা জানেই না।'

গলা চড়িয়ে ডাকলেন কুপার, 'মুসা। বোরিস।'

সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। এগিয়ে গেল।

'দু'জনই মনে হচ্ছে,' বললেন কুপার। 'আরও থাকলে এতোক্ষণে হাজির হয়ে যেতো।' স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। 'জেলডা, পাহাড় পেরোতে পারবে তো?'

'পারবো। আগে ওর হাতটা বেঁধে দিই। বার্ট, রুমালটা দাও তো। আমি জানি, তোমার কাছে পরিষ্কার রুমাল আছে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুমাল বের করে দিলেন কুপার।

আহত লোকটার জখমি হাত বেঁধে দিলেন মিসেস কুপার।

ইতিমধ্যে অন্য লোকটার হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে টেলিফোন সেটটা খুঁজতে গেছে মুসা। যা অনুমান করেছিলো, ঠিকই। পাওয়া গেল একটা পাথরের আড়ালে। টেনে অনেকখানি তার ছিঁড়ে নিয়ে এলো। সে আর বোরিস মিলে শক্ত করে হাত–পা বাঁধলো ডাকাত দুটোর।

স্বামীর পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে নিজের কোমরের বেল্টে গুঁজলেন মিসেস কুপার। বোরিসের দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'এসো, যাই। পেরোতে পারবে তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো বোরিস।

দক্ষ পর্বতারোহীর মতো পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলেন মিসেস কুপার। তার পেছনে থাকতে বোরিসেরই বরং কষ্ট হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে মুসা আর কুপার।

অনেক সময় লাগলো খাড়া চূড়ায় উঠতে। তারপর ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জনে।

'সাংঘাতিক মহিলা,' গর্ব করে বললেন কুপার। 'আমার স্ত্রী।' ঘাসের ওপর পড়ে থাকা দুই 'ভিনগ্রহবাসীর' দিকে তাকালেন একবার। মুসাকে ডাকলেন, 'এসো, যাই। সারারাত এখানে থাকার কোনো মানে হয় না।'

সতেরো

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে শেট মরটন। হাতের রাইফেলটা আকাশমুখো করে গুলি ছুঁড়লো।

'যার যার ঘরে ঢোকো!' চেঁচিয়ে আদেশ দিলো সে। 'জলদি। দুই মিনিট সময় দিলাম।'

পাহাড়ের ওপরে আগুন দেখার জন্যে শ্রমিকেরা যারা বেরিয়েছিলো, ঘরে ঢুকে পড়লো আবার। কটেজের দরজা বন্ধ করে দিলো।

র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকলো মরটন।

কর্মচারীরা সব রান্নাঘরে রয়েছে, রবিন আর কিশোরও ওখানে। দরজার কাছে চেয়ারে বসেছে ব্রক, হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি ফেলে রেখেছে একটা রাইফেল।

জেনি এজটার আর জোয়ান মারটিংগেলের দিকে তাকালো মরটন। টেবিলের কাছে বসে আছে দু'জনে, কোলের ওপর হাত। ওদের পাশে চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা এক পাশে কাত করে বসেছে ড্যাম সান। কাপলিং আর ব্যানার বসেছে আরেকটু দূরে, উত্তেজিত। টেবিলের এক মাথার কাছে বসেছে রবিন আর কিশোর।

'আরেকটা ছেলে কোথায়? ছিলো না আরেকটা?' বললো মরটন। কিশোরের দিকে চেয়ে ভুরু নাচালো। 'এই, তোমার দোস্ত কোথায়?'

'জানি না। খানিক আগে বেরিয়ে গেছে। আসছে তো না।'

সন্দেহ ফুটলো মরটনের চোখে।

'ছেলেটা নেই এখানে,' রক জানালো। 'ওপরতলায়ও খুঁজে এসেছে বেন। আমি যাবো? ছাউনিতে গিয়ে দেখবো?'

'দরকার নেই। পালালেও বেশি দূর যেতে পারবে না। এদেরকে আটকে রাখো, তাতেই চলবে,' টেবিলের ধারে বসা মানুষগুলোকে দেখালো মরটন। 'কেউ কিছু করার চেষ্টা করলেই গুলি চালাবে।'

বেরিয়ে এলো সে। বাইরে পাহারারত অস্ত্রধারী দ্বিতীয় লোকটাকে কিছু বললো। তারপর চলে গেল বড় বাড়িটার দিকে।

র‍্যাঞ্চহাউসের রান্নাঘরে বসে ঘড়ি দেখলো কিশোর। সাড়ে দশটা প্রায় বাজে। পাহাড় চূড়ায় আগুন দেখা গিয়েছিলো বিশ মিনিট আগে। অনুমান করলো, মাঝরাতের আগে সাহায্য আসবে না। লম্বা সময়। দীর্ঘ স্নায়ু-টানটান-অপেক্ষার অনেকগুলো বিরক্তিকর মুহূর্ত।

চেয়ারে হেলান দিয়ে কান পেতে রইলো সে। বড় বাড়িটার নিচের ঘরে ধুপধাপ, আর ভাঙাচোরার আওয়াজ এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। রক আর বেন ছাড়া আরও তিনজনকে সংগে এনেছে মরটন। নিশ্চয় ওরাও গিয়ে নিচের ঘরে ঢুকেছে। সোনা খুঁজছে ট্রাঙ্ক আর বাক্সের ভেতর।

মুখে হাত দিয়ে হাসি ঢাকলো কিশোর।

অনেক সময় লাগবে ওদের। বাক্স আর ট্রাঙ্কে খোঁজা শেষ করে নিশ্চয় কাঠের গাদা সরাবে। কয়লার স্তূপের নিচে খুঁজবে।

অনেকক্ষণ ধরে নানারকম শব্দ হলো। তারপর শুরু হলো ভারি ধুমধুম আওয়াজ। গাঁইতি দিয়ে মেঝের সিমেন্ট ভাঙা হচ্ছে, মাটির তলায় খুঁজবে।

পাঁচ মিনিট...দশ...অবশেষে থামলো গাঁইতির কোপ। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল খন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো রক। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালো।

মাটি খোঁড়ার আওয়াজ থামলো। ধুড়ুস করে বিকট এক শব্দ। ঠেলে কাঠের স্তূপ

নিশ্চয় মেঝেতে ফেলেছে।

আবার গাঁইতির শব্দ। কাঠের গাদা সরিয়ে ওখানকার সিমেন্ট ভাঙা হচ্ছে।

তারপর আবার খন্তা দিয়ে মাটি খোঁড়ার পালা।

দেড় ঘন্টা। ঘড়ি দেখে হিসেব করলো কিশোর। দেড় ঘন্টা আগে পাহাড় চূড়ায় আগুন দেখা গিয়েছিলো।

শুরু হলো অন্য রকম শব্দ। কয়লা সরাচ্ছে।

আবার গাঁইতি…তারপর খন্তা…

দু'ঘন্টা পেরোলো।

নিচের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মরটন। রান্নাঘরে ঢুকলো। ঘাম চুপচুপে শরীর, হাতে–মুখে–কাপড়ে কালি ময়লা, কাঁধের কাছে এক জায়গায় শার্ট ছেঁড়া, লম্বা চুল এসে পড়েছে মুখের ওপর, ঘামে ভিজে কপালের সংগে লেপ্টে রয়েছে কয়েক গোছা। কোমরে ঝোলানো পিস্তলের খাপে হাত রেখে রকের দিকে চেয়ে বললো, 'ফাঁকি দিয়েছে। মিছে কথা। ওখানে নেই। যাচ্ছি, কুপার ব্যাটার ছাল ছাড়াবো গিয়ে। সত্যি কথা বের করে ছাড়বো মুখ দিয়ে।'

'হাতের দস্তানা সরান না কেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'সব সময়ই দেখি পরে থাকেন?'

ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরলো মরটন। চোখের তারায় অস্বস্তি।

'শীত নেই কিছু নেই,' আবার বললো কিশোর; 'এটা দস্তানা পরে থাকার সময় নয়। কিন্তু না পরলেও চলে না, তাই না?'

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েও কিশোরের পরের কথাটা শুনে থমকে গেল মরটন।

'অনেক ভেবে, বুদ্ধি করে সাজিয়েছেন সব কিছু,' কিশোর বললো। 'তবে আপনাদের পরিকল্পনার কাঁচামাল সব এখানে মজুদই ছিলো। একজন মহিলা, যিনি বিশ্বাস করেন উদ্ধারকারীরা আসবে, তাই আপনারা বানিয়েছেন স্পেসশিপ। একজন মানুষ, যিনি বিশ্বাস করেন ভয়ানক কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে বর্তমান সভ্যতা, তাঁর সেই বিশ্বাসে ইন্ধন জুগিয়েছেন। রেডিও জ্যাম করে দিয়েছেন। সি বি ট্র্যান্সমিটার ব্যবহার করেছেন, না? কোথায় লুকিয়েছেন ওটা? কোনো পাহাড়ের চূড়ায়?

'যাই হোক, রেডিও সিগন্যাল জ্যাম করে দিয়ে সব ক'টা টেলিভিশনের অ্যান্টেনার তার কেটেছেন, টেলিফোনের তার কেটেছেন, বিদ্যুতের তার কেটেছেন। বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন এই র‍্যাঞ্চকে।'

'এই, শেট,' অধৈর্য হয়ে বললো রক, 'যাও না। ওর বকর বকর শুনছো। দেরি করিয়ে দিচ্ছে তো।'

দরজার দিকে পা বাড়ালো মরটন।

'দস্তানা খুলবেন না, লেফটেন্যান্ট?' আবার ডাকলো কিশোর।

থেমে গেল মরটন। কিশোরের চোখে কি যেন খুঁজছে।

'চমৎকার সাজিয়েছেন শেট,' বললো কিশোর। 'অদ্ভুত সব ঘটনা দেখে এসেছেন, এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিলেন সেদিন। দারুণ অভিনয়। আলবার্ট কুপারের ভয়ে ভীত, তোতলাচ্ছিলেন, আবার ওদিকে ওপরঅলার আদেশও পালন করছিলেন। সত্যি প্রশংসা করার মতো।

'বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলেন মিস্টার কুপারের মতো লোককেও। পাহারা পাঠিয়ে দিলেন কুপার। ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টিতে না বুঝে আপনাদের সহযোগিতা করে বসলেন তিনি।

'তারপর পাহাড়ের চূড়ায় নীল আগুন, স্পেসশিপ। তৃণভূমিতে মেষপালকের বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা, পোড়া চুল। শিপটা কি দিয়ে বানিয়েছেন? হিলিয়াম গ্যাস ভরা বেলুন নিশ্চয়? ডা পঞ্চো আসলেই ভেড়াগুলোকে দেখতে গিয়েছিলো, সুবিধে করে দিয়েছিলো আপনাদের। আপনার লোকেরা তাকে পিটিয়ে বেহুঁশ করলো, চুল পুড়িয়ে দিলো। দেখে মনে হলো, রকেটের আগুনের আঁচে বেচারার চুল ঝলসে গেছে। আহা। তারপর ভিনগ্রহবাসীদের আগমনের সাক্ষাৎ প্রমাণ দিলো আপনার লোক, আমাদের মেরে বেহুঁশ করে, আজ সকালে। একেবারে স্পেসসুট পরে এসেছেন।

'মিস্টার কুপারকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন, উদ্ধারকারীরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। তিনি সেটা বিশ্বাস করেছেন। ভেবেছিলেন, সংগে করে সমস্ত সোনা নিয়ে যাবেন, কিন্তু তিনি নেননি। বড় হতাশ করা হলো আপনাদেরকে।'

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন মরটন। চোয়াল কঠিন, দৃষ্টি শীতল। 'সোনা? সোনার কথা কি জানো তুমি?'

'আপনি যতোখানি জানেন, ততোখানি। ব্যাংককে বিশ্বাস করেন না মিস্টার কুপার, তাই তাঁর সব টাকা দিয়ে সোনা কিনে এই র‍্যাঞ্চেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। ভালো কল্পনাশক্তি থাকলে যে কেউ বুঝে নিতে পারে এটুকু। এরপর আপনার একজন স্পাইয়ের দরকার হলো। এই দুর্গের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-খবর পাচারের জন্যে। স্পাই পেতে অসুবিধে হলো না। আপনার খুব নিকট আত্মীয়, তাই না লেফটেন্যান্ট? এমন একজন, যে আপনার মতো করেই বলেঃ রাগলে র‍্যাটলস্নেকের চেয়ে খারাপ হয়ে যায় মিস্টার কুপার। এমন একজন, যার হাতের কড়ে আঙুলও আপনার মতোই, জন্মবিকৃত। ভাই-বোন তো, দু'জনের এরকম হতেই পারে, তাই না মিস জোয়ান?'

রান্নাঘরে স্তব্ধ নীরবতা।

ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকলো জোয়ান। আগুন ঝরলো চোখ থেকে। 'তোমাকে···তোমাকে···'

'না, কিছু করতে পারবেন না,' জোয়ানকে কথা শেষ করতে দিলো না কিশোর। 'কারুরই কিছু করতে পারবেন না আপনি। নিজেকে বাঁচাতেই হিমশিম খাবেন। সে-চেষ্টা অবশ্য আপনি একা করবেন না, এখানে আরও অনেকেই করবে। যাকগে, যা বলছিলাম, এখানকার সব খবর পাচার হতে লাগলো ফিল্ড টেলিফোনের মাধ্যমে। লুকানো আছে সেটটা। কোথায়, মিস জেনি এজটার? ঘোড়ার আস্তাবলে?'

জেনির দিকে চেয়ে হাসলো কিশোর। 'মিসেস কুপার আপনাকে রেডিও নিয়ে বসতে বলেননি, আপনিই নিজের ইচ্ছেয় বসেছিলেন। মিস জোয়ানের রেডিওটা। ওটার ভেতরে একটা খুদে টেপ রেকর্ডার লুকানো আছে, না? মহাকাশের বার্তা আর প্রেসিডেন্টের ভাষণ ওই টেপ থেকেই বেরিয়েছে।'

নিরাসক্ত হয়ে আর বসে থাকতে পারলো না জেনি। ভয় ফুটেছে চোখে। 'আ-আমি এসবের কিছুই জানি না।'

'নিশ্চয়ই জানেন। আপনি আর আমাদের এই লেফটেন্যান্ট, মিস্টার শেট মরটন, দু'জনে বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জোয়ানের ঘরে ছবি দেখেছি, নিউ ইয়ারস ইভ পার্টির সময় তোলা। তাতে একজোড়া তরুণ-তরুণীর নাচের দৃশ্য আছে, মহিলার লম্বা লম্বা চুল, পুরুষটির মুখে দাড়ি। এখানে আসার আগে চুল ছোট করে নিয়েছেন, মিস জেনি, তাই চিনতে দেরি হয়েছে আমার। লেফটেন্যান্টও তার দাড়ি কামিয়ে নিয়েছে।'

'বিচ্ছুটাকে গুলি করবো?' রাইফেলে হাত রাখলো রক।

'করো,' কঠিন কণ্ঠে বললো ড্যাম সান। 'তবে তার আগে আমাদের সবাইকে গুলি করে মেরে নিতে হবে। পাইকারী খুনে হাত রাঙাতে চাও?' জোয়ানের দিকে ফিরলো। 'কি কুক্ষণেই যে তোমাকে চাকরি দিয়েছিলাম। আমার সুপারিশ না হলে···'

'কি আশা করেছিলে?' চেঁচিয়ে উঠলো জোয়ান। 'সারাজীবন পরের বাড়ির বাঁদীগিরি করবো?'

'এতো দিন করতে হয়নি, কিন্তু এবার হবে। বাঁদীগিরি না, আরও খারাপ কাজ করতে হবে ফ্রনটেরার জেলখানায়।'

'কক্ষণো না!' ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো জোয়ান। 'শেট, চলো বেরিয়ে যাই। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে···জলদি করো···'

দূরে এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে আসছে একাধিক গাড়ি।

'কারা আসছে!' উঠে দাঁড়ালো রক।

উঠে একপাশের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। কেউ বাধা দিলো না তাকে। চোখে পড়লো, একটা ছোট ঝোপ থেকে বেরিয়ে পেছন ফিরে বসে থাকা

গার্ডের দিকে চুপি চুপি এগিয়ে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি। গার্ডের পেছনে গিয়ে তার মাথায় কি যেন ঠেকালো। মূর্তিটার চলার ধরন দেখেই বুঝতে পারলো কিশোর, মিস্টার কুপার।

খোয়াবিছানো পথ ধরে ছুটে এলো দুটো গাড়ি।

র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে এসে ব্রেক কষলো। দমাদম খুলে গেল সামনে–পেছনের দরজা। হুড়মুড় করে নেমে এলো অস্ত্রধারী লোকেরা। শেরিফের লোক।

একটা গাড়ির পেছন থেকে নামলেন মিসেস কুপার।

'আরে, তুমি নামলে কেন?' চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করলেন মিস্টার কুপার। 'গোলাগুলি চলতে পারে...'

কিন্তু একটা গুলিও চললো না।

নীরবে ধরা দিলো ষড়যন্ত্রকারীরা। এছাড়া আর কিছু করারও ছিলো না তাদের। গুলি করে পুলিস মারলে, কিংবা আহত করলে শাস্তির পরিমাণ বেড়ে যাবে অনেক বেশি। তার চেয়ে চুপচাপ থেকে কম শাস্তি মাথা পেতে নেয়াটাই ভালো মনে করলো ওরা।

স্ত্রীকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন মিস্টার কুপার। কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন। 'নাহ্, আশা আছে মানব–জাতির। তোমাদের মতো ছেলে যখন আজও জন্মায় এই পৃথিবীতে, বুঝতে পারছি, টিকে যাবে এই সভ্যতা।'

আঠারো

দশ দিন পর, এক রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলে মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে তাঁর সংগে দেখা করলো তিন গোয়েন্দা।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছে, তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। নতুন কেসের রিপোর্ট–ফাইল বিশাল টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলো রবিন।

নীরবে পড়লেন পরিচালক। তারপর মুখ তুললেন, 'অনেক মাথা খাটিয়ে ভালো বুদ্ধিই বের করেছিলো ওরা। শেষ রক্ষা করতে পারলো না।' মুচকি হাসলেন। 'তিন গোয়েন্দাকে গণায় ধরেনি তো, তাই ফেঁসেছে।'

'কিছু কিছু লোক ইচ্ছে করেই বিপদে পড়ে, নিজের দোষে,' বললো কিশোর। 'এই যেমন মিস্টার কুপার। সুযোগ তো তিনিই দিয়েছেন। দুনিয়ার কোটি কোটি লোক ব্যাংকে টাকা রাখছে, তুলছে, সব কিছুই করছে। তাঁর কেন ব্যাংকের ওপর বিশ্বাস

নেই? চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই তো লোক ব্যাংকে টাকা রাখে, সেটা নিরাপদেও থাকে। উদ্ভট কিছু বিশ্বাসও আছে, মানে, ছিলো তাঁর। সাংঘাতিক কিছু ঘটবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সভ্যতা, বিদ্রোহ দেখা দেবে সারা আমেরিকা জুড়ে। তাঁর স্ত্রীর আছে আরেক বিশ্বাস, এখনও সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি—উদ্ধারকারীরা এসে নাকি উদ্ধার করে নিয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষকে। ষড়যন্ত্রকারীরাও পেয়েছে সুযোগ। দু জনের বিশ্বাসকেই কাজে লাগিয়েছে। স্পেসশিপের খেলা দেখিয়ে আরেকটু হলেই সর্বনাশ করে দিয়েছিলো।'

'ইয়ে, ক্ল্যাম্পের মতো জিনিসটা কি, জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

'দস্তা। নকশা এঁকে দিয়েছেন শেট মরটন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক ওয়ার্কশপ থেকে বানিয়ে নিয়েছে। ওটা দিয়ে কোনো কাজই হয় না। নিছকই মনগড়া জিনিস। তৃণভূমিতে ফেলে রেখে বিশ্বাস করাতে চেয়েছে, স্পেসশিপ থেকে পড়েছে। রেখে দিয়েছেন জিনিসটা মিস্টার কুপার। পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করবেন।'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব নেই রিপোর্টে, লেখোনি,' রবিনের দিকে চেয়ে বললেন পরিচালক। 'এই যেমন, প্রথমেই ধরো, র‍্যাঞ্চ থেকে নাহয় লোক বেরোনো বন্ধ করেছে ওরা। কিন্তু রাস্তার ট্র্যাফিক? ওই পথে যানবাহন চলাচল ঠেকিয়েছে কিভাবে?'

'সহজ,' জবাব দিলো রবিন। 'পথের দুই মাথায়ই দুটো সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেঃ রাস্তা বন্ধ। মেরামতের কাজ চলছে।...তাছাড়া ওই পথে ট্র্যাফিক চলাচল খুবই কম। তাই ঝুঁকিটা নিয়েছিলো মরটন।

'হ্যাঁ, ঝুঁকি ছিলো। কারও সন্দেহ হলে, কেউ খোঁজ করতে এলেই...যাকগে। ঘোড়ার গায়ের গন্ধ কার গায়ে ছিলো? জেনি এজটার?'

'হ্যাঁ, জবাব দিলো কিশোর। 'ভোরে আমাদের বেরোতে দেখেছে জেনি। আস্তাবলে ঢুকে ফোন করেছে দলের লোকদের। তৃণভূমিতে যে দু'জন ছিলো তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। নিজে পিছু নিয়েছে আমাদের। কুয়াশার মধ্যে ওই দু'জন ধরেছে আমাকে আর মুসাকে, আর জেনি মেরেছে রবিনকে। ঘোড়া পোষে তো, ওর গায়েও ঘোড়ার জোর। আস্তাবল থেকে বেরিয়েছে, তাই গায়ে ঘোড়ার গন্ধ লেগে ছিলো। ফিরে এসে নিশ্চয় গোসল করেছে, ফলে চলে গিয়েছিলো গন্ধ।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন পরিচালক, 'ঘোড়ার সঙ্গে থাকলে গায়ে ঘোড়ার গন্ধ লাগেই। টেলিফোন সেটটা কি আস্তাবলেই পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কুয়াশার ব্যাপারটা কি? বিশেষ একটা জায়গা থেকে কুয়াশা ওঠে, ফগ মেশিন বসিয়েছিলো নাকি?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ। কুয়াশা দরকার ছিলো ওদের। যন্ত্রপাতি লুকানোর

জন্যে, আরও নানা কারণে। গ্যাস ট্যাংক রেখেছে। বেলুন ওড়ানোর জন্যে। অনেক লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকতো বেলুনটা। পাহাড়ের চূড়ার আগুন নিভে গেলে দড়ি ধরে টেনে ওটা আন[illegible] নামিয়ে লুকিয়ে ফেলা হতো কুয়াশার মধ্যে। চূড়ার ওপর অনেকগুলো করে বাজি রে[illegible]খ আসতো, নিচ থেকে ওগুলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করতো ব্যাটারি আর তারের সাহায্যে। দূর থেকে ডিনামাইট ফাটানো হয় যে পদ্ধতিতে, অনেকটা সেভাবেই আগুন ধরানো হতো বাজির স্তূপে। বাজি পোড়ানোর সময় জ্বলে উঠতো নীল আগুন। ওই আগুনের আলোয়ই আলোকিত হতো বেলুনটা, দূর থেকে মনে হয়েছে ফ্লাইং সসার।'

'ওরা ভেবেছিলো,' কিশোর থামলে বললো রবিন, 'সোনাগুলো সংগে করে নিয়ে যাবেন মিস্টার কুপার। যেতেনও...'

'সময়মতো কিশোর পাশা ওখানে না থাকলে,' রবিনের কথাটা শেষ করলো মুসা। 'টাকা তো সব যেতোই, কতো বড় লজ্জা থেকে যে বেঁচে গিয়েছেন মিস্টার কুপার! পুলিসের কাছে গিয়ে বলা—ফ্লাইং সসারে চেপে ভিনগ্রহে যেতে চেয়েছিলাম। আমার সব কেড়ে নিয়েছে ডাকাতেরা।' পরদিন সেটা খবরের কাগজেও উঠতো। হায় হায়রে। জীবনে আর রাস্তায় বেরোতে পারতেন না, লোকের হাসির ঠেলায়।'

'যাক, বাঁচিয়ে তো দিয়েছো। সেদিন টেলিভিশনে একটা সাক্ষাৎকার দেখলাম। একজন পুলিস অফিসার মূল্যবান একটা কথা বলেছে। বললো, অপরাধীরা যতোটা মাথা খাটায় অপরাধের পেছনে, সেটা ভালো কাজে খাটালে অনেক উন্নতি করতে পারতো। নিজের এবং অন্যের।' থামলেন এক মুহূর্ত। কি ভাবলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'জেনি আর জোয়ান কি সোনা লুটের মতলবেই র‍্যাঞ্চে চাকরি নিয়েছিলো?'

'না,' বললো কিশোর। 'চাকরি করার জন্যেই নিয়েছিলো। কিন্তু ঢোকার পর মিস্টার আর মিসেস কুপারের স্বভাব-চরিত্র দেখে, সোনা লুকানো আছে বুঝতে পেরে সোনা লুটের ফন্দি ঢুকেছে মাথায়। ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে জোয়ান। তারপর অনেক চিন্তাভাবনা করে সেট সাজিয়েছে।'

'হুঁ, টাকার লোভ ভালো মানুষকেও খারাপ করে দেয়। তো, সোনাগুলো কোথায় লুকিয়েছেন, মিস্টার কুপার বলেছেন তোমাদেরকে?'

'না। জিজ্ঞেসও করিনি। জানিই তো কোথায় আছে।'

'লোহার চেয়ার-টেবিলের ভেতরে?'

'হ্যাঁ! অর্ডার দিয়ে বানিয়েছেন ওগুলো, সবগুলোর ফ্রেম ফাঁপা। স্ট্যাম্প কোম্পানির কাছ থেকে সোনা কিনেছেন। বলেছেন, মোহরের মতো করে বানিয়ে দিতে। তারপর ওই মোহর গর্ত দিয়ে ফেলে দিয়েছেন চেয়ার টেবিলের ফাঁপা পাইপের মধ্যে।'

'এখনও কি আছে ওখানেই?'

'বোধহয় না। ধারণা পাল্টেছে তাঁর। সেদিন তো বললেন, সমস্ত সোনা নিয়ে গিয়ে ব্যাংকে রাখবেন। আর কোনো অঘটন যদি ঘটেই কোটি কোটি লোকের যা অবস্থা হয়, তাঁরও তাই হবে।'

'তা-তো ঠিকই দুনিয়ার আর সব লোক যদি মরেই গেল, র‍্যাঞ্চো কুপারের গুটিকয় লোক বেঁচে থেকে কি করবে? নিদারুণ নিঃসঙ্গতা পাগল করে দেবে সব ক'জনকে। এভাবে বাঁচার কোনো অর্থ নেই। আর, ড্যাম সানের সংগে আমিও একমত। আমাকে যদি নিতে আসে উদ্ধারকারীরা—বিশ্বাস তো করি না, ধরো যদি আসে—তাহলে আমিও যাবো না। জন্মেছি এখানে, মরবোও এখানে।'

'ঠিকই তো, স্যার,' একমত হলো মুসা আমান, 'কোথায় কোন্ অজানা অচেনা জায়গায় গিয়ে পড়বো। কি খায় কি দায়, জানি না। আদৌ খায় কিনা তাই বা কে জানে? শেষে না খেয়ে মরবো। তারচে…'

হেসে উঠলো সবাই। আইসক্রীমের অর্ডার দিলেন পরিচালক যাতে না-খাওয়ার কষ্ট থেকে রেহাই পায় মুসা আমান।

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৮৯

'নীলাম ডাকা হতে দেখেছো কখনও?' হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো কিশোর পাশা।

না বললো রবিন মিলফোর্ড।

মুসা আমানও মাথা নাড়লো।

'আমিও দেখিনি,' বললো কিশোর। 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আজ সকালে নীলাম ডাকবে সাইকার অকশান কোম্পানি। ট্রাঙ্ক, সুটকেস, আরওনানারকম জিনিস। হোটেলের রুমে ফেলে গেছে ওগুলো লোকে। আসলে পালিয়েছে। বিল–টিল দিতে পারেনি হয়তো, ফেলে রেখেই চলে গেছে। ইনটারেসটিং।'

'কোন্‌টা?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'লোকের পুরনো কাপড়?'

'নীলাম–টিলাম বাদ দাও,' রবিন বললো। 'তার চেয়ে চলো সাঁতার কাটিগে।'

'নতুন অভিজ্ঞতা হবে আমাদের,' যুক্তি দেখালো গোয়েন্দা–প্রধান। 'আর গোয়েন্দাদের অভিজ্ঞতা যতো বেশি থাকে ততো ভালো। বোরিসকে বলবো, ছোট ট্রাকটায় করে আমাদেরকে হলিউডে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

ইয়ার্ডে কাজের চাপ কম। বলতেই রাজি হয়ে গেল বোরিস।

সুতরাং, ঘন্টাখানেক বাদে বিশাল এক ঘরে এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। লোকে গিজগিজ করছে। উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে, মোটা এক লোক, সে–ই নীলাম ডাকছে। এক কোণে স্তূপ করে রাখা পুরনো ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বাক্স।

সামনের টেবিলে নতুন একটা সুটকেস। সেটা দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে লোকটা, 'গেল, গেল, এতো সুন্দর নতুন জিনিসটা চলে গেল। সাড়ে বারো ডলার, এক···সাড়ে বারো ডলার, দুই···সাড়ে বারো ডলার, তিন।'

হাতের কাঠের হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে জোরে বাড়ি মারলো সে।

লাল নেকটাই পরা একজন লোক এসে টাকা মিটিয়ে দিয়ে সুটকেসটা নিয়ে গেল।

'এবার আসছে আটানব্বই নম্বর জিনিসটা,' সুরেলা কণ্ঠে বললো নীলামকারী। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, দারুণ জিনিস। এমন জিনিস কমই দেখেছেন। এই,

সহকারীদের দিকে চেয়ে বললো, 'তুলে আনো এখানে। সবাই দেখুক।'

ছোট, পুরনো একটা ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে তুলে আনলো দু'জন সহকারী।

নড়েচড়ে উঠলো মুসা। দিনটা ভীষণ গরম। ঘরে, জনতার ভিড়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। ভালো লাগছে না তার। লোকের আগ্রহ দেখে অবাক হচ্ছে। ফালতু কতগুলো জিনিসের জন্যে···দূর। কিশোরের হাত ধরে টানলো, 'চলো, চলে যাই।'

'আরেকটু,' বললো কিশোর। 'জিনিসটা পছন্দ হয়েছে আমার। ভাবছি, ডাকবো।'

'ওটা!' ট্রাঙ্কটার দিকে আরেকবার তাকালো মুসা। 'পাগল হয়েছো?'

'ডাকবো,' আগের মতোই বললো কিশোর। 'দেখি, কিনতে পারি কিনা। ভেতরে কিছু পেলে আমরা তিনজনে ভাগাভাগি করে নেবো। ঠিক আছে?'

'ভাগাভাগি? আছে কি ঘোড়ার ডিম ওটার মধ্যে? হয়তো শ'খানেক বছরের পুরনো কিছু কাপড়। ওগুলো কে নেবে?' বললো রবিন।

অনেক পুরনো দেখাচ্ছে ট্রাঙ্কটা। কাঠের তৈরি, চামড়ায় মোড়া। ডালা লাগানো, তালা বন্ধ।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান,' চেঁচিয়ে চলেছে নীলামকারী, 'এই ট্রাঙ্কটা দেখুন। কি সুন্দর! বিশ্বাস করুন, এরকম জিনিস আর আজকাল কেউ বানায় না।'

মৃদু গুঞ্জন উঠলো দর্শকদের মাঝে। ঠিকই বলেছে লোকটা। এখন আর এ-ধরনের ট্রাঙ্ক বানানো হয় না। জিনিসটার বয়েস পঞ্চাশ বছরের ওপর তো নিশ্চয় হয়েছে।

'কোনো অভিনেতার ট্রাঙ্ক,' ফিসফিস করে দুই সহকারীকে বললো কিশোর, 'মনে হচ্ছে। ওরকম ট্রাঙ্কেই জিনিসপত্র রাখতো তখনকার অভিনেতারা।'

'ওদের পুরনো জিনিসপত্র নিয়ে কি করবো আমরা?' বিড়বিড় করলো মুসা। 'কিশোর···'

নীলামকারীর চিৎকারে তার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল, 'দেখুন, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, চেয়ে দেখুন। মোটেও নতুন নয়, আধুনিক নয়, হতেই পারে না। অ্যানটিক হিসেবে কি চমৎকার জিনিস, ভেবে দেখুন। চিন্তা করুন, এই রকম ট্রাঙ্কে করে জিনিস বয়ে নিয়ে বেড়াতো আমাদের দাদারা। কি আছে এর ভেতরে?'

ডালার ওপর জোরে চাপড় দিলো সে। ভোঁতা শব্দ হলো।

'কি আছে কে জানে? কতো কিছুই থাকতে পারে। হয়তো কোনো রাশান জারের হীরার মালা আছে, সোনার মুকুটও থাকতে পারে? পারে না? পারে। তাহলে, কতো

দাম হতে পারে এর? কতো? বলুন? যা খুশি বলুন?'

ক্রেতারা নীরব। পুরনো ট্রাঙ্কটা কেউ কিনতে চায় না। হতাশ দেখালো নীলামকারীকে। এতো বক্তৃতা দিয়ে লাভ হলো না। 'বলুন, বলুন,' আবার চেঁচালো সে। 'নিশ্চিন্তে দাম বলুন। যা খুশি। পুরনো এতো সুন্দর একটা অ্যানটিক ট্রাঙ্ক, অতীত দিনের এতো সুন্দর...'

'এক ডলার!' এক পা সামনে বাড়লো কিশোর। উত্তেজনায় কাঁপছে।

'এক ডলার।' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো নীলামকারী। 'ইনটেলিজেন্ট ইয়াং ম্যান। এক ডলার হেঁকেছে। আর কারও কিছু বলার আছে? দিয়ে দিচ্ছি। এক ডলারেই দিয়ে দিচ্ছি। বলুন, কেউ কিছু বলুন। বলার আছে? নেই? বেশ, এক ডলার, এক...এক ডলার, দুই...এক ডলার, তিন। ব্যস, হয়ে গেল বিক্রি।' খটাস করে হাতুড়ি দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারলো সে।

হেসে উঠলো দর্শকরা। ওই ট্রাঙ্ক কেউ চায় না। নীলামকারীও দাম বাড়ানোর জন্যে চাপাচাপি করে সময় নষ্ট করেনি। জিনিসটা নেয়ার জন্যে এগোলো কিশোর। এতো কমে পেয়ে যাবে, সে-ও ভাবেনি, অবাকই হয়েছে।

ঠিক এই সময় পেছনের দর্শকদের মাঝে জোরালো গুঞ্জন উঠলো। দু'হাতে ঠেলে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে এক বৃদ্ধা। মাথার একটা চুলও কাঁচা নেই, সব শাদা। পুরনো ধাঁচের একটা হ্যাট মাথায়, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

'এক মিনিট!' চেঁচিয়ে বললো মহিলা। 'আমি ডাকতে চাই। দশ ডলার। ট্রাঙ্কটার জন্য দশ ডলার দেবো।'

সব ক'টা চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল তার দিকে। এতো বোকা কে আছে, পুরনো বাতিল একটা ট্রাঙ্কের জন্যে দশ ডলার দিতে চায়?

'বিশ ডলার!' জবাব না পেয়ে ওপরে হাত নেড়ে আবার চেঁচিয়ে বললো মহিলা। 'বিশ ডলার দেবো।'

'সরি, ম্যাডাম,' জবাব দিলো নীলামকারী, 'বিক্রি হয়ে গেছে। এই,' দুই সহকারীকে বললো সে, 'সরাও, এটা সরিয়ে নিয়ে যাও। অন্য জিনিস তোলো। অনেক বাকি এখনও।'

মঞ্চ থেকে ট্রাঙ্কটা নামিয়ে কিশোরের দিকে এগোলো ওরা। 'এই যে, তোমার জিনিস।'

'কিনে তো বসলে,' মুসা বললো কিশোরকে, 'কি করবে এখন এটা দিয়ে?'

'বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুলবো,' একপাশের চামড়ার হাতল চেপে ধরলো কিশোর। 'ধরো, ওদিকেরটা। ওঠাও।'

'আরে রাখো রাখো,' বলে উঠলো নীলামকারীর এক সহকারী, 'আগে দাম দাও। এক ডলার,' হাত বাড়ালো সে।

'ও হ্যাঁ,' পকেট থেকে এক ডলার বের করে দিলো কিশোর।

খসখস করে রশিদ লিখলো লোকটা। কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'যাও, এবার ওটা তোমার। দেখো হীরার মালাটালা পাও নাকি। হাহ্ হাহ্ হা!'

ট্রাঙ্কটা বয়ে নিয়ে চললো কিশোর আর মুসা। দর্শকদের ভিড়ের বাইরে বের করে এনে রাখলো।

ওদের প্রায় পেছনেই বেরোলো সেই সাদা-চুল বৃদ্ধা।'এই ছেলেরা, শোনো। বিশ ডলারে আমি কিনতে চাই ওটা।...না না, ঠিক আছে, পঁচিশ ডলারই দেবো। পুরনো ট্রাঙ্ক সংগ্রহ করা আমার নেশা।'

'পঁচিশ ডলার!' ভুরু কোঁচকালো মুসা।

'দিয়ে দাও কিশোর,' রবিন বললো।

'ভালো লাভ, তাই না?' মহিলা বললো। 'আমি বলে কিনছি। আর কারো কাছে এটার কানাকড়ি দামও নেই। এই নাও, পঁচিশ ডলার।'

'সরি ম্যাডাম,' মুসা, রবিন, এমনকি মহিলাকেও অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়লো কিশোর। 'বেচবো না। ভেতরে কি আছে দেখতে চাই।'

'কি আর থাকবে ওটার মধ্যে?' বললো মহিলা। 'দামী কিছুই নেই। এই নাও, তিরিশই দিচ্ছি, যাও।'

'সরি, ম্যাডাম,' আগের মতোই মাথা নাড়লো কিশোর। 'সত্যিই বেচবো না।'

কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল বৃদ্ধা। সামান্য চমকে উঠলো বলে মনে হলো। আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি ঘুরে ঢুকে গেল ভিড়ের মধ্যে। কি দেখে ভয় পেয়েছে, বোঝা গেল। ক্যামেরা হাতে এগিয়ে আসছে এক তরুণ।

'হাই ছেলেরা,' বললো লোকটা, 'আমি ক্যাল উইলিয়ামস, দা হলিউড নিউজের রিপোর্টার। "মানুষের আগ্রহ" নিয়ে একটা ফিচার করার ইচ্ছে। ট্রাঙ্ক হাতে তোমাদের একটা ছবি নিতে চাই। ধরে তুলবে প্লীজ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, এতেই হবে,' রবিনের দিকে তাকালো। 'তুমিও গিয়ে দাঁড়াও না পেছনে। তোমার ছবিও উঠুক।'

কিশোরের দিকে তাকালো রবিন। তারপর গিয়ে দাঁড়ালো ট্রাঙ্কের পেছনে। চোখে পড়লো, ডালার ওপরে সাদা রঙে লেখা রয়েছেঃ দা গ্রেট ডেটলার। রঙ মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখাটা, কিন্তু পড়া যায়।

ঝিলিক দিয়ে উঠলো ক্যামেরার ফ্ল্যাশগান, ছবি উঠে গেল ওদের। 'থ্যাঙ্কস,' বললো রিপোর্টার। 'তা তোমাদের নাম জানতে পারি? তিরিশ ডলার কেন ফিরিয়ে

দিয়েছো, কারণটা? ভালোই তো লাভ ছিলো।'

'জাস্ট কৌতূহল,' জবাব দিলো কিশোর। 'আর কিছু না। ভেতরে কি আছে দেখতে চাই। কিনেছি কৌতূহল মেটাতে, সেটাই বড় লাভ।'

'রাশান জারের হীরার মালা আছে, সত্যি ভাবছো তাহলে?' হাসলো রিপোর্টার।

'ওটা কথার কথা বলছে নীলামকারী।' মুসা বললো। 'ভেতরে পোকায় কাটা পুরনো কাপড় আছে হয়তো। ছালা-বস্তা থাকলেও অবাক হবো না।'

'তা ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় জানালো রিপোর্টার। 'নামটা দেখো। দা গ্রেট ডেটলার, কেমন নাটক নাটক গন্ধ আছে না? ও, তোমাদের নাম যেন কি বললে?'

'কিছুই বলিনি,' বলে পকেট থেকে কার্ড বের করে দিলো কিশোর। 'এই যে, আমাদের নাম।'

ভুরু ওপরে উঠলো লোকটার। 'গোয়েন্দা? এ-জন্যেই। উনত্রিশ ডলার লাভ কেন ছেড়ে দিলে এতোক্ষণে বোঝা গেল। যা-ই হোক, অনেক ধন্যবাদ। হয়তো আজ সন্ধ্যের কাগজেই ছবি দেখতে পাবে তোমাদের। অবশ্য, যদি গল্পটা সম্পাদকের পছন্দ হয়।'

হাত তুলে 'গুড-বাই' জানিয়ে ঘুরলো তরুণ রিপোর্টার।

ট্রাঙ্কের একটা হাতল আবার ধরে কিশোর বললো, 'মুসা, ধরো। বেরিয়ে যাই।'

আগে আগে চললো রবিন। পেছনে ট্রাঙ্ক ধরাধরি করে অন্য দু'জন।

'ব্যাটাকে আমাদের নাম বললে কেন?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'বিজ্ঞাপন,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'যে কোনো ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে বিজ্ঞাপন অবশ্যই লাগবে। নইলে লোকে জানবে না।'

বড় একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে চত্বরে নামলো ওরা। তারপরে পথ। ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাঙ্কটা ট্রাকের পেছনে তুলে দিয়ে সামনে বোরিসের পাশে উঠে বসলো তিন গোয়েন্দা।

'বাড়ি যাবো,' বোরিসকে বললো কিশোর। 'একটা জিনিস কিনেছি। বাড়ি গিয়ে খুলবো। জলদি যান।'

'হোকে (ওকে),' এঞ্জিন স্টার্ট দিলো বোরিস। 'কি কিনেছো?'

'পুরনো একটা ট্রাঙ্ক,' জবাব দিলো মুসা। 'কিশোর, তালা খুলবে কিভাবে?'

'অনেক পুরনো চাবি আছে ইয়ার্ডে। আশা করি কোনো একটা লেগে যাবে।'

'যদি না লাগে?' প্রশ্ন করলো রবিন। 'ভেঙে খুলবে?'

'না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'তাতে নষ্ট হবে সুন্দর জিনিসটা। অ্যানটিক ভ্যালু শেষ। চাবিটাবি দিয়েই খুলতে হবে কোনোমতে।'

সারা পথে আর একটা কথাও হলো না।

ইয়ার্ডে ঢুকলো ট্রাক।

ট্রাঙ্কটা নামানো হলো।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী । 'এটা কি? ...ও, ট্রাঙ্ক। অনেক পুরনো তো। আনলি কোত্থেকে?'

'নীলাম ডেকে,' জানালো কিশোর। 'এক ডলার দিয়ে।'

'মাত্র? বলিস কি? তোর চাচা গেলে দশ ডলারের কম লাগাতো না। খুব ভালো করেছিস। ভেতরেও বোধহয় কিছু পাওয়া যাবে। খুলবি কি দিয়ে? অফিসে পুরনো অনেক চাবি আছে। নিয়ে আয়গে চট করে।'

রবিনকে ইশারা করলো কিশোর। বললো, 'ডেস্কের ধারে। দেয়ালে ঝোলানো, দেখো।'

চাবির গোছা নিয়ে এলো রবিন।

পুরো আধ ঘন্টা চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিলো কিশোর। তালা খুলতে পারলো না।

'এবার?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'চাড় দিয়ে ভাঙবে?' রবিন বললো।

'না,' কিশোর বললো। 'চাচার কাছে আরও চাবি আছে। কোথায় রেখেছে কে জানে। চাচা আসুক।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গিয়েছিলেন মেরিচাচী। আবার বেরিয়ে এলেন অফিস থেকে। 'কি রে, পারলি না ? থাক,'পরে খুলিস। খেয়ে নে গিয়ে। অনেক কাজ জমেছে। বোরিস একা কুলাতে পারছে না, তোরা একটু হাত লাগাস।'

ট্রাংক খোলা আপাতত বাদ দিয়ে খেতে চললো ছেলেরা।

খেয়ে এসে বোরিসকে কাজে সাহায্য করলো।

বিকেলে বড় ট্রাকটা নিয়ে ফিরলেন রাশেদ পাশা। ড্রাইভ করছে রোভার। ট্রাকের পেছনটা পুরনো মালপত্রে বোঝাই।

ট্রাক থেকে নেমে বিশাল গোঁফে তা দিতে দিতে এগোলেন রাশেদ পাশা। হাতে একটা খবরের কাগজ। ছেলেদের ওপর চোখ পড়তে ডেকে বললেন, 'এই এদিকে এসো তোমরা। কাগজের নিউজ হয়ে গেছো দেখি।'

হাঁকডাক শুনে অফিস থেকে মেরিচাচীও বেরোলেন।

ভেতরের পাতায় বেরিয়েছে খবরটা, দেখালেন রাশেদ পাশা। মুসা আর কিশোর ট্রাঙ্ক ধরে দাঁড়িয়েছে, পেছনে রবিন। স্পষ্ট ছবি। এমনকি বাক্সের ডালার লেখাটাও বোঝা যায়। হেডলাইন করেছেঃ রহস্যময় ট্রাঙ্ক—কৌতূহলী তিন কিশোর গোয়েন্দা।

নিচের লেখাটা হালকা মেজাজের। ছেলেদের ধারণা, ভেতরে মূল্যবান কিছু পাওয়া যেতে পারে, একথা লিখেছে। এক ডলারে কিনে তিরিশ ডলারে যে বিক্রি করতে রাজি হয়নি, একথাও। জোরে জোরে পড়ে শোনালেন তিনি।

'বিজ্ঞাপন না ছাই,' গোমড়ামুখে বললো মুসা। 'আমাদেরকে গাধা বানিয়ে ছেড়েছে। দামী জিনিসের লোভে যে ছাড়িনি আমরা, সেটাই বুঝিয়েছে।'

'হুঁ,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার কিশোর। 'আর যদি সত্যি সত্যি কিছু পেয়ে যাই?'

'ছাগলটার মুখে চুনকালি পড়বে,' বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'ওই রিপোর্টারগুলোর কাজই এমনি। খালি লোকের খুঁত খুঁজে বেড়ায়। মন খারাপ করিস না। হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমি খাওয়া বাড়ি। রবিন, মুসা, তোমরাও ধুয়ে এসো।'

হাত-মুখ ধুঁলো মুসা আর রবিন, কিন্তু আর খেতে বসলো না। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মা-বাবা ভাববেন। সাইকেল নিয়ে যার যার বাড়ি রওনা হলো ওরা।

ট্রাঙ্কটা অফিসের কোণে রেখে খেতে চললো কিশোর।

ইয়ার্ডের গেট বন্ধ করে তালা লাগিয়ে এলেন রাশেদ পাশা।

সন্ধেটা কেটে গেল একভাবে, নতুন কিছু ঘটলো না। শোয়ার জন্যে উঠলো কিশোর। দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো।

বোরিস আর রোভার দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

'কিশোর,' দরজা খুলতেই ফিসফিস করে বললো বোরিস, 'ইয়ার্ডে আলো দেখেছি। কে জানি আছে ওখানে। গিয়ে দেখা দরকার।'

'বলো কি?' আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'চোরটোর কিছু হবে। দাঁড়িয়ে আছো কেন? জলদি যাও।'

'এতো অস্থির হওয়ার কিছু নেই, মেরি,' শান্তকণ্ঠে বললেন রাশেদ পাশা। 'তুমি চুপ করে বসো এখানে। আমরা যাচ্ছি।

গেটের কাছাকাছি আলো দেখেছে দুই ভাই। পা টিপে টিপে এগোলো সেদিকে। ওদের পেছনে রইলো কিশোর।

আবার আলো দেখা গেল। একটা জঞ্জালের স্তূপের ওপাশে। টর্চ জ্বেলেছে কেউ।

সেদিকে চেয়ে হাঁটতে গিয়ে কিসে হোঁচট খেয়ে ধুড়ুস করে আছাড় খেলো রোভার। 'হাউফ!' করে উঠলো।

প্রায় সংগে সংগেই শোনা গেল ছুটন্ত পায়ের শব্দ। স্তূপের ওধার থেকে বেরিয়ে এলো দুটো ছায়ামূর্তি। গেটের বাইরে বেরিয়ে একটা গাড়িতে করে চলে গেল।

বোরিস, কিশোর আর রাশেদ পাশা দৌড়ে এলেন গেটের কাছে। পাল্লা খোলা। তালা ভাঙা। চোরেরা পালিয়েছে।

কি মনে হতে ঘুরে দৌড় দিলো কিশোর। ছুটে এসে ঢুকলো অফিসে। আলো জ্বেলেই স্থির হয়ে গেল যা সন্দেহ করেছিলো তা–ই ঘটেছে।

ট্রাঙ্কটা নেই!

দুই

সাইকেল চালিয়ে ইয়ার্ডের গেটের ভেতরে এসে ঢুকলো রবিন। উজ্জ্বল রোদ। গরমের চমৎকার এক সকাল। দিনটা ভালোই যাবে মনে হচ্ছে।

মুসা আর কিশোর কাজে ব্যস্ত। পুরনো একটা ঘাস–কাটা মেশিনের মরচে ধরা গা ডলছে সিরিশ দিয়ে। মরচে তুলে পরিষ্কার করে তারপর রঙ করবে। পাশে পড়ে আছে লোহার কয়েকটা গার্ডেন চেয়ার। ওগুলোও রঙ করতে হবে।

রবিনের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকালো দু'জনে।

'এই যে, রবিন,' কিশোর বললো। 'এসো।'

সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে এগিয়ে এলো রবিন। 'ট্রাঙ্কটা খুলেছো? ভেতরে কি আছে?'

'ট্রাঙ্ক?' মলিন দেখালো মুসার হাসি। 'কোন্ ট্রাঙ্কের কথা বলছো?'

'আর কোন্‌টা? কাল যেটা এনেছি,' অবাক মনে হলো রবিনকে। 'পত্রিকায় মাও–ও দেখেছে আমাদের ছবি। বললো ভালোই নাকি উঠেছে। ভেতরে কি আছে জানার জন্যে অস্থির। বলে দিয়েছে, ফোন করে যেন জানাই।'

'সবারই দেখি আগ্রহ,' জোরে জোরে সিরিশ দিয়ে মেশিনের গায়ে ডলা দিলো কিশোর। 'আশ্চর্য! ভুলই বোধহয় করেছি। বেচে দিলে পারতাম।'

'এখন দিলেই হয়।'

'আর দেয়া যাবে না,' বললো মুসা।

'মানে?'

'মানে দেয়া যাবে না। নেই তো বেচবে কি? কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে ট্রাঙ্কটা।'

'চুরি! কে চরি করলো?'

'জানি না,' জবাব দিলো কিশোর। সংক্ষেপে সব বললো রবিনকে। 'ওরা নিয়ে কি করবে?' শুনে বললো রবিন। 'ভেতরে এমন কি ছিলো?'

'হয়তো নিছক আগ্রহ,' মুসা বললো। 'কাগজে ফিচার পড়ে কৌতূহল হয়েছে।

হয়তো ভেবেছে, ভেতরে কিছু থাকলেও থাকতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'শুধু কৌতূহলের কারণে ওই ট্রাঙ্ক চুরি করতে আসবে না কেউ। ঝুঁকি নেবে না। নিশ্চয় ভেতরে মূল্যবান কিছু আছে, এবং সেটা জানে ওরা। আগে জানলে তালা ভেঙেই খুলে দেখতাম।'

ওদের আলোচনায় বাধা দিলো নীল একটা গাড়ি। ইয়ার্ডে ঢুকছে। গাড়ি থেকে নামলো লম্বা, পাতলা একজন লোক। ভুরু দুটো অদ্ভুত, দু'দিকের দুই কোণ উঠে গেছে কপালের দিকে—সিনেমায় ডাইনী কিংবা শয়তানের ভুরু যেরকম আঁকা হয় অনেকটা তেমনি।

'গুড মর্নিং,' কাছে এসে কিশোরের দিকে চেয়ে বললো লোকটা। 'তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা।'

'হ্যাঁ, স্যার। কিছু চাই?'

'চাই তো একটা জিনিসই। পুরনো ট্রাঙ্কটা। কাগজে পড়লাম। এক ডলার দিয়ে কাল যেটা কিনে এনেছো। এনেছো না?'

'হ্যাঁ, স্যার,' লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো কিশোর, 'এনেছি।'

'বেশ। কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি ওটা কিনতে চাই। বিক্রি করে ফেলোনি তো?'

'না, স্যার, কিন্তু…'

'তাহলে আর কি,' কিশোরকে কথা শেষ করতে দিলো না লোকটা। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। হাতে বেরিয়ে এলো দশটা কড়কড়ে নোট, যেন ম্যাজিক। হাতপাখার মতো করে ওগুলো ধরে মুখে বাতাস করলো একবার। 'দেখো, একশো ডলার। দশটা দশ ডলারের নোট। ট্রাঙ্কটার জন্যে।' কিশোরকে দ্বিধা করতে দেখে তাড়াতাড়ি বললো, 'অনেক, তাই না? এক ডলারের একটা ট্রাঙ্কের জন্যে আর কতো বেশি চাও? পুরনো ট্রাঙ্ক। ভেতরে আছেই বা কি? ঠিক না?'

'হ্যাঁ, স্যার, কিন্তু…'

'অতো কিন্তু কিন্তু করো না তো। ভালো দাম দিচ্ছি আমি। কাগজে লিখেছে ট্রাঙ্কটার মালিক ছিলো দা গ্রেট ডেটলার। তাই না?'

'হ্যাঁ, ডালার ওপরে নামটা লেখা আছে বটে, কিন্তু…'

'আবার কিন্তু! "বাট মি নো বাটস!" অনেক আগেই শেকসপীয়ার বলেছেন একথা, এখন আমিও বলছি। আসলে কথা হলো কি জানো, দা গ্রেট ডেটলার আমার বন্ধু ছিলো। অনেক বছর তার সংগে দেখাসাক্ষাৎ নেই। মনে হয়, বেঁচেও নেই বেচারা। পুরনো বন্ধুর স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে চাই ট্রাঙ্কটা।…এই যে, আমার কার্ড।' বিশেষ

ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকালো লোকটা। গায়েব হয়ে গেল নোটগুলো, তার জায়গায় দেখা গেল ছোট একটা সাদা কার্ড। বাড়িয়ে দিলো কিশোরের দিকে।

হাতে নিয়ে পড়লো কিশোর। হ্যামলিন দা মিসটিক! নিচে ম্যাজিশিয়ানদের একটা ক্লাবের নাম, তার নিচে হলিউডের ঠিকানা।

'আপনি যাদুকর?'

মাথা সামান্য নুইয়ে ম্যাজিশিয়ানদের কায়দায় বাউ করলো লোকটা। 'ছিলাম একসময়। সারা ইউরোপে যাদু দেখিয়েছি আমি। এখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছি। ম্যাজিকের ইতিহাসের ওপর বই লিখছি একটা। মাঝে মাঝে এখনও যাদু দেখাই, তবে উৎসব অনুষ্ঠানে, বন্ধুরা দাওয়াত দিলে। ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি।'

আবার হাত ঝাঁকালো সে। নোটগুলো ফিরে এলো আঙুলে। 'বেচাকেনা শেষ করে ফেলা দরকার। এই নাও টাকা। ট্রাঙ্কটা নিয়ে এসো। দ্বিধা করছো কেন?'

'কারণ ট্রাঙ্কটা বিক্রি করতে পারছি না। সেকথাই এতোক্ষণ বলার চেষ্টা করেছি আপনাকে।'

'কেন?' তির্যক ভুরু কাছাকাছি হলো যাদুকরের। 'পারছো না কেন? নিশ্চয় পারবে। পারতেই হবে। দেখো ছেলে, আমাকে রাগিও না। ব্যবসা ছেড়েছি, কিন্তু বিদ্যা ভুলিনি। ধরো,' সামনের দিকে মুখ ঠেলে দিলো সে, চকচক করে উঠলো কালো চোখ, 'তুড়ি দিলাম, আর ফুসমন্তরে হাওয়া হয়ে গেলে তুমি। একেবারে গায়েব। কোনোদিন আর ফিরে আসবে না। খারাপ লাগবে না তখন?'

এতোই বাস্তব মনে হলো যাদুকরের কথা, ঢোক গিললো মুসা আর রবিন।

কিশোরের চেহারায়ও অস্বস্তি ফুটলো। 'নেই তো, বিক্রি করবো কিভাবে? কাল রাতে চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরি! সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।' সেই সকালে তৃতীয়বারের মতো একই গল্প বলতে হলো আবার কিশোরকে।

মন দিয়ে শুনলো যাদুকর। দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'আহ্‌হা, দেরিই করে ফেললাম। সকালে কাগজে পড়েছি, পড়েই ছুটেছি। চোর ব্যাটাদের দেখেছো?'

'না। আমরা কাছে যাওয়ার আগেই পালিয়েছে।'

'খারাপ, খুব খারাপ,' বিড়বিড় করলো যাদুকর।' 'ট্রাঙ্কটা এতোদিন পর যা–ও বা বেরোলো···তা চুরি করলো কেন?'

'হয়তো ভেতরে মূল্যবান কিছু ছিলো,' রবিন বললো।

'দূর! ডেটলারের ট্রাঙ্কে দামী কিছু থাকতেই পারে না। টাকা ছিলো না ওর। তবে

হ্যাঁ, যাদু দেখানোর ক্ষমতা ছিলো বটে। হয়তো, যাদুর কিছু কৌশল লেখা খাতা ছিলো ট্রাঙ্কটায়। কিন্তু তাহলে তো শুধু অন্য কোনো ম্যাজিশিয়ানই আগ্রহী হবে, আমার মতো কেউ।

'দ্য গ্রেট ডেটলার যে যাদুকর ছিলো, বলেছি কি? না বললেও নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছো। ছোট্টখাট্টো একজন মানুষ, রোগা-পাতলা গোল মুখ, কালো চুল। প্রায়ই এশিয়ান পোশাক পরতো, এশিয়ান যাদুকরদের ভাবভঙ্গি নকল করতে পছন্দ করতো। তার মতে এশিয়ান যাদুকররা নাকি খুব ভালো যাদু দেখাতে পারে। হয়তো ওদেরই কোনো কৌশল লেখা ছিলো ট্রাঙ্কে…যাকগে, বলে আর লাভ কি? চুরিই তো হয়ে গেছে।'

নীরবে ভাবলো কিছুক্ষণ যাদুকর। হাত ঝাড়া দিতেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল নোটগুলো। হতাশ কণ্ঠে বললো, 'খামোকাই এলাম। লাভ হলো না। আচ্ছা, এক কাজ তো করতে পারো। খুঁজে বের করতে পারো ওটা। তাহলে, মনে রেখো, হ্যামলিন দা মিসটিক ট্রাঙ্ক কিনতে আগ্রহী।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিশোরের ওপর নিবদ্ধ করলো যাদুকর। 'বুঝেছো, ইয়াং ম্যান! ট্রাঙ্কটা আমি চাইছি। কার্ডের ঠিকানায় পাবে আমাকে।'

'ওই ট্রাঙ্ক আর পাওয়া যাবে না,' মুসা বললো।

'পাওয়া যেতেও পারে,' এমনভাবে বললো যাদুকর, যেন সে জানে পাওয়া যাবেই, যাদুর জোরে। 'এবং পাওয়া গেলে আমার কথা ভাববে প্রথমে। রাজি?'

'যদি পাওয়া যায়,' জবাব দিলো কিশোর, 'আপনাকে না জানিয়ে আর কারো কাছে বিক্রি করবো না, এই কথা দিতে পারি। কিন্তু কিভাবে পাবো আমিও বুঝতে পারছি না। এতোক্ষণে চোরেরা হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে।'

'হয়তো। দেখাই যাক না, কি ঘটে। কার্ডটা রেখো, ফেলো না।' পকেটে হাত ঢোকালো হ্যামলিন। অবাক হলো যেন। বের করে আনলো একটা ডিম।'আরি, এটা এলো কোত্থেকে? এই, ধরো, ভেজে খেও।'

ছুঁড়ে দেয়া ডিমটা লুফে নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো মুসা। কিন্তু পারলো না। মাঝপথেই অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা, ঝিলিক দিয়ে।

'হুম্‌ম্‌,' পেশাদারী কায়দায় গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালো যাদুকর, 'নিশ্চয় ডোডো পাখির ডিম ছিলো। ডোডোরা দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তো, তাদের কোনো চিহ্নই আর রাখতে চায় না। যাক, অনেকক্ষণ থাকলাম। চলি। আমার কথা ভুলো না।'

লম্বা লম্বা পায়ে গাড়ির কাছে হেঁটে গেল যাদুকর।

পেছন থেকে তাকিয়ে রইলো ছেলেরা। আশা করলো, আবার কোনো একটা যাদু দেখাবে লোকটা।

নিরাশ হতে হলো তাদেরকে। আর কিছুই করলো না যাদুকর। গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

'বাপরে বাপ!' বলে উঠলো মুসা। 'কাস্টোমার বটে।'

'ব্যাটা সত্যি কথা বলেছে তো?' কিশোর বললো। 'বন্ধুর জিনিস বলে চায়, 'নাকি ট্রাঙ্কের ভেতর আসলেই দামী কিছু আছে?'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা, এই সময় আবার গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো। ওরা ভাবলো, কোনো কারণে বুঝি হ্যামলিনই ফিরে এসেছে। কিন্তু না, আরেকটা গাড়ি, ছোট একটা স্যালুন। চত্বরে ঢুকে থামলো। গাড়ি থেকে নেমে এলো এক তরুণ। দেখামাত্রই ওকে চিনলো ছেলেরা। সেই রিপোর্টার, ক্যাল উইলিয়ামস।

'এই যে ছেলেরা,' এগিয়ে আসছে রিপোর্টার, 'চিনতে পেরেছো তো?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় কাত করলো কিশোর।

'এলাম, ট্রাঙ্কে কি আছে জানতে। তাহলে আরেকটা ফিচার লিখতে পারবো। ভেতরে স্পেশাল কিছু থাকতে পারে। কথাবলা মড়ার খুলি বেরোলেও অবাক হবো না।'

তিন

'কথা–বলা মড়ার খুলি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'হ্যাঁ। মানুষের খুলি। পেয়েছো নাকি?'

ট্রাঙ্ক চুরির গল্প সেদিন চতুর্থবার বলতে হলো কিশোরকে।

'হায় হায় সর্বনাশ! গেল আমার ফিচার। কে নিলো? খবরের কাগজে পড়েছে এমন কেউ?'

হতে পারে, কিশোর বললো। 'যে নিয়েছে সে হয়তো জানে খুলিটার কথা। সত্যিই কথা বলতো নাকি, মিস্টার উইলিয়ামস?'

'শুধু ক্যাল বলে ডাকলেই চলবে। কথা বলতো কিনা জানি না, আমি শিওর না। কাল ডেটলারের নামটা দেখার পর থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছি। মনে হলো, নামটা পরিচিত। শেষে মর্গের ভেতরে খুঁজতে শুরু করলাম···খবরের কাগজের মর্গ কি জানো নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকালো তিনজনেই। জানে। পুরনো খবরের কাগজ, কাটিং, ছবি জমা করে রাখা হয় যে ঘরে সে–ঘরকে বলে খবরের কাগজের মর্গ। একধরনের লাইব্রেরিও বলা যায় একে।

'মর্গে খুঁজতে শুরু করলাম,' বলে গেল উইলিয়ামস। 'পাওয়া গেল দ্য গ্রেট

ডেটলার। অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে ওকে নিয়ে। খুব বড় যাদুকর ছিলো না যদিও, একটা বিশেষ যাদুর যন্ত্র ছিলো তার। একটা কথা–বলা খুলি।

'বছরখানেক আগে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল ডেটলার। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কেউ জানে না সে মরেছে না বেঁচে আছে। ট্রাঙ্কটা ফেলে গেল এক হোটেলে। সেটাই কাল নীলাম ডেকে আনলে তোমরা। আমার মনে হয় যাদু দেখানোর জিনিসপত্র ছিলো ওটার মধ্যে, সেই খুলিটাও। ভালো ফিচার হতে পারতো।'

'ডেটলার নিখোঁজ,' রবিন বললো, 'মানে একজন যাদুকর নিখোঁজ!'

'পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন রহস্যময়,' কিশোর বললো। 'যাদুকর নিখোঁজ, একটা কথা বলা খুলি নিখোঁজ, এখন ট্রাঙ্কটাও নিখোঁজ…'

'এক মিনিট, এক মিনিট,' হাত তুলে বাধা দিলো মুসা। তোমার কথাবার্তা ভালো ঠেকছে না আমার, কিশোর। তদন্ত করার কথা ভাবতে শুরু করেছো মনে হয়। তা করতে পারো, কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। যাদুকরের মড়ার খুলি, তা–ও আবার নিখোঁজ…না বাপু, আমি এসবে নেই আগেই বলে দিচ্ছি।'

'তদন্ত করবো কি? ট্রাঙ্কটাই তো নেই। তবে, গ্রেট ডেটলারের ব্যাপারে জানতে আমি আগ্রহী। ক্যাল, বলবেন?'

'নিশ্চয়,' রঙছাড়া একটা লোহার চেয়ারে বসে পড়লো রিপোর্টার। 'খুলেই বলি। যাদুকর ছিলো গ্রেট ডেটলার, ছোট যাদুকর। তবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো তার কথা–বলা খুলি। কাচের একটা টেবিলে বসানো থাকতো। ধারেকাছে আর কোনো জিনিস থাকতো না। যে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতো খুলিটা।'

'ভেনট্রিলোকুইজম?' অনুমান করলো কিশোর। 'হয়তো ঠোঁট না নেড়ে কথা বলা রপ্ত করেছিলো ডেটলার, সেই কথা ছুঁড়ে দিতো খুলিটার মুখ দিয়ে।'

'কি জানি। খুলিটা যখন কথা বলতো, তখন নাকি ঘরের মধ্যে দূরে বসে থাকতো ডেটলার। মাঝে মাঝে বাইরেও বেরিয়ে যেতো। চালাকিটা অন্য যাদুকরেরাও নাকি ধরতে পারেনি। তবে খুলিটা নিয়ে পুলিসী গোলমালে জড়িয়েছিলো ডেটলার।'

'সেটা কিভাবে?' রবিন জানতে চাইলো।

'যাদুকর হিসেবে সুবিধে করতে পারেনি ডেটলার। শেষে নতুন ব্যবসা ধরলো, লোকের ভাগ্য বলা, আই মীন, ভবিষ্যৎ বলা। কাজটা বেআইনী। এশিয়ান মহারাজাদের মতো আলখেল্লা পরে ছোট একটা সাজানো ঘরে বসতো। লোকে আসতো খুলির মুখ থেকে তাদের ভাগ্য শুনতে। অবশ্যই টাকার বিনিময়ে। খুলিটার একটা নামও রেখেছিলো ডেটলার, সক্রেটিস—একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতের নাম।'

'খুলিটা প্রশ্নের জবাব দিতো?' আবার জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'তাই তো শোনা যায়। ভবিষ্যদ্বাণী তো করতোই, নানারকম পরামর্শও নাকি দিতো খুলিটা। মার্কেট কেমন হবে না হবে, সে-কথাও নাকি বলেছিলো কয়েকজনকে। খুলির পরামর্শ মতো টাকা খাটিয়ে গচ্চা দিলো কিছু লোক, পুলিসকে গিয়ে জানালো। পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পাঠালো ডেটলারকে।

'বছরখানেক জেল খাটলো সে। বেরিয়ে এসে যাদু দেখানো, জ্যোতিষগিরি সব ছেড়েছুড়ে দিলো। কেরানির চাকরি নিলো। তারপর একদিন···হাওয়া! কেউ কেউ বলে, বড় অপরাধীদের চোখ পড়েছিলো তার ওপর। সক্রেটিসের সাহায্যে কোনো বে-আইনী কাজ করতে বলেছিলো। তাদের কথায় রাজি হয়নি ডেটলার। ভয়ে শেষে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'কিন্তু ট্রাঙ্কটা সংগে নিয়ে যায়নি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'কিংবা হয়তো কিছু ঘটেছে তার। সরিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।'

'ভালো কথা বলেছো,' একমত হলো উইলিয়ামস। 'হতেও পারে। হয়তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট···বিকৃত করে ফেলা হয়েছিলো তার দেহ, কেউ আর শনাক্ত করতে পারেনি.

'হ্যামলিন কেন ট্রাঙ্কটার জন্যে পাগল হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি,' মুসা বললো। 'খুলিটার লোভে। হতে পারে, সে-ই সরিয়ে দিয়েছে ডেটলারকে, যাতে খুলিটা হাতাতে পারে। ডেটলার জীবিত থাকতে সেটা সে পাচ্ছিলো না।'

'হ্যামলিন?' ভুরু কোঁচকালো উইলিয়ামস।

'হ্যাঁ,' হ্যামলিন যে এসেছিলো, জানালো কিশোর।

'কিনতে যখন এসেছিলো, তার মানে সে চোর নয়,' শুনে বললো উইলিয়ামস। 'যাকগে, যে খুশি চুরি করুক, সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি চাইছিলাম, সক্রেটিসকে নিয়ে ভালো একটা স্টোরি করবো। হলো না, কি আর করা। যাই। তোমাদের সংগে কথা বলে ভালো লাগলো।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ক্যাল উইলিয়ামস।

'উঁহু,' দুঃখ করে বললো কিশোর, 'ট্রাঙ্কটা চুরি হয়ে গেল। নইলে বেশ ভালো একটা কেস হাতে পেতাম। কথা-বলা খুলির তদন্ত···দারুণ ইনটারেসটিং।'

'আমি মোটেও ইনটারেসটেড নই,' হাত নাড়লো মুসা। 'ট্রাঙ্কটা গেছে, ভালো হয়েছে, আপদ বিদায়। কিন্তু খুলি আবার কথা বলে কিভাবে?'

সেটাই তো জানার ইচ্ছে। ট্রাঙ্কটা নেই, ভেবে আর কি হবে···ওই যে, চাচা ফিরেছে।'

ইয়ার্ডে ঢুকলো বড় ট্রাকটা। পুরনো মালপত্রে বোঝাই। কেবিনের পাশের দরজা

খুলে লাফ দিয়ে নামলেন রাশেদ পাশা। ছেলেদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'কি ব্যাপার? খুব খাটুনি?…কই, কাজ তো কিছুই এগোয়নি। চিন্তা করছো মনে হয়?'

'চাচা,' কিশোর বললো, 'ট্রাঙ্কটার কথা ভাবছি। গত কাল যেটা কিনে এনেছিলাম, রাতে চুরি গেছে। যাদুকরের ট্রাঙ্ক।'

'ও,' হাসলেন রাশেদ পাশা। 'এখনও বেরোয়নি তাহলে?'

'না। আর কোনোদিন বেরোবে বলেও মনে হয় না।'

'আমার অন্যরকম ধারণা। যাদুকরের ট্রাঙ্ক তো, হয়তো, যাদু করলেই ফেরত আসবে।'

হাঁ হয়ে গেল ছেলেরা।

'বলো কি, চাচা? কি যাদু করলে ফেরত আসবে?'

'এরকম,' চেহারাটাকে রহস্যময় করে তুললেন রাশেদ পাশা। সারকাসের বাজিকরের মতো তিড়িং করে এক ডিগবাজি খেলেন। তুড়ি দিলেন তিনবার। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করলেন, 'ছাগলের মাথা পাগলের মাথা, ট্রাঙ্কের মাথা মানুষের মাথা? ছুহ্! ছুহ্! লাগ ভেল্কি লাগ, লাগ জোরে লাগ, ফিরে আয় যাদুকরের ট্রাঙ্ক?'

চোখ খুললেন? 'যাও, দিলাম মন্ত্র চালিয়ে। এতো জোরালো মন্ত্রেও কাজ না হলে বুদ্ধি খরচ করবো আমরা?'

'বুদ্ধি?' রীতিমতো অবাক হয়েছে কিশোর। তার চাচা হাসিখুশি মানুষ, হাসতে ভালোবাসেন, হাসাতে ভালোবাসেন? মজা করছেন না তো তাদের সংগে?

'কিশোর,' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল রাশেদ পাশার মুখ থেকে, 'তুমি গোয়েন্দা। গোয়েন্দাদের প্রধান কাজ মাথা খাটানো। সেটা করছো না কেন?'

'কে বললো করছি না? তাই তো করছি?'

'না, করোনি? এখন বলো তো, গতরাতে কি কি ঘটেছিলো?'

বিস্ময় আরও বেড়েছে কিশোরের। চাচা কোন্‌দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাকে, বুঝতে পারছে না। 'ঘর থেকে বেরোলাম। রোভার আছাড় খেয়ে শব্দ করে ফেললো। দু'জন লোক ছুটে গেল গেটের দিকে, গাড়িতে করে পালালো। এই তো। তারপর অফিসে ঢুকে ট্রাঙ্কটা আগের জায়গায় দেখলাম না?'

'তার মানেই কি চুরি হয়ে গেল?'

'নিশ্চয়ই? ওরা গেটের তালা ভেঙে ঢুকলো…এক মিনিট।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর? উত্তেজনায় রক্ত জমলো মুখে 'আমরা যখন বেরোলাম, তখনও ইয়ার্ডের ভেতরে ছিলো ওরা। টর্চ জ্বেলে খুঁজছিলো। রোভার চমকে দেয়ায় পালালো। দৌড়ে গিয়ে উঠলো গাড়িতে। কিন্তু তাদের হাতে ট্রাঙ্ক ছিলো না। তাহলে? গেল কোথায় ওটা?

আগেই গাড়িতে তুলেছিলো? না, তাহলে ইয়ার্ডে আর ঘোরাফেরা করতো না। তারমানে? ওরা আসার আগেই কেউ সরিয়ে ফেলেছিলো ট্রাঙ্কটা?'

হাসলেন রাশেদ পাশা? 'ঠিকই বলেছো?'

'কে সরালো? খেতে যাওয়ার আগে আমি নিজে ওটা অফিসে রেখে গেছি?'

'ভাবো, কে সরালো,' মিটিমিটি হাসছেন রাশেদ পাশা।

'তু-তুমি...'

'হ্যাঁ, আমি। গেটে তালা দিয়ে এসে অফিসে উঁকি দিয়ে দেখি ট্রাঙ্কটা। ভাবলাম, লুকিয়ে রাখি। দেখি সকালে উঠে না পেলে কি করো তুমি। চোরেরা আমার মজাটাই নষ্ট করলো।'

'আপনি লুকিয়েছেন?' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ভাবো। ভেবে বের করো। তোমরা তো গোয়েন্দা। এই ইয়ার্ডে ওরকম একটা ট্রাঙ্ক কোথায় লুকালে সহজে কারো চোখে পড়বে না?'

চাচার কথায় কান নেই, ইতিমধ্যেই খুঁজতে শুরু করেছে কিশোর। তক্তার স্তূপ, পুরনো যন্ত্রপাতি...না, ওসব জায়গায় না। বেড়ার ধার ঘেঁষে, ছয় ফুট চওড়া চালার ওপরে এক জায়গায় অনেকগুলো ট্রাঙ্ক রাখা আছে, পড়ে আছে অনেক দিন ধরে। সেদিকে নজর দিলো সে। বলে উঠলো, 'মুসা, রবিন, এসো সাহায্য করো আমাকে।'

এক এক করে ট্রাঙ্কগুলো নামাতে শুরু করলো ওরা।

পাঁচ নম্বর ট্রাঙ্কটার ওজন অন্য চারটের চেয়ে ভারি মনে হলো। কিশোর বললো, 'রাখতো, দেখি।'

ট্রাঙ্কটা খুললো সে।

'বাহ, চমৎকার! ওই তো। যাদুকরের ট্রাঙ্ক। ডালার ওপরে লেখা: দা গ্রেট ডেটলার।

চার

'এবার দেখা যাক, এই চাবি দিয়ে খোলা যায় কিনা,' বললো কিশোর। চাচার কাছ থেকে পুরনো চাবির গোছা চেয়ে নিয়েছে।

তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে এখন ওরা। ট্রাঙ্কটা নিয়ে এসেছে এখানে, যাতে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে, আর কারও চোখে পড়ে না যায়। খরিদ্দার আসছে যাচ্ছে, কার কি উদ্দেশ্য কে জানে?

ট্রাঙ্কটা পেয়েও মুখ কালো করে রেখেছে কিশোর। ভালো লজ্জা দিয়েছে আজ তাকে চাচা। একেবারে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে। দুই সহকারী বন্ধু—যারা ভাবে কিশোর পাশার অসাধ্য কিছু নেই, তাদের কাছে ছোট হয়ে গেছে মুখ। রাতে না হয় উত্তেজনার বশে খেয়াল করেনি, সকালে তো করা উচিত ছিলো।

'কানটা ধরে মুচড়ে দিয়েছে আজ আমার, চাচা,' গোমড়ামুখে বললো সে।

সান্ত্বনা দিলো তাকে মুসা, 'ওসব ভেবে মন খারাপ করো না...'

'...মানুষের ওরকম ভুল হয়েই থাকে,' বাক্যটা শেষ করলো রবিন। 'কিন্তু এখন কি করবে? হ্যামলিনকে কথা দিয়েছো, ট্রাঙ্কটা পেলে তাকে খবর দেবে।'

'বলেছি তাকে না জানিয়ে অন্য কারো কাছে বিক্রি করবো না। বিক্রি করার কথা আপাতত ভাবছি না, অন্তত এই মুহূর্তে নয়।'

'আমি বলছি বেচেই দাও,' পরামর্শ দিলো রবিন। 'এক ডলারে কিনে নিরানব্বই ডলার লাভ, কম হলো?'

কিন্তু একটা কথা-বলা মড়ার খুলির স্বপ্ন দেখছে এখন কিশোর, টাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। 'বেচার কথা পরে ভাবা যাবে। দেখিই না খুলিটা আছে কিনা। কথা বলে কিনা।'

'সেটাই তো আমার ভয়,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

জবাব দিলো না কিশোর। তালায় একের পর এক চাবি ঢুকিয়ে গেল। অবশেষে লাগলো একটা চাবি। জোরে মোচড় দিতেই খুলে গেল পুরনো তালা।

ডালা তোলা হলো।

ঝুঁকে এলো তিনজনেই। ভেতরে লাল সিল্কের কাপড়ের ঢাকনা। ওটা সরাতেই বেরোলো ট্রাঙ্কের ওপরের অংশের ট্রে। তাতে ছোট ছোট কিছু জিনিস নানা রঙের কাপড় দিয়ে সুন্দর করে পুঁটুলি বাঁধা রয়েছে। এছাড়াও আছে একটা কোলাপসিবল পাখির খাঁচা, স্ট্যান্ডসহ একটা কাচের বল, কয়েক বাণ্ডিল তাস, কিছু ধাতব বাটি—ছোট-বড়, একটার মধ্যে আরেকটা সুন্দরভাবে বসে যায়। তবে পুঁটুলি দেখে মনে হলো না তার মধ্যে খুলি থাকতে পারে।

'ভেন্টলারের যাদু দেখানোর জিনিসপত্র,' বললো কিশোর। 'দেখি, তলায় থাকতে পারে ওটা।'

সে আর মুসা দু'দিক থেকে ধরে টেনে তুলে সরিয়ে রাখলো ট্রে-টা। নিচে বেশির ভাগই কাপড়-চোপড়, যদিও সাধারণ পোশাক নয়। একটা করে টেনে তুলতে লাগলো কিশোর। কয়েকটা সিল্কের জ্যাকেট, সোনালি রঙের একটা আলখেল্লা, একটা পাগড়ি, আর কিছু এশিয়ান যাদুকরদের পোশাক।

যা খুঁজছিলো, রবিন আগে দেখতে পেলো ওটা।
'ওই যে,' আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'ওই লাল কাপড়টার মধ্যে।'
'ঠিক,' বলে জিনিসটা তুলে কাপড়ের মোড়ক খুললো কিশোর।
ঝকঝকে সাদা একটা খুলি। শূন্য কোটর যেন চেয়ে আছে কিশোরের দিকে। দাঁতের ভঙ্গি বিকট মনে হলো না, বরং কেমন যেন হাসিখুশি।
'সক্রেটিস,' রবিন বললো। 'কোনো সন্দেহ নেই।'
'তলায় আরও যেন কি আছে।' খুলিটা রবিনের হাতে দিয়ে ট্রাঙ্ক থেকে আরেকটা পুঁটুলি তুলে আনলো কিশোর। বেরোলো হাতির দাঁতের তৈরি একটা চাকতি, দুই ইঞ্চি পুরু। এক পিঠে খাঁজ কাটা—তার ওপর পাতলা স্পঞ্জ লাগানো।
'মনে হচ্ছে সক্রেটিসের স্ট্যাণ্ড,' দেখতে দেখতে বললো কিশোর।
কাছেই একটা টেবিল। তাতে স্ট্যাণ্ডটা রাখলো সে। ঠিকই বলেছে। খাঁজের মধ্যে বসে গেল খুলির নিচের দিকটা। তিনজনের দিকেই চেয়ে যেন হাসছে।
'খাইছে!' এই হাসি ভালো লাগছে না মুসার। 'কথা না শুরু করে আবার। আগেই বলে দিচ্ছি, আমি এসবের মধ্যে নেই।'
'মনে হচ্ছে ডেটলারই শুধু ওকে কথা বলাতে পারতো,' মুসার কথায় কান দিলো না কিশোর। 'খুলির ভেতরে কোনো কারসাজি নেই তো?'
খুলির ভেতরটা ভালোমতো দেখলো সে। কিছু নেই। 'নাহ্,' বিড়বিড় করলো। 'নেই কিছু।' আবার স্ট্যাণ্ডে রেখে দিলো ওটা।
'সক্রেটিস,' অনুরোধ করলো কিশোর, 'কথা বলো না কিছু, শুনি।'
নীরব রইলো খুলিটা।
'হুঁ, কথা বলার মুডে নেই। দেখি তো, আর কি আছে ট্রাঙ্কে?'
তিনজনে মিলে বের করতে লাগলো জিনিসগুলো। নানারকম পোশাকের মাঝে একটা যাদুদণ্ড, আর কয়েকটা ছোট তলোয়ার পাওয়া গেল।
হঠাৎ পেছনে হ্যাঁচ্চো করে উঠলো কে যেন।
পাঁই করে ঘুরলো তিনজনে।
কই, কেউ তো নেই। শুধু খুলিটা।
তাহলে কি সক্রেটিসই হাঁচি দিলো?

পাঁচ

চোখ গোল গোল করে একে অন্যের দিকে তাকালো ছেলেরা।
'ও হাঁচি দিলো!' মুসা বললো। 'হাঁচি দেয়া আর কথা বলা একই কথা। এরপর

হয়তো কবিতা পড়তে শুরু করবে।'

'হুঁম্‌ম্।' ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'রবিন, শিওর, তুমি দাওনি?'

'আরে না না। আমার পেছনে শুনলাম হাঁচি।'

'অদ্ভুত। কিছু একটা কৌশল করে রেখেছে ডেটলার। বুঝতে পারছি না।' আবার খুলিটা তুলে নিলো কিশোর। আরেকবার উল্টে পাল্টে দেখলো। রোদের মধ্যে এনে গর্তগুলোর ভেতরে দেখলো। 'নাহ্। কোনো যন্ত্রপাতি ভরে রাখার চিহ্ন নেই। একটা তারের মাথাও না। রহস্য বটে।'

'বটে কি বলছো? রহস্যের বাপ,' বললো মুসা।

'কিন্তু খুলিটা হাঁচলো কেন? রবিনের প্রশ্ন। 'কোনো কারণ নেই। খুলির ঠাণ্ডা লাগতে পারে না।'

'কেন, জানি না,' কিশোর বললো। 'তবে চমৎকার একটা রহস্য যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছুটিয়ে মাথা খাটানো যাবে।'

'খাটাও তোমার যতো খুশি,' হাত নাড়লো মুসা। 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কাল রাতে দুই চোর এলো ট্রাঙ্ক চুরি করতে। আজ ওটার ভেতর থেকে বেরোলো একটা খুলি, হাঁচি মারে। তারপর হয়তো...'

মেরিচাচীর ডাকে তার কথায় বাধা পড়লো।

'কিশোর? কোথায় তোরা? এই কিশোর? বেরিয়ে আয় না।'

'সেরেছে,' বললো রবিন। 'এতো ডাকাডাকি? নিশ্চয় কাজ।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা। 'খাবার কথা হলে বলতো। চলো, ডাকছে যখন, না গিয়ে উপায় কি?'

'হ্যাঁ।' দ্রুতহাতে আবার সক্রেটিসকে ট্রাঙ্কে ভরে তালা লাগিয়ে দিলো কিশোর।

তিনজনে বেরিয়ে এলো ওয়ার্কশপের বাইরে।

'এই যে, আয় একটু,' মোলায়েম গলায় বললেন মেরিচাচী। 'তোর চাচা গেছে আরও মাল আনতে। বোরিস আর রোভারকে নিয়ে গেছে। এগুলো না গোছালেই নয়,' সকালের আনা মালের স্তূপ দেখালেন তিনি। 'আবার এনে রাখবে কোথায়? দে না একটু গুছিয়ে, লক্ষ্মী বাবারা আমার। খাওয়াবো।'

এই অনুরোধের পর আর না বলা যায় না।

কাজে লাগলো ওরা। মেরিচাচী বলেছেন বটে 'একটু', কিন্তু কাজ অনেক বেশি। গোছাতে গোছাতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেল। সময় মতোই খাবার দিয়ে গেলেন তিনি। খেয়ে আবার কাজে লাগলো ওরা। প্রায় শেষ করে এনেছে, এই সময় ট্রাক নিয়ে ফিরে এলেন রাশেদ পাশা। আরেক ট্রাক বোঝাই করে এনেছেন।

সারাটা বিকেলও ব্যস্ত থাকতে হলো ওদের। কাজ করছে বটে, কিন্তু কিশোরের মন পড়ে রয়েছে ট্রাঙ্কের ভেতর।

কাজ শেষ করতে করতে সন্ধ্যা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলো রবিন আর মুসা। মুসা বললো, পর দিন সকালে উঠেই চলে আসবে। রবিন জানালো, তার আসতে দেরি হবে। লাইব্রেরিতে যেতে হবে, চাকরি।

রাতের খাওয়া খেয়েই ঘুম পেলো কিশোরের। সারাদিনের খাটুনি, প্রচণ্ড ক্লান্তি, ভাবার মতো মন নেই আর এখন। উঠলো। ঘুমোতে যাওয়ার আগে খুলিটা সরিয়ে রাখবে। বলা যায় না, গতরাতে যখন এসেছিলো, আজ আসতে পারে চোর।

বাইরের চত্বর পেরিয়ে ওয়ার্কশপে এসে ঢুকলো কিশোর। তালা খুলে খুলি আর হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডটা বের করে নিলো। ট্রাঙ্কের সমস্ত জিনিসগুলো আবার ভরে রেখে তালা লাগিয়ে দিলো। ট্রাঙ্কটা লুকিয়ে রাখলো ছাপার মেশিনটার ওধারে, ওপরে কয়েকটা ক্যানভাস চাপা দিয়ে দিলো। ট্রাঙ্ক এখানেই থাক, কিন্তু খুলির ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

খুলি হাতে বসার ঘরে এসে ঢুকলো কিশোর। এঘর দিয়েই তার ঘরে যেতে হয়।

আঁতকে উঠলেন মেরিচাচী। 'ওটা কি রে, কিশোর? ওই মড়ার খুলি নিয়ে এসেছিস কোথেকে?'

'ও সক্রেটিস,' বললো কিশোর। যেন এতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, বুঝে যাবেন মেরিচাচী। 'ভাবলাম, রাতে কথা বলতে পারে, তাই নিয়ে এলাম।'

'কথা বলবে?' খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন রাশেদ পাশা। 'কি বলবে? দেখতে বুদ্ধিমানই লাগছে। গোয়েন্দা নাকি?'

'না, যাদুকর।'

'কোথেকে কি সব নিয়ে আসে!' বিড়বিড় করলেন মেরিচাচী। 'এই, তুই যা তো, সরা ওটা আমার চোখের সামনে থেকে। রাস্তায় ফেলে দে গিয়ে।'

ফেলার তো প্রশ্নই ওঠে না। শোবার ঘরে এনে সযত্নে দেরাজের ওপর রেখে দিলো কিশোর। খাওয়ার পর ঘুম আসছিলো বটে, এখন চলে গেছে। কাজও কিছু নেই। নিচে নেমে এলো আবার টেলিভিশন দেখার জন্যে।

তা-ও বেশিক্ষণ ভালো লাগলো না। আবার উঠে এলো শোয়ার ঘরে। চুপচাপ বসে সক্রেটিসের দিকে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো। না, কথা বলবে বলে মনে হয় না। বোঝা যাচ্ছে, ডেটলার সামনে না থাকলে বলে না। তারমানে ভেনট্রিলোকুইজমই। অসাধারণ ক্ষমতাশালী ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট ছিল ডেটলার।

বিছানায় শুয়ে বাতি নিভিয়ে দিলো কিশোর।

সবে তন্দ্রা লেগেছে, টুটে গেল মোলায়েম শিসের শব্দে।

আবার শোনা গেল শিস। মনে হলো ঘরের ভেতরেই।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেল কিশোর। উঠে বসলো বিছানায়।

'কে? চাচা?' জিজ্ঞেস করলো। ভাবলো, বুঝি আবার কোনো মজা করতে এসেছেন।

'আমি,' দেরাজের দিক থেকে ভেসে এলো মোলায়েম স্বর, 'সক্রেটিস।'

'সক্রেটিস?' ঢোক গিললো কিশোর।

'সময় এসেছে···কথা বলার। না না···বাতি জ্বেলো না। শোনো···ভয় পেও না। শুনছো?···বুঝতে পারছো?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে যেন।

অন্ধকারে খুলিটা দেখার চেষ্টা করলো কিশোর। দেখা গেল না। আরেকবার ঢোক গিলে বললো, 'হ্যাঁ, শুনছি।'

'গুড। নিশ্চয় যাবে···কাল···তিনশো এগারো নম্বর কিং স্ট্রীটে। কোড ওয়ার্ড···সক্রেটিস। বুঝতে···পারছো?'

'পারছি।' সাহস করে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'কিন্তু কেন? কে কথা বলছো?'

'আমি···সক্রেটিস।' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ফিসফিসে মোলায়েম স্বর।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলো কিশোর। আগের মতোই বসে আছে সক্রেটিস, তার দিকে চেয়ে। হাসছে নীরব হাসি।

খুলিটা কথা বলেনি। বলতে পারে না। কিন্তু কিশোর নিশ্চিত এ-ঘর থেকেই কথা শোনা গেছে। জানালার বাইরে থেকে নয়।

জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিলো সে।

শান্ত, নির্জন চত্বর।

তাজ্জব কাণ্ড।

আবার বিছানায় ফিরে এলো কিশোর।

একটা মেসেজ দেয়া হয়েছে তাকে। আগামী দিন তিনশো এগারো নম্বর কিংস স্ট্রীটে যাওয়ার অনুরোধ। যাবে কি?—প্রশ্ন করলো নিজেকেই।

নিশ্চয়। রহস্য আরও জমে উঠছে, জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে; এই তো চাই।

ছয়

'আমার যাওয়া লাগবে না?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

ইয়ার্ডের ছোট ট্রাকটার সামনের সিটে পাশাপাশি বসে আছে সে আর কিশোর। ড্রাইভিং সিটে বোরিস।

তিনশো এগারো নম্বর বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। পুরনো, বড় অট্টালিকা। বারান্দার সামনে সাইনবোর্ড, রঙ-চটা, মলিন। শুধু 'রুমস' শব্দটা পড়া যায়। নিচে একটা 'নো ভ্যাকানসিজ' নোটিশ।

আশপাশের বাড়িগুলোরও একই দশা। জীর্ণ বিবর্ণ, বয়েসের ভারে ধুঁকছে। আরও বোর্ডিং হাউস আছে, স্টোর আছে কয়েকটা, সবগুলোই মেরামত দরকার। রাস্তায় কয়েকজনকে দেখা গেল, সবাই বৃদ্ধ। বোঝা যায়, দরিদ্র কিংবা কম-আয়ের বুড়োদের এলাকা এটা।

'না,' জবাব দিলো কিশোর। 'বসে থাকো এখানে। ভয় নেই, আমার কোনো বিপদ হবে না।'

'তুমিও না গেলে পারতে,' ভয়ে ভয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো মুসা। 'খুলি বললো আসতে, আর অমনি হুট করে চলে আসাটা উচিত হয়নি। অন্ধকারে বলেছে বললে না?'

'কি জানি, সত্যিই বলেছে কিনা। এমনও তো হতে পারে, স্বপ্ন দেখেছি আমি। কিন্তু স্বপ্নই হোক আর সত্যিই হোক, ঠিকানা মতো বাড়িটা তো পেয়েছি। আর পেয়েছি যখন, ভেতরে না ঢুকে আমি যাচ্ছি না। বিশ মিনিটের মধ্যে আমি ফিরে না এলে তুমি আর বোরিস ঢুকবে।'

'বেশ। কিশোর, আমার ভাল্লাগছে না। এই কেসের কিছু কিছু জিনিস একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'ঠিক আছে। যদি কোনো বিপদে পড়ি, গলা ফাটিয়ে চিল্লাবো।'

'তাই করো,' বললো বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। 'যাও, কোন্ ব্যাটা কি করবে? আমি আছি না।' মুঠো পাকিয়ে দেখালো সে।

'থ্যাংকিউ,' বলে ট্রাক থেকে নামলো কিশোর।

পথ পেরিয়ে সামনের ছোট বারান্দায় উঠলো। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে এসে দাঁড়ালো একটা দরজার কাছে। কলিং বেলের বোতাম টিপলো।

তার মনে হলো, দীর্ঘ এক যুগ পরে যেন পায়ের আওয়াজ শোনা গেল ভেতরে।

খুলে গেল দরজা। কালো চামড়ার একজন ছোটখাটো লোক। পুরু গোঁফ। 'কি চাই? রুম? নেই। সব ভর্তি।'

লোকটার কথায় বিদেশী টান। কোন দেশী, বুঝতে পারলো না কিশোর। চেহারায় বোকা বোকা ভাব ফুটিয়ে তুলে বললো, 'মিস্টার সক্রেটিসকে খুঁজতে এসেছি।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা। তারপর পিছিয়ে গেল। 'এসো। দেখি আছে নাকি।'

ঘরের ভেতরে পা রাখলো কিশোর। চোখ মিটমিট করলো মৃদু আলোয়। ছোট, ধুলায় ধূসর একটা হলঘর। তার ওধারে আরেকটা বড় ছড়ানো ঘর। অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল। কয়েকজন লোক, কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ তাস খেলছে। সবারই কালো চামড়া, কুচকুচে কালো চুল, পেশীবহুল শরীর। সবাই মুখ তুলে দেখলো কিশোরকে, কারও চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না।

তাকে দাঁড়াতে বলে চলে গেল, যে দরজা খুলেছিলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, 'এসো, শেরিনা দেখা করবে তোমার সাথে।'

পথ দেখিয়ে কিশোরকে আরেকটা ঘরে নিয়ে এলো লোকটা। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রোদে আলোকিত ঘর। আবছা অন্ধকার থেকে এসে প্রথমে কিছুই চোখে পড়লো না কিশোরের। আলো চোখে সয়ে আসার পর দেখলো মহিলাকে, বড় একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে। সেলাই করছিলো কি যেন। সেলাই থামিয়ে পুরনো ডিজাইনের চশমার ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমি শেরিনা, জিপসি,' বললো বৃদ্ধা, নরম, নীরস কণ্ঠ। 'কি চাই? হাত দেখাবে?'

'না, ম্যা'ম,' বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কিশোর। 'মিস্টার সক্রেটিস আমাকে এখানে আসতে বলেছে।'

'ও, মিস্টার সক্রেটিস। কিন্তু মিস্টার সক্রেটিস তো মৃত।'

খুলিটার কথা ভাবলো কিশোর। ভুল বলেনি বৃদ্ধা। সক্রেটিস সত্যি মৃত।

'এবং তার পরেও তোমার সংগে কথা বললো,' বিড়বিড় করলো মহিলা। 'অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত। বসো, ইয়াং ম্যান। ওই যে টেবিলটার ধারে। কাচের বলের মধ্যে দেখতে হবে আমাকে।'

হাতির দাঁতের অলংকরণ করা, দামী কাঠের তৈরি ছোট একটা টেবিলের কাছে বসলো কিশোর।

উঠে এসে উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসলো শেরিনা। বিচিত্র ডিজাইনে

তৈরি টেবিলের নিচের খোপ থেকে বের করলো ছোট একটা বাক্স। তার ভেতর থেকে বেরোলো বড় একটা কাচের বল। টেবিলের মাঝখানে রাখলো বলটা।

'চুপ!' চুপ করেই আছে কিশোর, তা-ও হিসিয়ে উঠলো শেরিনা। 'একেবারে চুপ। কোনো কথা বলবে না। বলটাকে বিরক্ত করবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো কিশোর।

টেবিলের ধার দু'হাতে খামচে ধরে নিচু হয়ে চকচকে বলটার দিকে তাকালো শেরিনা। পাথরের মতো স্থির। নিঃশ্বাস ফেলছে না। দীর্ঘ সময় পেরোলো। অবশেষে কথা বললো সে, বিড়বিড় করে, 'ট্রাঙ্কটা দেখতে পাচ্ছি। লোক...অনেক লোক, অনেকেই চাইছে ওটা। আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি। ভয় পেয়েছে। ওর নামের প্রথম অক্ষর "ও"...না না, "ডি"। ভয় পেয়েছে, সাহায্য চাইছে। তোমাকে সাহায্য করতে বলছে।...টাকা। আরে, অনেক টাকা! অনেকেই চাইছে টাকাগুলো। কিন্তু ওগুলো লুকানো। ধোঁয়ার আড়ালে...মিলিয়ে যাচ্ছে। গেল, যাহ্। কেউ জানে না, কোথায় লুকালো।

'ধোঁয়া, না, মেঘে ঢেকে যাচ্ছে বলটা। লোকটা চলে যাচ্ছে। হারিয়ে গেল মানুষের দুনিয়া থেকে। না, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

সোজা হয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললো মহিলা। 'বলের ভেতরে দেখতে খুব কষ্ট হয় আজকাল। বয়েস হয়েছে তো। একবার দেখলেই হাঁপিয়ে পড়ি! আজ আর দেখতে পারবো না। তা, যা যা বললাম, কিছু বুঝতে পেরেছো?'

ভুরু কোঁচকালো কিশোর। গাল চুলকালো। 'কিছু কিছু। একটা ট্রাঙ্ক আছে আমার কাছে, অনেকেই চাইছে ওটা। আর ডি বোধহয় ডেটলারের নামের আদ্যক্ষর। দা গ্রেট ডেটলার।'

'দা গ্রেট ডেটলার,' বিড়বিড় করলো মহিলা, 'জিপসিদের বন্ধু। কিন্তু ও-তো হারিয়ে গেছে।'

'আপনি বললেন, মানুষের দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে। এর মানে কি?'

'বলতে পারবো না,' মাথা নাড়লো বৃদ্ধা। 'তবে বল মিছে কথা বলে না। আমরা, জিপসিরা ডেটলারকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে চাই, ও আমাদের বন্ধু। হয়তো তুমি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। তুমি চালাক। বয়েস কম বটে, কিন্তু অনেক বড় মানুষের চেয়ে তোমার নজর চোখা। এমন অনেক কিছুই দেখে ফেলো তুমি, যা বড়দেরও নজর এড়িয়ে যায়।'

'কিভাবে সাহায্য করবো বুঝতে পারছি না। ডেটলারের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানি না। আর টাকার কথা তো এই প্রথম শুনলাম। ডেটলারের পুরনো একটা ট্রাঙ্ক কিনেছি

নীলামে। তার মধ্যে কথা-বলা একটা খুলি আছে, সক্রেটিস। ও-ই এখানে আসতে বললো আমাকে। ব্যস, আর কিছু জানি না।'

'দীর্ঘ যাত্রার শুরুতে প্রথমে একটা কদমই ফেলতে হয়,' রহস্যময় কণ্ঠে বললো মহিলা। 'তারপর আরেক কদম, তারপর আরও এক কদম, এভাবেই এগিয়ে যেতে হয়। যাও এখন। চোখ-কান খোলা রাখো। হয়তো আরও কিছু জানতে পারবে। ট্রাঙ্কটা নিরাপদে রাখবে। সক্রেটিস আর কিছু বললে, মন দিয়ে শুনবে। গুড বাই।'

উঠলো কিশোর। গোঁফওয়ালা সেই জিপসিটা হলের দরজার বাইরে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল তাকে।

ট্রাকেই বসে আছে বোরিস আর মুসা।

'এই যে, কিশোর, এসেছো,' দেখেই বলে উঠলো মুসা। 'আমরা নামতে যাচ্ছিলাম।' কিশোর পাশে উঠে বসলে বললো, 'কিছু হয়নি তো?'

'হয়েছে,' চুপ করলো কিশোর। গাড়ি ঘোরাচ্ছে বোরিস। ঘোরানোতক অপেক্ষা করলো সে, তারপর আবার বললো, 'মানে, হয়েছে অনেক কিছুই। কি হয়েছে বলতে পারবো না।'

'আরি। এটা কেমন কথা?'

সব খুলে বললো কিশোর।

শিস দিয়ে উঠলো মুসা। 'এ-তো পেটের অসুখের মিক্সচারের চেয়েও জটিল। মানুষের দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে। টাকা গিয়ে ধোঁয়ার আড়ালে লুকিয়েছে। সব বাজে কথা। ফালতু বকর বকর।'

'ফালতু না হলেও, অদ্ভুত।'

মানে? তোমার কি মনে হয় অনেক টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছে ডেটলারের ট্রাঙ্কে? সক্রেটিসকে পেয়ে এতোই উত্তেজিত হয়েছিলাম আমরা, এরপর আর ভালো করে দেখা হয়নি অবশ্য। ট্রাঙ্কে টাকা লুকানো থাকলে অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। বুঝতে পারবো, ট্রাঙ্কটার জন্যে পাগল হয়ে গেছে কেন লোকে।'

'আমিও তা-ই ভাবছি। সক্রেটিসের জন্যে নয়, আসলে টাকার জন্যেই পাগল হয়েছে ওরা। গিয়ে ভালো করে দেখবো আবার ট্রাঙ্কে···কি হলো, বোরিস? হঠাৎ স্পীড বাড়ালেন?'

'পিছু নিয়েছে আমাদের,' ঘোঁৎঘোঁৎ করলো বোরিস। 'অনুসরণ করছে।' অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ আরও বাড়লো। 'কালো একটা গাড়ি। ভেতরে দু'জন লোক।'

ফিরে তাকালো কিশোর আর মুসা। পেছনের জানালার ভেতর দিয়ে দেখলো

গাড়িটা।

কাছে এসে গেল গাড়ি। ওদের পাশ কাটিয়ে আগে বাড়ার চেষ্টা করলো। সাইড দিলো না বোরিস। পথ এখানে সরু, সামনে আর কোনো গাড়ি নেই। পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে চললো সে, কিছুতেই পাশ কাটাতে দিলো না পেছনের গাড়িটাকে।

আধ মাইল মতো চললো এভাবে। তারপর সামনে দেখা গেল ফ্রীওয়ে। ওরকম ফ্রীওয়ে অনেক আছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। শহরের জনবহুল এলাকাগুলোতেই এসব রাস্তা বেশি। চার থেকে আটটা গাড়ি পাশাপাশি চলাচল করতে পারে এরকম চওড়া বড় বড় সব রাস্তা চলে গেছে মূল রাস্তার ওপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে, অনেকটা ওভারব্রিজের মতো। নিচের পথে লোক চলাচলের যাতে অসুবিধে না হয়, ট্রাফিক জ্যাম না ঘটে, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এসব রাস্তায় ট্রাফিক লাইট থাকে না।

'ওপর দিয়ে যাবো,' বললো বোরিস। 'থামানোর চেষ্টা করতে পারবে না। পাশও কাটাতে পারবে না।'

বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে ফ্রীওয়েতে উঠে গেল সে। দু'দিকেই গাড়ি চলাচল করছে।

পেছনের গাড়িটা বুঝলো, চেষ্টা করে আর লাভ নেই। সাইড পাবে না। থামাতে পারবে না ট্রাকটাকে। তাছাড়া ফ্রীওয়েতে থামা বেআইনী। নিচের রাস্তায় নেমে গেল ওটা, আর দেখা গেল না।

'ভুল করেছি,' আনমনে মাথা নাড়লো বোরিস। 'ব্যাটাদের ধরা উচিত ছিলো। ভালো করে মাথায় মাথায় ঠুকে দিলে আচ্ছা শিক্ষা হতো। কিশোর, কোথায় যাবো এবার?'

'বাড়ি,' জবাব দিলো কিশোর। 'মুসা, কি হয়েছে তোমার? অমন গুম হয়ে আছো কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না। একটা মড়ার খুলি, রাতে কথা বলে। পুরনো একটা ট্রাঙ্কের জন্যে লোকের আগ্রহ, আমাদের পিছু নেয়া, এসব মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। ভয় পাচ্ছি আমি কিশোর। এই রহস্যের কথা আমাদের ভুলে যাওয়াই উচিত।'

'ভুলতে চাইলেই কি আর ভুলা যায়?' চিন্তিত মনে হলো কিশোরকে। 'এটা এমন এক রহস্য, ভুলতে পারবো না। আমরা চাই বা না চাই, এর সমাধানও বোধহয় আমাদেরকেই করতে হবে।'

সাত

ইয়ার্ডে ফিরতেই ওদের ওপর কাজ চাপিয়ে দিলেন মেরিচাচী।

দুপুর পর্যন্ত ব্যস্ত রইলো ওরা। খাওয়ার সময় হলো। এই সময় এলো রবিন। খাবে না, মাথা নাড়লো, বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে। মুসা আর কিশোর খেয়ে নিলো। তারপর তিনজনে এসে ঢুকলো তাদের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে।

সকালের সমস্ত ঘটনা রবিনকে খুলে বললো কিশোর। সব শেষে বললো, 'শেরিনার কথায় যা বুঝলাম, বেশ কিছু টাকা কোনোভাবে হারিয়ে গেছে। আর এই টাকা হারানোর সঙ্গে ডেটলারের গায়েব হওয়ার কোনো সম্পর্ক আছে।'

'হয়তো টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে ইউরোপে পালিয়ে গেছে,' বললো রবিন।

'না। শেরিনা বললো, ডেটলার সাহায্য চায়। মানুষের দুনিয়া থেকে সে হারিয়ে গেছে, আবার ফিরে আসতে চায়। জিপসিরা তাকে সহায়তা করতে রাজি। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত। যা-ই হোক, টাকা নিয়ে ডেটলার নিখোঁজ হয়নি, টাকার জন্যেই হয়েছে।'

'টাকাগুলো ট্রাঙ্কে লুকানো আছে কিনা দেখলেই হয়,' মনে করিয়ে দিলো মুসা।

'কিন্তু কেন রাখতে যাবে ট্রাঙ্কে? রাখুক আর না রাখুক, দেখি খুলে।'

ক্যানভাস সরিয়ে ট্রাঙ্কটা বের করে আনা হলো।

আধ ঘন্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করলো ওরা। ভেতরে যতো পুঁটুলি আছে, সব খুলে খুলে দেখলো। টাকার চিহ্নও নেই। দামী কোনো জিনিসও না।

'নেই,' হতাশ হয়ে একটা বাক্সের ওপর বসে পড়লো মুসা।

'ট্রাঙ্ক-সুটকেসের লাইনিঙের তলায় অনেক সময় টাকা লুকানো থাকে,' বলে উঠলো কিশোর। 'সিনেমায় দেখোনি? ওই যে, ওই কোণায় লাইনিং ছেঁড়া দেখা যাচ্ছে।'

'ছেঁড়া তো ছোট,' বললো রবিন। 'ওর মধ্যে ক'টা টাকা আর ধরবে?' বলতে বলতে আঙুল ঢুকিয়ে দিলো ফুটোর ভেতরে। 'আরে, আছে কি যেন!' চেঁচিয়ে উঠলো। 'কাগজ! বোধহয় টাকা!'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে সাবধানে বের করে আনলো ওটা। 'নাহ, টাকা তো না। পুরনো চিঠি।'

'দেখি তো,' হাত বাড়ালো কিশোর।

খামের ওপরে ডেটলার এবং একটা হোটেলের নাম লেখা। পোস্টমার্ক দেখে বোঝা

গেল, বছরখানেক আগের চিঠি। ওই সময়ই নিখোঁজ হয়েছিলো সে। তার আগেই ট্রাঙ্কের লাইনিঙের ভেতরে লুকিয়ে ফেলেছিলো চিঠিটা। তারমানে, এটা গুরুত্বপূর্ণ।

'টাকার সূত্র হয়তো এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে,' রবিন বললো। 'ম্যাপ-ট্যাপ কিছু আছে। দেখো না খুলে।'

খাম খুলে একটা কাগজ বের করলো কিশোর। চিঠিই । লেখা আছেঃ

স্টেট প্রিজন হসপিটল

জুলাই ১৭

ডিয়ার ডেটলার,

আমি ডেন কারমল। চিনতে পারছো নিশ্চয়ই? হাজার হোক, তুমি আমার বন্ধু, জেলে একই কামরায় ছিলাম। আমি এখন হাসপাতালে। আর বেশিদিন বাঁচবো না।

ঠিক কতোদিন বাঁচবো আর, বলতে পারবো না। পাঁচ দিনও হতে পারে, তিন হপ্তা, কিংবা হয়তো দু'মাস, ডাক্তাররা শিওর না। তবে টিকবো না আর। হয়তো তোমার কাছে এইই আমার শেষ চিঠি।

আরেকটা কথা, কখনও যদি শিকাগোয় যাও, আমার মামাতো ভাই ড্যানি স্ট্রীটের সঙ্গে দেখা করো। তাকে আমার খবর জানিও। ইচ্ছে হচ্ছে আরো অনেক কিছু লিখি, কিন্তু পারছি না।

তোমার বন্ধু

ডেন।

'এ-তো সাধারণ একটা চিঠি,' পড়ে বললো মুসা। 'এটার কোনো গুরুত্ব নেই।'

'কি জানি,' মুসার সঙ্গে একমত হতে পারলো না কিশোর, 'থাকতেও পারে।'

'ঠিকই। গুরুত্ব না থাকলে ডেটলার নিখোঁজ হবে কেন?' রবিন বললো।

'আমার মনের কথাটা বলেছো। কেন লুকালো? কারণ চিঠিটাকে গুরুত্ব দিয়েছে।'

মাথা চুলকালো মুসা। 'তবে টাকার সঙ্গে এই চিঠির সম্পর্ক নেই।'

'জেল-হাসপাতাল থেকে চিঠিটা লিখেছে ডেন কারমল,' বললো রবিন। 'কয়েদীদের সব চিঠি ভালোমতো দেখে, পরখ করে তারপর বিলি করা হয়। টাকার কথা খোলাখুলি লেখা সম্ভব ছিলো না। জেল-কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে।'

'যদি না গোপন কোনো সংকেতের মাধ্যমে না লেখে,' রবিনের কথার শেষে যোগ করলো কিশোর।

'অদৃশ্য কালি-টালি দিয়ে লিখেছে বলতে চাইছো?' প্রশ্ন করলো মুসা।

'অসম্ভব না। চলো, ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষা করি।'

দুই সুড়ঙের ঢাকনা সরিয়ে পাইপের ভেতরে ঢুকলো কিশোর। তার পেছনে রবিন। সব শেষে মুসা।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা।

প্রথমে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চিঠিটার প্রতিটি ইঞ্চি দেখলো কিশোর।

'কিছু নেই,' জানালো সে। 'দেখি অন্য টেস্ট করে।'

একটা জার থেকে খানিকটা অ্যাসিড নিয়ে কাচের বীকারে ঢাললো কিশোর। অ্যাসিডের বাষ্পের ওপর টান টান করে মেলে ধরলো চিঠিটা। নেড়েচেড়ে দেখলো। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

'যা ভেবেছি,' বললো সে। 'জেলখানায় অদৃশ্য কালি পাবে কোথায়? বড় জোর লেবু পাওয়া যাবে। লেবুর রস খুব সাধারণ অদৃশ্য কালির কাজ করে। ওই রস দিয়ে কাগজে লিখলে এমনিতে দেখা যায় না, কিন্তু কাগজটা গরম করলে লেখাগুলো ফোটে। তা-ই দেখি এবার।'

ছোট একটা গ্যাস বার্নার ধরালো কিশোর। কাগজটাকে শিখার ওপর ধরে গরম করতে লাগলো।

'নাহ্, কিছুই নেই,' বললো সে। 'দেখি খামটাতে কিছু আছে কিনা।'

কোন পরীক্ষায়ই ফল হলো না। খামেও পাওয়া গেল না লেখা।

হতাশ হলো কিশোর। 'সাধারণ চিঠিই বোধহয়। কিন্তু তাহলে লুকিয়ে রাখলো কেন ডেটলার?'

'হয়তো ভেবেছে সূত্র-টুত্র আছে এটাতে, তারপর আর পায়নি,' রবিন বললো। 'শোনো, এমনও হতে পারে, জেলে থাকতেই লুকানো টাকার কথা ডেটলারকে বলেছে কারমল, কোথায় আছে সেটা বলেনি। হয়তো এ-ও বলেছে, তার যদি কিছু হয়ে যায়, টাকাগুলো যেন খুঁজে বের করে ডেটলার।

'তারপর সত্যি সত্যি অসুখে পড়লো কারমল। এমন অসুখ, আর বাঁচবে না। বন্ধুকে চিঠি লিখলো সে। অন্যের কাছে না হলেও হয়তো ডেটলারের কাছে চিঠিটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তাই লুকিয়ে রেখেছে।

'কথাটা গোপন থাকেনি। কোনোভাবে জেনে গেছে আর কেউ, হয়তো ওই জেলেরই অন্য কোনো কয়েদী। ডেটলার আর কারমলের মাঝে পত্র বিনিময় যে হয়, এটাও জেনেছে। জানিয়ে দিয়েছে তার বাইরের বন্ধুদেরকে। তাদের ভয়েই গা ঢাকা দিয়েছে ডেটলার। পুলিসের কাছে যেতে পারেনি, কারণ, কি বলবে পুলিসকে? না লুকিয়েও উপায় ছিলো না। টাকা কোথায় আছে, এই কথা আদায়ের জন্যে তার ওপর অত্যাচার চলতে পারে। ঠিক বলছি?'

'যুক্তি আছে,' সায় জানালো কিশোর। 'হয়তো এরকমই কিছু ঘটেছে। তবে এই চিঠি ছাড়া আর কিছু পাঠাতে পারেনি কারমল, পুলিসের সন্দেহ হবে এরকম কিছু পাঠানোও সম্ভব ছিলো না। পুলিসের হাত হয়েই আসে।'

'চিঠিতেও কিছু নেই, ট্রাঙ্কেও নেই,' মুসা বললো, 'তাহলে এটা রেখেছি কেন আমরা? লোকে পাগল হয়ে গেছে এটার জন্যে। এটা হাতে পাওয়ার জন্যে দরকার হলে মানুষ মারতেও দ্বিধা করবে না ওরা, আমি শিওর। খামোখা এটা রেখে বিপদে পড়ে লাভ কি?'

কেউ জবাব দিলো না।

'আমি বলি কি,' আবার বললো সে, 'হ্যামলিনকেই দিয়ে দেয়া যাক। কড়কড়ে নিরানব্বই ডলার লাভ।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'শেরিনা বলছিলো, আমরা সাহায্য করতে পারবো। এখন আর আমার সেরকম মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, হ্যামলিনকেই ফোন করে দিই, এতোই যখন চাইছে। তবে, একশো ডলার নিচ্ছি না আমি। এক ডলারে কিনেছি, এক ডলারেই বেচবো। লাভের অতো দরকার নেই।'

'নিরানব্বই ডলার ছেড়ে দেবে?'

'দেবো। ট্রাঙ্কটা এখন আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আরেকজন লোক নিয়ে গিয়ে বিপদেও পড়বে, একশো ডলারও খরচ করবে, এটা বোধহয় উচিত না।...দাঁড়াও, আগে চিঠিটার ছবি তুলে নিই।'

বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে চিঠি আর খামের কয়েকটা ছবি তুললো কিশোর। তারপর ফোন করলো হ্যামলিনকে।

যাদুকর জানালো, রওনা দিচ্ছে সে।

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। চিঠিটা আবার রেখে দিলো লাইনিঙের ভেতরে, আগের জায়গায়। ট্রাঙ্কের জিনিসপত্র যেটা যেখানে যেভাবে ছিলো, সেভাবেই রাখলো যতোটা সম্ভব। শেষে, সক্রেটিসকে আনতে ঘরে চললো কিশোর।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলো আতংকিত চোখে খুলিটার দিকে তাকিয়ে আছেন মেরিচাচী।

'কিশোর!' দেখেই বলে উঠলেন তিনি। 'ওটা...ওটা...' বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

'কি, চাচী?'

'ওটা...জানিস কি করেছে? আমাকে টিটকারি দিয়েছে!'

'টিটকারি?'

'হ্যাঁ। ঘরটা পরিষ্কার করতে ঢুকলাম, আর ওই বিচ্ছিরি জিনিসটা...,' রেগে

উঠলেন তিনি। 'কাল রাতেই তোকে বলেছিলাম ফেলে দিয়ে আসতে। যা, এক্ষুণি নিয়ে যা...'

'তোমার সংগে রসিকতা করেছে আরকি। যাদুকরের জিনিস তো,' মুচকি হাসলো কিশোর।

'হাসছিস! তুই হাসছিস! আমার সংগে রসিকতা করে...আর একটা কথা বলবি না। যা, নিয়ে যা ওটা এখান থেকে। সাবান দিয়ে হাত না ধুয়ে আর ঘরে ঢুকবি না।'

'যাচ্ছি যাচ্ছি,' হাত তুললো কিশোর। 'ওটা নেয়ার জন্যেই এসেছি।'

'বাড়ির ধারেকাছে যেন না থাকে। দূরে কোথাও ফেলবি। হতচ্ছাড়া খুলি...বেঁচে থাকতেও নিশ্চয় খুব শয়তান ছিলো লোকটা...'

খুলি আর হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডটা নিয়ে ওয়ার্কশপে ফিরে এলো কিশোর। মেরিচাচীকে যে টিটকারি দিয়েছে খুলি, একথা জানালো দুই সহকারীকে।

'আশ্চর্য!' রবিন বললো। 'মেরিচাচীকে টিটকারি দিতে যাবে কেন?'

'বেশি রসিক আরকি,' বললো মুসা। 'ভরো, এটাকে কাপড়ে প্যাঁচাও। বিদেয় হোক।'

'ভাবছি,' গালে আঙুল রাখলো কিশোর, 'রেখেই দেবো নাকি এটাকে? ট্রাঙ্কটাও? আরও কিছু পরীক্ষা...'

'না না, কোনো দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে খুলিটা প্যাঁচাতে শুরু করলো মুসা। 'মেরিচাচী বলেছে ফেলে দিয়ে আসতে, এরপর আর রাখা যাবে না। তাছাড়া হ্যামলিনকেও কথা দিয়ে ফেলেছি। ও চলে আসছে। জাহান্নামে যাক বেতমিজ খুলি, ভদ্রমহিলার সম্মান করতে জানে না। আর কিশোর, তোমাকেও বলি, সব রহস্যেরই সমাধান করতে হবে আমাদের, এমন কোনো খত তো কারো কাছে লিখে দিইনি।'

দড়াম করে ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো সে।

তর্ক করতে যাচ্ছিলো কিশোর, বাধা পড়লো বোরিসের ডাকে। 'কিশোর? এই কিশোর, কোথায় তোমরা? এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।'

বাইরে বেরিয়ে দেখলো ওরা, যাদুকরই।

'এই যে, ছেলেরা,' বলে উঠলো হ্যামলিন। 'ডেটলারের ট্রাঙ্ক শেষতক বেরোলো।' এমন একটা ভাব করলো, যেন এটা তার নিজেরই কৃতিত্ব, যাদুর জোরে বের করেছে।

'হ্যাঁ,' বললো কিশোর। 'নিয়ে যেতে পারেন।'

হাত ঝাকুনি দিলো যাদুকর। বেরিয়ে এলো একশো ডলার।

'এতো টাকা লাগবে না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'এক ডলার দিলেই হবে।'

গম্ভীর হলো যাদুকর। 'আমার ওপর কেন এই দয়া, জানতে পারি? ভেতরের জিনিসপত্র কিছু রেখে দিয়েছো নাকি?'

'না। যা ছিলো, সবই আছে। সত্যি কথাই বলি, ট্রাঙ্কটা আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অনেকেই চাইছে এটা। শেষে কোন বিপদে পড়বো...'

'বুঝলাম,' হাসলো যাদুকর। 'সব বিপদ তাই আমার ঘাড়ে চালান করে দিতে চাইছো। দাও, আমি ওসবের পরোয়া করি না। একশো ডলার নিলেও পারতে। ইচ্ছে করে দিচ্ছি।'

'না, এক ডলার।'

'বেশ,' কিশোরের কানের কাছে হাত নিয়ে এলো হ্যামলিন। কানের ভেতর থেকে টেনে বের করলো এক ডলার। 'নাও।'

ট্রাঙ্কটা এনে দেয়া হলো যাদুকরকে। 'ওটা গাড়ির পেছনের সিটে তুলে দিতে অনুরোধ করলো সে। ধরাধরি করে তার নীল স্যালুনে তুলে দিলো ছেলেরা। কেউই খেয়াল করলো না, তাদেরকে লক্ষ্য করছে দুই জোড়া চোখ।

গাড়িতে উঠলো হ্যামলিন। 'এরপর কোথাও যাদু দেখাতে গেলে তোমাদের নিয়ে যাবো সংগে করে।'

'থ্যাংকি, স্যার,' বললো কিশোর।

ইয়ার্ডের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

'যাক, বাবা, বাঁচা গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা। 'হ্যামলিন নিয়ে গিয়ে কি করবে? নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখবে খুলিটা কিভাবে কথা বলে? দেখুকগে। যা খুশি করুক, আমাদের কি? আমাদের ঘাড় থেকে তো নামলো।'

আট

সারাটা বিকেল আর কিছু ঘটলো না।

সকাল সকাল বাড়ি ফিরলো রবিন। দেখে, তার বাবা বাড়িতেই বসে আছেন। এসময়ে সাধারণত বাইরেই থাকেন তিনি। বড় পত্রিকায় কাজ করেন, তাই অনেক কাজ থাকে। আজ হয়তো কাজ নেই, বাড়ি চলে এসেছেন।

'রবিন,' খাবার টেবিলে খেতে বসে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'পত্রিকায় তোমাদের ছবি দেখলাম। পুরনো একটা ট্রাঙ্ক নাকি নীলামে কিনে এনেছো? ভেতরে ইন্টারেসটিং কিছু পেলে?'

'পেয়েছি। একটা কথা–বলা খুলি। নাম সক্রেটিস।'

'কথা–বলা খুলি, তার নাম আবার সক্রেটিস!' আঁতকে উঠলেন যেন মিসেস মিলফোর্ড। 'কথা বলেছে নাকি তোর সংগে?'

'না, মা, আমার সংগে বলেনি।' কিশোরের সংগে বলেছে একথা বলতে গিয়েও বললো না।

'ম্যাজিশিয়ানের জিনিস তো। কোনোরকম চালাকি করে রেখেছে ভেতরে,' হেসে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কি যেন নাম…'

'ডেটলার…'

'লোকটা নিশ্চয়ই খুব উঁচুদরের ভেনট্রিলোকুইস্ট ছিলো। কিশোর রেখে দিয়েছে নাকি খুলিটা?'

'না, বেচে দিয়েছে। আরেক যাদুকর এসে কিনে নিয়ে গেছে, ডেটলার নাকি তার বন্ধু ছিলো। নাম কি একেকজনের। দা গ্রেট ডেটলার, হ্যামলিন দা মিসটিক…'

'কি বললে?' মুখ তুললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হ্যামলিন দা মিসটিক? অফিস থেকে বেরোনোর আগেই তো শর্ট নিউজ করে দিয়ে এলাম। বিকেলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

হ্যামলিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? অবাক হয়ে ভাবলো রবিন, খুলিটা দুর্ভাগ্যের কারণ হলো না তো…তার ভাবনায় বাধা পড়লো। মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'ইয়টে করে সাগরে বেরোবে নাকি?' ছেলের চেহারার পরিবর্তন দেখে হাসলেন। 'আগামী রোববার। আমার এক বন্ধু তার ইয়টে দাওয়াত করেছে। ক্যাটালিনা আইল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবে।'

'তাই নাকি!' খাওয়া ভুলে চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। হ্যামলিনের কথা বেমালুম ভুলে গেল। পরদিন সকালে যখন পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে এলো, তখনও মনে পড়লো না কথাটা।

পুরনো একটা ওয়াশিং মেশিন সারাতে ব্যস্ত কিশোর আর মুসা। রবিনও সাহায্য করলো তাদেরকে।

শেষ হলো কাজ। মেশিনটা সবে চালু করেছে কিশোর, এই সময় একটা গাড়ি ঢুকলো ইয়ার্ডে। পুলিসের গাড়ি। পুলিস চীফ ইয়ান ফ্লেচার নামলেন গাড়ি থেকে। 'হাল্লো, বয়েজ,' এগিয়ে এলেন তিনি। 'তোমাদের সংগে কথা আছে।'

'কথা?' উঠে দাঁড়ালো কিশোর।

'হ্যাঁ। হ্যামলিন নামে এক লোকের কাছে গতকাল তোমরা একটা ট্রাঙ্ক বিক্রি করেছিলে। কার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে লোকটা। গাড়িটার যত ক্ষতি হয়েছে, সে–ও

বেশ ব্যথা পেয়েছে। এখন হাসপাতালে। প্রথমে ভেবেছিলাম সাধারণ দুর্ঘটনা। লোকটা বেহুঁশ ছিলো, কথা বলতে পারেনি।

'আজ সকালে হুঁশ ফিরেছে। জানালো, আরেকটা গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে তাকে রাস্তা থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে। ওই গাড়িটাতে দু'জন লোক ছিলো। ট্রাঙ্কটার কথাও বললো। ওটা চুরি করে নিয়ে গেছে; যারা ধাক্কা মেরেছিলো। ভাঙা গাড়িটা গ্যারেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর মধ্যে ট্রাঙ্কটা নেই।'

'ট্রাঙ্কের জন্যেই হ্যামলিনের গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিলো ওরা?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর।

'তাই তো মনে হয়। হ্যামলিন বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। ডাক্তার কথা বলতে দেয়নি তাকে। তোমাদের কাছ থেকে যে কিনেছে, এটা জানিয়েছে যাদুকর। তাই এলাম। ট্রাঙ্কে কি ছিলো?'

'কি ছিলো?' মুসা আর রবিনের দিকে তাকালো একবার কিশোর। 'বেশির ভাগই পুরনো কাপড়। আর ম্যাজিক দেখানোর কিছু জিনিস। আরেকটা জিনিস ছিলো, একটা কথা-বলা খুলি।'

'কথা-বলা খুলি! খুলি কথা বলবে কিভাবে?'

'সাধারণত বলে না,' স্বীকার করলো কিশোর। 'কিন্তু ওটা বলতে পারে। ওটার মালিক ছিলো দা গ্রেট ডেটলার নামে এক যাদুকর।' ফ্লেচারকে সব কথা খুলে বললো সে।

চুপচাপ শুনলেন চীফ। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ালেন। কিশোরের কথা শেষ হলে বললেন, 'স্বপ্নও হতে পারে। হয়তো স্বপ্ন দেখেছো।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঠিকানামতো গিয়ে বাড়িটা পেয়েছি। শেরিনা নামে এক জিপসি মহিলার সংগে দেখা হয়েছে। ডেটলারের সব কথা জানে সে। বললো, মানুষের দুনিয়ায় নাকি নেই এখন ডেটলার।'

কপালের ঘাম মুছলেন ফ্লেচার। 'কাচের বলের ভেতরে টাকা দেখেছে? ...আশ্চর্য!...চিঠিটার ছবি তুলে রেখেছো বললে। দেখাবে?'

'নিশ্চয়, স্যার। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।'

ওয়ার্কশপে এসে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো কিশোর। সকালেই ছবি ডেভেলপ করে রেখেছে। দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে শুকানোর জন্যে। ওগুলো খুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো আবার ট্রেলার থেকে।

ভালো করে দেখলেন চীফ। মাথা নাড়লেন, 'সাধারণ চিঠি মনে হচ্ছে। নিয়ে যাই, পরে পরীক্ষা করে দেখবো। শেরিনার সংগে দেখা করা দরকার। চলো না এখনই

যাই।'

রবিন আর মুসা আশা করলো তাদেরকেও সংগে যেতে বলবেন চীফ, কিন্তু বললেন না। দু'জনকে ইয়ার্ডেই থাকতে বলে পুলিসের গাড়িতে গিয়ে উঠলো কিশোর।

'অফিশিয়ালি যাচ্ছি না,' জানালেন ফ্লেচার। 'হয়তো আমাকে কিছুই বলতে চাইবে না, চাপাচাপিও করতে পারবো না। ওয়ারেন্ট নেই, অ্যারেস্টও করতে পারবো না।'

এরপর আর বিশেষ কোনো কথা হলো না।

সেই বাড়িটার সামনে এসে থামলো গাড়ি। কিশোর নামলো আগে। বারান্দায় উঠে সিঁড়ি পেরিয়ে দরজার সামনে এসে বেল বাজালো।

সাড়া নেই।

আরও কয়েকবার বেল বাজিয়েও সাড়া মিললো না।

এই সময় সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলো পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা। পুলিসের গাড়ি দেখে থামলো। জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চান? জিপসিদের? ওরা তো নেই। চলে গেছে।'

'চলে গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন চীফ, 'কোথায়?'

'কোথায় গেছে কে জানে? জিপসিরা কি আর বলে যায়? আজ এখানে কাল ওখানে। আজ সকালে দেখলাম পুরনো কতোগুলো গাড়ি এলো। মালপত্র বোঝাই করে চলে গেল লোকগুলো। আমাদের সংগে একটা কথাও বললো না কেউ।'

নয়

'বুঝলে,' কিশোর বললো, 'কাজ থাকলেই ভালো। এই যে এখন হাতে কোনো কাজ নেই, সময় কাটতেই চাইছে না। সাড়াটা দিনই তো পড়ে আছে। কি করবো?'

হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। চীফ ইয়ান ফ্লেচার এসেছিলেন, তার পর দুটো দিন পেরিয়ে গেছে। ইয়ার্ডের কাজে ব্যস্ত থেকেছে ওরা। পরিশ্রম হয়েছে ঠিক, কিন্তু সময়টা যেন উড়ে চলে গেছে। আজ কোনো কাজ নেই, তাই ভালো লাগছে না।

'অনেক দিন সাঁতার কাটি না। চলো সাঁতার কেটে আসি,' প্রস্তাব দিলো মুসা।

'হ্যাঁ, আমি রাজি,' বললো রবিন। 'যা গরম পড়েছে না। ভালোই লাগবে।'

ঠিক এই সময় বাজলো টেলিফোন।

কমবেশি চমকে উঠলো তিনজনেই।

আরেকবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলে নিলো কিশোর। স্পীকারের লাইন অন

করে দিলো। 'হ্যালো। কিশোর পাশা বলছি।'

'কিশোর,' ইয়ান ফ্লেচারের কণ্ঠ, 'অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমার চাচী এই নম্বরটা দিলো।'

'বলুন, স্যার?'

'চিঠিটা পরীক্ষা করলাম। ডেন কারমল আর গ্রেট ডেটলারেরও খোঁজখবর নিয়েছি। কয়েকটা কথা জানা গেছে। এখন একবার আমার অফিসে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারবো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো কিশোর। 'এখুনি আসছি। বেশি হলে বিশ মিনিট লাগবে।'

কিশোর রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'কেন রাজি হলে? ট্রাঙ্কটা পার করে দিয়ে তো বেঁচেছিলাম। আবার কেন গান্ধা ব্যাপারটায় নাক গলাতে যাচ্ছো?'

'ঠিক আছে, না যেতে চাইলে নেই,' কিশোর বললো। 'আমি একাই যাচ্ছি।'

মুসার চেহারা দেখে হেসে ফেললো রবিন। যেতে মনও চায়, আবার ভয়ও পায়, মুসার স্বভাবই হলো এরকম।

'তুমি যাবে নাকি?' রবিনকে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'হ্যাঁ।'

'দূর। তাইলে আমি আর একা বসে থেকে কি করবো? চলো, আমিও যাই। থানা থেকে ফিরে এসে কিন্তু সাঁতার কাটতে যাবো, হ্যাঁ।'

'সেটা দেখা যাবে,' কিশোর বললো। 'চলো, বেরোই।'

সাইকেল নিয়ে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা।

থানার বাইরে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে ভেতরে ঢুকলো ওরা। প্রথম ঘরটায় একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন একজন পুলিস অফিসার। ছেলেদের দেখে হাত নেড়ে বললেন, 'যাও, চীফ বসে আছেন।'

ছোট একটা হলঘরে ঢুকলো ওরা। একপাশে বন্ধ দরজার কপালে লেখা 'চীফ অভ পুলিস'। দরজায় টোকা দিতেই সারা দিলেন ফ্লেচার।

ভেতরে ঢুকলো ছেলেরা।

নীরবে সিগার টানছিলেন চীফ। ছেলেদের বসতে বললেন। তারপর বললেন, 'কয়েকটা ইনটারেসটিং খবর জেনেছি। তোমরা জানো, জেলে একই সেলে থাকতো ডেটলার আর ডেন কারমল। খবর নিয়ে যা বুঝলাম, কারমল ব্যাংক ডাকাতিতে জড়িত।'

'ব্যাংক ডাকাত!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'হ্যাঁ। ছয় বছর আগে ডাকাতির অপরাধেই তাকে জেলে পাঠানো হয়। পাঁচ লাখ ডলার লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায় স্যান ফ্র্যানসিসকো থেকে। এক মাস পর ধরা পড়ে শিকাগোয়। অতি সামান্য একটা কারণে ধরাটা পড়ে, পার প্রায় পেয়ে গিয়েছিলো। ওর কথায় ছোট্ট একটা দোষ আছে, "এল" অক্ষরটা উচ্চারণ করতে পারে না। ডাকাতির সময় সেটা খেয়াল করেছিলো ব্যাংকের এক ক্লার্ক, লোকটা খুব চালাক। পুলিসকে সে-ই একথা বলেছে।

'কারমল ধরা পড়লো, কিন্তু টাকাগুলো পাওয়া গেল না। লুকিয়ে ফেলেছিলো। সে যে ওই টাকা ডাকাতি করেছে, এটাই তার মুখ থেকে আদায় করা যায়নি। অনেক চেষ্টা করেছে পুলিস, স্বীকার করাতে পারেনি তাকে দিয়ে।

'এখন, শুরু থেকে এক এক করে ধরো। ছয় মাস আগে, শিকাগোয় অ্যারেস্ট হয়েছে কারমল, ডাকাতির এক মাস পর। টাকাগুলো কোথায় লুকালো? শিকাগোয়ও হতে পারে। লস অ্যাঞ্জেলেসেও হতে পারে।

'লস অ্যাঞ্জেলেসের কথা বলছি এজন্যে, জানা গেছে, শিকাগোয় যাওয়ার আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে তার বোনের বাড়িতে এক হপ্তা ছিলো কারমল। মহিলার নাম মিসেস লারমার, নিরা লারমার। তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু পুলিসের কাজে আসে এমন কিছুই জানাতে পারেনি মহিলা। মিসেস লারমার ভালো মানুষ, তার ভাইয়ের কুকর্মের কথা কিছুই জানতো না। পুলিস গিয়ে বলার পর তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। তার বাড়িতে কোনো জায়গা খুঁজতে বাকি রাখেনি পুলিস, টাকা পাওয়া যায়নি।

'তারমানে, ধরে নেয়া যায়, বোনের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় টাকাগুলো কারমলের সংগেই ছিলো। তাহলে, শিকাগোয় নিয়ে গিয়ে লুকানোও অসম্ভব নয়।'

'ডেটলারের কাছে চিঠিতে শিকাগোর কথা বলেছে কারমল,' কিশোর বললো। 'তার এক মামাতো ভাইয়ের নাম বলেছে, ড্যানি স্ট্রীট। তার ওখানে রাখেনি তো?'

'জেল কর্তৃপক্ষ ভেবেছে এটা, কিশোর। ডেটলারের কাছে পাঠানোর আগে ভালোমতো পড়েছে, নানা ভাবে দেখেছে। শিকাগো পুলিসকে জানিয়েছে। পুলিস তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু একজন স্ট্রীটের সংগেও কারমলের সম্পর্কের কথা জানাতে পারেনি। কয়েকজন স্ট্রীটকে পাওয়া গেছে, কেউ বলেনি যে তারা কারমলকে চেনে।

'চিঠিতে কোনো রকম কারসাজি নেই এ-ব্যাপারে শিওর হয়েই ডেটলারের কাছে পাঠিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ। ওটাতে সাংকেতিক কিছু আছে কিনা, তা-ও বোঝার চেষ্টা করেছে। পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে হয়েছে চিঠিটা নিছকই একটা চিঠি।'

'আমিও অনেক ভাবে চেষ্টা করে দেখেছি, বুঝতে পারিনি কিছু,' কিশোর বললো।

বার দুই চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। 'আমার ধারণা, আরও কেউ জেনে গেছে চিঠিটার কথা। হয়তো ভেবেছে টাকা কোথায় লুকানো আছে তার ইঙ্গিত রয়েছে চিঠিতে। তাই ওটা পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলো। ডেটলারের পিছু লেগেছিলো। আর তাতেই ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ম্যাজিশিয়ান।'

'খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে কিনা তাই বা কে জানে,' বললেন চীফ। 'আমার মনে হয়, টাকাটা পায়নি ডেটলার, তার হাতেই পড়েনি। কিন্তু অন্যেরা ভেবেছে, পেয়েছে। কথা আদায়ের জন্যে হয়তো অত্যাচার করেই মেরে ফেলেছে। কিংবা, তুমি যা বললে, ভয়ে ট্রাঙ্ক ফেলেই পালিয়েছে।'

'তাহলে বলতে হবে, চিঠিটাতে টাকার ইঙ্গিত রয়েছে এটা বুঝতে পেরেছিলো ডেটলার, নইলে লুকাবে কেন ওটা? ধরা যাক, সে গা ঢাকা দিয়েছে। হোটেলে ট্রাঙ্ক আছে কি নেই, খুঁজতে যায়নি অপরাধীরা। হয়তো জানতোই না। তারপর পত্রিকায় পড়েছে, আমি ডেটলারের একটা ট্রাঙ্ক কিনেছি। হয়তো সন্দেহ হয়েছে, ওই ট্রাঙ্কের মধ্যেই টাকা লুকানো আছে।

'পয়লা দিন রাতেই তাই ট্রাঙ্কটা চুরি করতে চেয়েছিলো। পায়নি। তারপর থেকে সারাক্ষণ ইয়ার্ডের ওপর চোখ রেখেছে। হ্যামলিন গাড়িতে করে ট্রাঙ্ক নিয়ে যাচ্ছে দেখে পিছু নিয়েছে। পথে ধাক্কা দিয়ে তার গাড়ি ফেলে দিয়ে ট্রাঙ্কটা নিয়ে চলে গেছে।'

'আমাদের বিপদটা বেচারা হ্যামলিনের ওপর দিয়ে গেল,' বলে উঠলো মুসা।

'আমাদেরকে দোষ দিতে পারবে না,' রবিন বললো। 'আমরা তাকে একথা বলেছি। ও বললো, কারও পরোয়া করে না। বিপদকে ভয় পায় না।'

'যা হবার তা হয়েই গেছে, ওসব বলে আর লাভ নেই,' বললেন ফ্লেচার। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বোঝা গেল, মূল্যবান কিছু একটা আছে ওই ট্রাঙ্কে। অযথা ওটার জন্যে কাড়াকাড়ি করছে না ওরা।'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'এখন ধরো,' বলে গেলেন চীফ, 'ট্রাঙ্কের ভেতরে মূল্যবান কিছু পেলো না। তখন কি করবে?'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। ঢোক গিললো।

মুসা নির্বিকার, চীফের কথার অর্থ বুঝতে পারেনি।

কিন্তু রবিন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওরা ভাববে, আমরা পেয়ে বের করে নিয়েছি! হয় মেসেজ, কিংবা টাকা, রেখে দিয়ে তারপর ট্রাঙ্কটা বেচেছি হ্যামলিনের কাছে!'

'খাইছে!' আতকে উঠলো মুসা। জোরে জোরে হাত নাড়লো, 'আমরা…আমরা কিচ্ছু পাইনি! কসম খোদার!'

'আমি জানি,' বললেন চীফ। 'কিন্তু ওরা কি বিশ্বাস করবে?'

'বিপদটা বুঝতে পারছি, স্যার,' মুখ কালো করে বললো কিশোর।

'হ্যাঁ, সেটা বুঝেই তোমাদেরকে ডেকেছি, হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে। ইয়ার্ডের কাছে কাউকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরা ফেরা করতে দেখলেই টেলিফোন করবে আমাকে। ফোন বা অন্য কোনোভাবে কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায় তোমাদের সংগে, তাহলে জানাবে আমাকে। বুঝেছো?'

'বুঝেছি,' বললো রবিন।

'একটা অসুবিধে আছে,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'নানা রকম লোক আসে ইয়ার্ডে। কাউকে সন্দেহ করা কঠিন। তবু, তেমন মনে হলেই জানাবো আপনাকে।'

'এক মুহূর্ত দেরি না করে।'

দশ

'তখনই বলেছিলাম ওই হতচ্ছাড়া ট্রাঙ্ক কেনার দরকার নেই,' মুখ গোমড়া করে রেখেছে মুসা। 'শুনলে না। ওরা ডাকাত। ধাক্কা দিয়ে হ্যামলিনের গাড়ি ফেলে দিয়েছে, আরমানে, মরলেও কেয়ার করতো না। আমাদের ব্যাপারেও করবে না।'

'অথচ ট্রাঙ্কটা বিদেয় করে দিয়ে ভাবলাম, বেঁচেছি,' রবিন বললো। 'কিশোর, কোনো উপায় বের করেছো?'

কথা হচ্ছে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে বসে।

কিশোরও গম্ভীর। 'সত্যি বলবো? আমিও ভয় পাচ্ছি এখন। লোকগুলো, ওরা যারাই হোক, টাকা বের না করে ছাড়বে না। বাঁচার একটাই উপায় আছে আমাদের, টাকাগুলো খুঁজে বের করে পুলিসের হাতে তুলে দেয়া।'

'চমৎকার! খুব চমৎকার!' টিটকারির ভঙ্গিতে বললো মুসা। 'টাকা খুঁজে বের করবো। এতোই সোজা। পুলিস পায়নি। চোরডাকাতেরা পাচ্ছে না। আর আমরা বের করে ফেলবো।'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' রবিন বললো। 'কি করে বের করবো? কোনো সূত্রই আমাদের হাতে নেই।'

'কাজটা সহজ হবে না,' স্বীকার করলো কিশোর। 'তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও শান্তি পাবো না, শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না আমাদেরকে।'

গুঙিয়ে উঠে বিড়বিড় করে কি বললো মুসা, সে-ই বুঝলো শুধু।

'শুরুটা কিভাবে করবো?' রবিনের প্রশ্ন।

'প্রথমে, ধরে নিতে হবে, টাকাগুলো লস অ্যাঞ্জেলেসেই কোথাও আছে। শিকাগোয় থাকলে বের করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকলেও যে সাধ্যের বাইরে, 'এটা বলে দিলো মুসা।

'তারপর, ' মুসার কথায় গুরুত্ব দিলো না কিশোর, 'জানতে হবে, বোনের বাড়িতে থাকার সময় কি কি করেছিলো ডেন কারমল। তারমানে মিসেস পারমারের বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, ওখানে যেতে হবে, তার সংগে কথা বলতে হবে।'

'কিন্তু পুলিস তো জিজ্ঞাসাবাদ করেছে,' রবিন যুক্তি দেখালো, 'ওরা কিছু জানতে পারেনি। আমাদেরকে নতুন আর কি বলবে?'

'জানি না। তবু চেষ্টা করতে হবে। এটাই এখন আমাদের একমাত্র সূত্র। কিছুই যখন করার নেই, এখন অন্তত এই একটা কাজ তো করতে পারি।'

'ওই দিন খবরের কাগজ পড়াটাই তোমার উচিত হয়নি,' বিড়বিড় করলো মুসা। 'তো, এখন কি করতে হবে আমাদের?'

'প্রথমে…,' বলতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর।

বাইরে থেকে মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল, 'কিশোর, কোথায় তোরা? খাবার দিয়েছি, জলদি আয়। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। 'হ্যাঁ, এটাই হলো গিয়ে কাজের কথা। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর এতক্ষণে এই একটা ভালো কথা শুনলাম।'

খেতে বসলো ছেলেরা।

রাশেদ পাশাও এসে বসলেন তাদের সংগে।

'তারপর, কিশোর?' বললেন তিনি। 'কি কাজে ব্যস্ত এখন? জিপসিদের সংগে দোস্তি করছো?'

'জিপসি?' অবাক হয়ে চাচার দিকে তাকালো কিশোর।

রবিন আর মুসার হাতের চামচও থেমে গেল।

'আজ সকালে দু'জন জিপসি এসেছিলো ইয়ার্ডে,' জানালেন রাশেদ পাশা। 'তোমরা তখন ছিলে না। ওরা বলেনি যে ওরা জিপসি, পরনের কাপড়ও জিপসিদের মতো ছিলো না। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। যাযাবর হয়ে জীবন কাটাতে কেমন লাগে, দেখার শখ হয়েছিলো একবার,' চট করে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন, রান্নাঘর থেকে মেরিচাচী আসছে কিনা। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'ব্যস, চলে গেলাম। অনেকদিন থেকেছি জিপসিদের মাঝে। খারাপ লাগেনি। স্বাধীন

জীবন, কোনো বাধা নেই…'

'তুমি জিপসি হয়েছিলে?' কিশোর বললো। 'কই, কখনো বলোনি তো? আর কি কি করেছো তুমি?'

নীরবে হাসলেন রাশেদ পাশা। বিশাল গোঁফে তা দিলেন একবার। ভাবখানা, সময়মতো জানতে পারবে।

ওসব কথা চাচা আর কিছু বলবে না বুঝে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ওই দু'জন কি আমাকে খুঁজছিলো?'

'মনে তো হলো তোমাকেই খুঁজছে,' বললেন রাশেদ পাশা। 'আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলো, কোঁকড়া-চুল ছেলেটা কোথায়? কি জন্যে, জানতে চাইলাম। বললো, তোমার এক বন্ধুর কাছ থেকে বিশেষ সংবাদ নিয়ে এসেছে।'

'কি সংবাদ?' হাত থেকে চামচ রেখে দিলো কিশোর।

হাসি বিস্তৃত হলো রাশেদ পাশার। 'মনে তো হলো একটা ধাঁধা দিয়ে গেছে। "এক পুকুরে নাকি একটা ব্যাঙ পড়েছে। ব্যাঙখেকো মাছেরা ওটার পিছে লেগেছে। জোরে জোরে লাফাচ্ছে ব্যাঙটা পানি থেকে উঠে আসার জন্যে।" বুঝেছো কিছু?'

চামচ দিয়ে প্লেটের কিনারে আলতো বাড়ি দিলো কিশোর, হাত কাঁপছে। মুসা আর রবিনের মুখ ফ্যাকাসে।

'কি জানি?' বললো কিশোর। 'তুমি শিওর, ওরা জিপসি?'

'শিওর। সরে গিয়ে নিচু গলায় কি বলাবলি করছিলো ওরা, নিজেদের ভাষায়। রোম্যানি মোটামুটি জানা আছে আমার। সব কথা শুনলাম না, তবে "বিপদ" আর "কড়া চোখ রাখতে হবে", এই শব্দগুলো কানে এসেছে। বিপজ্জনক কোনো কিছুতে জড়িয়ে পড়োনি তো?'

'এই, কিসের বিপদ?' মেরিচাচীর কথায় চমকে উঠলো চারজনেই। টে হাতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। 'ওঘর থেকে শুনছি খালি জিপসি জিপসি করছো? এই কিশোর, কি হয়েছে রে? মড়ার খুলি ফেলে এসে এখন জিপসিদের সংগে গিয়ে মিশেছিস নাকি?'

'না, চাচী…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন রাশেদ পাশা, 'কেন, জিপসিদের সংগে মিশলে খারাপ কি? ওরা লোক খুব ভালো।'

'মিস্টার রাশেদ পাশা!' চেঁচিয়ে উঠলেন মেরিচাচী। 'তোমার মিশতে ইচ্ছে করলে খুব মেশো গিয়ে। ছেলেগুলোর মাথা খেও না।'

খাবার টেবিলে কুরুক্ষেত্র বাধানোর ইচ্ছে হলো না রাশেদ পাশার। হেসে

বললেন, 'জো হুকুম, বেগম সাহেবা।' বড় একটা চিংড়ির কাটলেটের অর্ধেক মুখে পুরে এক চিবান দিয়েই বলে উঠলেন, 'বাহ্, দারুণ রেঁধেছো তো।'

'হয়েছে হয়েছে, আর ফোলাতে হবে না,' আরেকদিকে মুখ ফেরালেন চাচী। খুশি যে হয়েছেন, সেটা দেখতে দিতে চান না কাউকে।

মুচকি হেসে কনুই দিয়ে মুসার গায়ে আলতো গুঁতো দিলো কিশোর।

আর কোনো কথা হলো না। নীরবে খাওয়া শেষ করে হেডকোয়ার্টারে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

'জিপসির সংবাদ,' ঢুকেই বললো মুসা। 'পুকুরে ব্যাঙ পড়েছে বলে কি বোঝাতে চায়? হুমকি দিচ্ছে?'

'তাই তো মনে হয়,' মাথা ঝোঁকালো কিশোর। 'তারমানে আরও সিরিয়াস হতে হবে আমাদের; টাকাগুলো বের করতেই হবে। একটা কথা বুঝতে পারছি না, এই রহস্যের মাঝে জিপসিরা ফিট করছে কোথায়? শেরিনার সংগে কথা বললাম আগের দিন,. পরের দিন দলবলসহ গায়েব। এরপর দু'জন জিপসি একেবারে ইয়ার্ডে চলে এলো আমার জন্যে সংবাদ নিয়ে। শেরিনাও এখন একটা রহস্যময় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'হ্যাঁ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

'তাহলে কি করবো আমরা এখন?' রবিন প্রশ্ন করলো।

'কারমলের বোনের সংগে কথা বলবো,' কিশোর জবাব দিলো। 'লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকে। হয়তো ফোন গাইডে নাম পাওয়া যাবে।'

গাইডটা বের করে দিলো মুসা।

পাতা ওল্টাতে শুরু করলো কিশোর। মোট চারজন মিসেস লারমার পাওয়া গেল। প্রথম দু'জনকে ফোন করতে জানালো, ডেন কারমলের নামও শোনেনি। তৃতীয় জন এক মুহূর্ত থমকে থেকে বিষণ্ন কণ্ঠে জানালো, কারমলকে পাওয়া যাবে না। কারণ, সে মারা গেছে।

থ্যাংক ইউ, বলে রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। 'যাক, মিসেস লারমারকে পেলাম। একেই খুঁজছিলাম।'

গাইড বইতে ঠিকানা আছে। হলিউডের পুরনো অঞ্চলে থাকে মহিলা।

'দেরি করা উচিত না,' বললো কিশোর। 'তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখা করা দরকার।'

'কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না,' হাত ওল্টালো মুসা। 'কি এমন বলবে আমাদেরকে, যা পুলিসকে বলেনি?'

'জানি না। তবে পুকুরে পড়া ব্যাঙদের বেরোনোর চেষ্টা করা উচিত।'

'তো, যাবো কি করে?' রবিন জিজ্ঞেস করলো। 'অনেক দূর। সাইকেলে পারবো না।'

'দেখি ফোন করে, রোলস রয়েসটা পাওয়া যায় কিনা।'

পাওয়া গেল না। কোম্পানি জানালো, আরেক জায়গায় ভাড়ায় গেছে। শেষে গিয়ে বোরিসকেই অনুরোধ করতে হলো। ইয়ার্ডে কাজ তেমন নেই। কাজেই, অমত করলো না বোরিস। ট্রাক বের করলো।

সুন্দর একটা বাংলোয় থাকে মিসেস লারমার। সামনে পাম গাছ আছে, কলার ঝাড় আছে।

বেল বাজালো কিশোর। দরজা খুলে দিলো হাসিখুশি এক মধ্যবয়সী মহিলা। 'ম্যাগাজিন বিক্রি করতে এসেছো? নাকি টফি চকলেট? সরি, কোনোটাই লাগবে না আমার।'

'না, ম্যাডাম,' কিশোর বললো, 'কিছু বিক্রি করতে আসিনি।...এই যে, আমাদের কার্ড। দেখলেই বুঝবেন।'

অবাক হলো মহিলা। 'তোমরা গোয়েন্দা? বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, পুলিস চীফের নম্বর দিচ্ছি। ফোন করে জিজ্ঞেস করুন।'

'হুঁম্ম্। তো কি চাই?'

'সাহায্য,' সত্যি কথাটাই বললো কিশোর। 'একটা বিপদে পড়েছি। আপনার দেয়া তথ্য আমাদের কাজে লাগতে পারে। আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে, ডেন কারমল। লম্বা কাহিনী। ভেতরে আসতে বলবেন না?'

দ্বিধা করলো মহিলা। তারপর পাল্লা সবটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। 'এসো।'

বসার ঘরে সোফায় বসলো ছেলেরা।

ট্রাঙ্ক কেনা থেকে শুরু করলো কিশোর। মাঝে মাঝে কিছু কথা বাদ দিলো, যেমন সক্রেটিসের কথা। মরা মানুষের খুলিকে অনেক মহিলাই ভালো চোখে দেখে না।

'তাহলে বুঝতেই পারছেন,' শেষে বললো কিশোর। 'যেহেতু ট্রাঙ্কটা আমরা কিনেছি, ডাকাতেরা ধরেই নেবে, টাকাগুলো রেখে দিয়ে তারপর ট্রাঙ্ক বিক্রি করেছি। আমাদের বিপদটা বুঝতে পারছেন?'

'পারছি,' মাথা দোলালো মহিলা। 'কিন্তু আমি কি সাহায্য করতে পারি? টাকার কথা কিচ্ছু জানি না আমি, হাজারবার বলেছি পুলিসকে। আমার ভাই যে এমন একটা কাজ করে বসবে তা-ও কোনোদিন ভাবিনি।'

'পুলিসকে যা যা বলেছেন, আমাদেরকে সেসব কথা বললেই চলবে। হয়তো কোনো সূত্র পেয়েও যেতে পারি।'

'বেশ। অনেক আগের ঘটনা, কিন্তু এখনও সব স্পষ্ট মনে আছে আমার।' বলতে শুরু করলো মহিলা। 'টনি, ও, জানো না বোধহয়, ডেনের ডাক নাম টনি, আঠারো বছর বয়েসে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমার বিয়ে হলো, স্বামীর ঘরে চলে এলাম। তারপর থেকে অনেক দিন পর পর টনির সঙ্গে দেখা হতো আমার। আসতো আমাদের বাড়িতে, কয়েকদিন বেড়াতো। কখনও বলতো না সে কি কাজ করে। আমি বেশি চাপাচাপি করলে দায়সারা জবাব দিতো, কিসের নাকি সেলসম্যান। আর কিছুই বলতো না। এখানে যখন আসতো, আমার স্বামীর কাজে সাহায্য করতো, করতে বোধহয় ভালো লাগতো তার।

ঘর–বাড়ি মেরামতের কাজ করতো আমার স্বামী। ভালো কাজ জানতো, তাই কাজ পেতোও। টাকা রোজগার করতো প্রচুর। মেরামতের কাজ কি কি জানোই তো; এই রঙ করা, দেয়ালের কাগজ উঠে গেলে লাগিয়ে দেয়া, মেঝের কাজ, বাথরুমের কাজ, সবই জানতো।

'ওই যে বললাম, এসব কাজ টনির পছন্দ ছিলো। তাই বেড়াতে এলে আমার স্বামীর সঙ্গে যেতো, তাকে সাহায্য করতো। এভাবে শিখে ফেলেছিলো অনেক কিছু।

'শেষবার যখন এলো টনি, কেমন যেন অস্থির অস্থির মনে হলো তাকে। ভাবলাম, অনেক দিন দেশ–বিদেশে ঘুরে এসেছে হয়তো, তাই মন চঞ্চল। কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়, উচ্চারণ আগের চেয়ে খারাপ। জানো তোমরা, কিভাবে ধরা পড়েছে ও। "এল" অক্ষরটা উচ্চারণ করতে পারতো না। এই যেমন ধরো, ফ্লাওয়ারকে বলতো ফাওয়ার। ব্যাংক ডাকাতি করে যে আমাদের বাড়িতে এসে উঠেছে, কল্পনাও করিনি তখন।

'একটা কথা আছে না, বাইরে কাজের ঘরে অকাজের। আমার স্বামীরও হয়েছিলো ওই দশা। রোজ গাধার খাটুনি খেটে লোকের ঘরদোর মেরামত করে দিয়ে আসতো, অথচ নিজের বাড়ি যে ভেঙেচুরে বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল ছিলো না।

'শেষবার টনি যখন এলো, আমাদের ঘর মেরামত করে দিলো। আমরা কিছু বলিনি, ইচ্ছে করেই কাজে লাগলো সে। দেয়ালে কাগজ লাগালো, মেঝে ঠিক করলো, রঙ করলো।'

'ও থাকতেই আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। অনেক বড় একটা কাজ তখন হাতে। একটা রেস্টুরেন্টকে নতুন করে সাজানো। কাজ বাকি থাকতেই অসুখে পড়লো। তখন টনিকে অনুরোধ করলো, তার কাজটা শেষ করে দিতে।

'রাজি হলো টনি। অদ্ভুত লম্বা এক ওভারঅল পরে, চোখে বড় কালো চশমা লাগিয়ে বেরোতো। অবাকই লাগতো আমার, ওর ওরকম পোশাক দেখে। কিছু বলতাম না।

ভাবতাম, ওটা আরেক খেয়াল। তাছাড়া স্বামী তখন অসুস্থ। বেশি ভাবারও সময় ছিলো না। টনি যে কাজটা করে দিচ্ছে, এতেই আমরা খুশি।

'দেখতে দেখতে স্বামীর অসুখ বেড়ে গেল। হাসপাতালে নেয়ার আর সময় পেলাম না। তার আগেই মারা গেল সে।'

ভিজে এলো মিসেস লারমারের চোখ। রুমাল দিয়ে মুছে, কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার বললো, 'ভাবলাম, এরপর আমার কাছেই থেকে যাবে টনি। দুলাভাইয়ের কাজটা নেবে। ভালো ব্যবসা, ভালো আয়, নেবে না কেন? ভুল ভেবেছিলাম। কাজ করা তো দূরের কথা, আমার স্বামীকে কবর দেয়া পর্যন্তও থাকলো না সে। তাড়াহুড়ো করে ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। অবাক হয়েছিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছি, কেন তাড়াহুড়া করেছে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আমার স্বামীর ডেথ নোটিশ। জানোই তো, কেউ মারা গেলে কাগজে ডেথ নোটিশ দিতে হয়। উল্লেখ করতে হয়, মৃত্যুর সময় কে কে সামনে ছিলো। কাগজে তার নাম দেখে যদি পুলিস এসে হাজির হয়?—এই ভয়ে পালিয়েছিলো সে।

'পুলিস ঠিকই এসেছিলো। একে স্বামীর মৃত্যু, তার ওপর ভাইয়ের দুঃসংবাদ, আমার তখন কি অবস্থা হয়েছিলো বোঝো?'

'আচ্ছা, আপনার ভাই চলে যাওয়ার সময় কিছু বলেছিলো? সে ফিরে আসবে, দেখা করবে আপনার সঙ্গে, এমন কিছু?'

'ফিরে আসবে, ঠিক ওভাবে বলেনি। তবে বলেছিলো, বাড়িটা যাতে বিক্রি না করি। তাহলে তার জানা থাকবে আমি কোথায় আছি।'

'আপনি কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম, না বাড়ি বেচবো কেন? ইচ্ছে হলেই এসে দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে।'

'আরেকটা প্রশ্ন,' এক আঙুল তুললো কিশোর। 'আপনার স্বামী যখন কাজে চলে যেতো, আপনি তখন কি করতেন?'

'চাকরিতে যেতাম। বলতে ভুলে গেছি, আমিও চাকরি করতাম একটা।'

'শেষবার যখন আপনার ভাই এলো আপনাদের বাড়িতে, তখনও চাকরিটা করতেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি, টাকাগুলো কোথায় লুকানো আছে,' ঘোষণা করলো যেন কিশোর। 'আপনার স্বামী কাজে চলে যেতেন, আপনি আপনার

চাকরিতে চলে যেতেন। একা বাড়িতে থাকতো টনি। তারমানে টাকাগুলো এখানেই কোথাও লুকানো আছে, এই বাড়িতেই।'

এগারো

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকালো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'কিন্তু ইয়ান ফ্লেচার তো বললেন, বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে,' রবিন বললো, 'টাকাগুলো পাওয়া যায়নি।'

'যারা খুঁজেছে তাদের চেয়ে চালাক ছিলো ডেন কারমল,' বললো কিশোর। 'এমনভাবেই লুকিয়ে ছিলো, যাতে সাধারণ খোঁজাখুঁজিতে চোখে না পড়ে। বড় নোটের বাণ্ডিল করলে পাঁচ লাখ ডলারে তেমন বড় কোনো প্যাকেট হবে না। চিলেকোঠা, ঘরের ছাঁইচ, এরকম অনেক জায়গা আছে, লুকিয়ে রাখা যায়। লুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছিলো ডেন কারমল, পরে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে এসে বের করে নিতো। কিন্তু ফেরত আর আসতেপারলো না, জেলেই মারা গেল।'

'ঠিক!' বলে উঠলো রবিন। 'সেজন্যেই মিসেস লারমারকে জিজ্ঞেস করেছিলো, বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন কিনা।'

'পুলিসকে ফাঁকি দিয়েছে বটে,' মুসাও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, 'কিন্তু কিশোর, আমরা তো এখন টাকাগুলো বের করতে পারি?'

মিসেস লারমারের দিকে চেয়ে বললো কিশোর, 'বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে পারি?'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, বুঝতে পারছি,' বললো মিসেস লারমার। 'কিন্তু এ-বাড়িতে খুঁজে তো লাভ হবে না। এই বাড়িতে থাকতাম না তখন। ওটা চার বছর আগেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। টনিকে যখন বলেছিলাম, তখন বেচার কোনো ইচ্ছেই ছিলো না। পরে একজন এসে এতো বেশি টাকার অফার দিলো, না বেচলেই বোকামি হতো। তাই সেটা ছেড়ে এটা কিনে এখানে উঠে এসেছি।'

স্পষ্ট হতাশা দেখা গেল কিশোরের চেহারায়। দীর্ঘ এক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে আবার বললো, 'তাহলেও ওই বাড়িতেই আছে এখনও টাকাগুলো।'

'হ্যাঁ, তা থাকতে পারে,' মাথা নাড়লো মিসেস লারমার। পুলিস যখন পায়নি, আর কেউ পেয়ে গেছে এতোদিনে, এটাও মনে হয় না। আমরা থাকতাম পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ড্যানভিল স্ট্রীটে। ওখানে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।'

'থ্যাংক ইউ,' বলে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'মিসেস লারমার, অনেক উপকার

করলেন। যতো তাড়াতাড়ি পারি, গিয়ে খুঁজবো ওখানে।'

মহিলাকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা।

ট্রাকে উঠেই বোরিসকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ড্যানভিল স্ট্রীটটা চেনেন?'

লস অ্যাঞ্জেলেসের পুরনো একটা ম্যাপ বের করলো বোরিস। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওটার ওপর কিশোর। ড্যানভিল স্ট্রীট আছে ম্যাপে। ছোট একটা গলি।

'বাড়ি যাওয়া দরকার, কিশোর,' বললো বোরিস। 'মিস্টার পাশা দেরি করতে মানা করেছেন।'

'দেরি হবে না,' কিশোর বললো। 'রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বাড়িটা একবার দেখে নেবো, ব্যস। অন্যের বাড়িতে ঢুকে তো আর খোঁজাখুঁজি করতে দেবে না। দেখে গিয়ে আমাদের সন্দেহের কথা মিস্টার ফ্লেচারকে জানাবো।'

রবিন আর মুসা জানে, এই কাজটা করতে খুব খারাপ লাগবে কিশোরের-- সন্দেহের কথা গিয়ে পুলিসকে জানানো। তার চেয়ে, টাকাগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে গিয়ে যদি পুলিসের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারতো, তাদেরকে অবাক করে দিতে পারতো, তাহলে অনেক বেশি খুশি হতো। সেটা এখন আর সম্ভব না।

তর্ক করলো না বোরিস। কিশোর যেখানে যেতে বললো, সেখানেই রওনা হলো। অসুবিধে নেই। রকি বীচে ফেরার পথেই পড়বে ড্যানভিল স্ট্রীট।

টাকা পাওয়ার ব্যাপারে আশা বেড়েছে যদিও,, সন্দেহ যাচ্ছে না মুসার। বললো, 'কিশোর টাকাগুলো ওখানে না-ও তো লুকাতে পারে কারমল।'

মাথা নাড়লো কিশোর। 'না, ওখানেই লুকিয়েছে। ডেন কারমলের জায়গায় আমি হলে ওখানেই লুকাতাম।'

অনেকগুলো অলিগলি পেরিয়ে, মোড় নিয়ে ড্যানভিল স্ট্রীটে এসে পড়লো গাড়ি।

'এটা নয়শো নম্বর ব্লক,' বললো কিশোর। 'বোরিস, বাঁয়ে মোড় নিন। পাঁচশো নম্বরটা ওদিকেই হবে।'

মোড় নিলো বোরিস।

উৎসুক হয়ে রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর নম্বর পড়ছে তিন কিশোর।

'আটশো,' বললো রবিন। 'আরও তিনটে ব্লক পেরোলে, তারপর।'

আরও কিছু বাড়ি পেরিয়ে এলো ট্রাক।

নম্বর দেখার জন্যে বকের মতো গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ছেলেরা।

'পরের ব্লকটাই হবে,' আবার বললো রবিন। 'বোধহয় ডানে।'

'পরের ব্লকের মাঝামাঝি থামবেন,' বোরিসকে বললো কিশোর।

'হোকে।'

মিনিটখানেক পরে থামলো ট্রাক।

ডানে, বিরাট একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস, পুরো ব্লকটাই প্রায় জুড়ে রয়েছে। ধারেকাছে ছোট বাড়ি একটাও নেই।

বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর।

পাঁচশো বত্রিশ নম্বর গেছে!' হতাশ হয়ে বললো রবিন। 'ওটার জায়গায়ই ওই বাড়ি তুলেছে। একটাই নম্বর, পাঁচশো দশ।'

'তারমানে পাঁচশো বত্রিশ নম্বরটা হারালাম,' মুসার কণ্ঠেও নিরাশা।

'পরের ব্লকটায় গিয়ে দেখুন তো, বোরিস,' কিশোর বললো। 'হয়তো ওটাতে আছে।'

কিন্তু পরের ব্লকটা চারশো নম্বর। পাঁচশো বত্রিশ নেই। ট্রাক থামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালো বোরিস।

'মিসেস লারমার কি মিথ্যে বললো?' রবিনের প্রশ্ন। 'পাঁচশো বত্রিশ নম্বরে হয়তো থাকেইনি কোনোদিন। হযতো এখন যে-বাড়িতে আছে, সেখানেই ছিলো বরাবর। ফাঁকি দিয়ে আমাদের বিদেয় করে এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে টাকাগুলো । পাঁচ লাখ ডলার, সোজা কথা না।'

'না,' কিশোর বললো, 'আমার মনে হয় না মিথ্যে বলেছে। আসলে, পাঁচশো বত্রিশেরই কিছু হয়েছে। তোমরা এখানে বসো। আমি চট করে গিয়ে দেখে আসি।'

ট্রাক থেকে নেমে চলে গেল সে। ফিরে এলো কয়েক মিনিট পরেই। জানালো, 'অ্যাপার্টমেন্টের সুপারিনটেনডেন্টের সংগে কথা বলে এলাম। বললো, পাঁচশো বত্রিশ নম্বর নাকি ছিলো ওখানে। আরও কয়েকটা ছোট বাড়ি। মোট ছয়টা। ওগুলোকে সরিয়ে দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা তৈরি হয়েছে, বছর চারেক আগে।

'সরিয়ে!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'সরায় কিভাবে? কোথায়?'

'ম্যাপল স্ট্রীটে। এখান থেকে তিন ব্লক দূরে, এই পথের সমান্তরাল আরেকটা পথ। বাড়িগুলোর কণ্ডিশন ভালো ছিলো, বেশি বড়ও না, তাই না ভেঙে তুলে নিয়ে গিয়ে নতুন ভিতের ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মিসেস লারমারের বাড়িটাও আছে, শুধু জায়গা বদল করেছে।'

'কাণ্ড আরকি,' বললো রবিন। 'বাড়িরাও বেড়ায় আজকাল, জায়গা বদলায়। খুঁজে বের করবো কি-করে? নম্বর তো নিশ্চয় এখন আর পাঁচশো বত্রিশ নেই।'

'বাড়িটা দেখতে কেমন, ফোনে জিজ্ঞেস করবো মিসেস লারমারকে,' কিশোর বললো। 'তারপর ম্যাপল স্ট্রীটে গিয়ে খুঁজে বের করবো।'

'আজ তো আর হবে না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'না, আজ আর হবে না। দেখি, কাল আসার চেষ্টা করবো। বোরিস, বাড়ি যান।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘোরালো। বোরিস। মোড় পেরোতেই তাদের পিছু নিলো কালো একটা বড় গাড়ি। তাতে তিনজন আরোহী। ব্লকখানেক দূরে থেকে ট্রাকটাকে অনুসরণ করে চললো। তিন গোয়েন্দা, কিংবা বোরিস এর কিছুই জানলো না।

ইয়ার্ডে ফিরে দেখলো বন্ধ করি করি করছেন রাশেদ পাশা। ওদের জন্যেই বসে আছেন।

'এতো দেরি করলে কেন?' রাগ করে বললেন তিনি।

'ইয়ে, একটা জরুরী কাজ…,' থেমে গেল কিশোর।

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন রাশেদ পাশা। 'তোমার নামে একটা প্যাকেট এসেছে। কাউকে কোনো কিছুর জন্যে লিখেছিলে নাকি?'

'কই, না তো। কী?'

'দেখো গিয়ে, অফিসের দরজার কাছে রেখে দিয়েছি। বড় বাক্স। খুলিনি।'

শক্ত কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স। খোলা জায়গাগুলোতে অ্যাডেসিভ টেপ লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ডাকে এসেছে। প্রেরকের নাম নেই।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'আছে কি এর মধ্যে?'

'খুললেই বোঝা যাবে,' কিশোরও অবাক হয়েছে। 'ধরো তো, ওয়ার্কশপে নিয়ে যাই।'

যথেষ্ট ভারি। ধরাধরি করে বাক্সটা ওয়ার্কশপে নিয়ে এলো ওরা।

ছুরি দিয়ে টেপ কাটলো কিশোর। বাক্সের ডালা তুলেই তাজ্জব হয়ে গেল।

'আল্লাহরে, আবার!' গুঙিয়ে উঠলো মুসা।

কিছুক্ষণ কিশোরও কথা বলতে পারলো না। 'ডে–ডেটলারের ট্রাঙ্ক! কে পাঠালো?' অবশেষে বললো সে।

তাদেরকে আরও অবাক করে দেয়ার জন্যেই যেন বলে উঠলো একটা চাপা কণ্ঠ, 'জলদি!…সূত্র খুঁজে বের করো!'

সক্রেটিস। ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে কথা বলছে।

বারো

'তাহলে, এবার কি করা?' বিষণ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

শনিবার। বাক্সটা যেদিন পেয়েছে, তার পরের দিন বিকেলে ওয়ার্কশপে বসে আলোচনা করছে তিন গোয়েন্দা। আগের দিন এতোই উত্তেজিত আর ক্লান্ত ছিলো,

ট্রাঙ্কটা খুলে দেখতেও আর ইচ্ছে হয়নি। ছাপার মেশিনের আড়ালে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে ওটা।

শনিবারেও একেকজনের একেক কাজ ছিলো। সকালে লাইব্রেরিতে ডিউটি ছিলো রবিনের। মুসা তাদের বাড়ির লন পরিষ্কার করেছে। কিশোর ব্যস্ত থেকেছে ইয়ার্ডে। যার যার কাজ শেষ করে এখন মিলিত হয়েছে তিনজনে।

'আমি বলি কি,' রবিন বললো, "এটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসি মিস্টার ফ্লেচারকে। যা যা জানি আমরা বলে আসি। এরপর পুলিস যা করার করুক।'

'ঠিকই বলেছো। তা-ই করা উচিত,' সমর্থন করলো মুসা। 'কিশোর, তুমি কি বলো?'

'সেটা করতে পারলেই ভালো হতো,' ধীরে ধীরে বললো কিশোর। 'কিন্তু কি বলবো? কি জানি আমরা? ডেন কারমল তার বোনের বাড়িতে টাকা লুকিয়ে রেখেছে, এটা আমাদের সন্দেহ। শিওর না। এই সন্দেহ তো পুলিসও করেছিলো।'

'তা করেছিলো। জায়গামতো খোঁজেনি, তাই পায়নি,' বললো রবিন। 'তবে ওই বাড়িতেই রেখেছে ডেন কারমল। স্যান ফ্র্যানসিসকোর ব্যাংক থেকে টাকা যেদিন লুট করেছে, সেদিনই গিয়ে বোনের বাড়িতে উঠেছে। তারমানে তখনও টাকাগুলো তার সংগেই ছিলো। বমাল ধরা পড়লে শাস্তি অনেক বেশি হবে, টাকাগুলোও খোয়া যাবে, তাই ওগুলো ওই বাড়িতেই লুকিয়ে ফেলেছে। জেল খেটে বেরিয়ে এসে বের করে নিতো। কপাল খারাপ বেচারার, মরে গেল তার আগেই।'

'আর যদি,' মুসা বললো, 'সে ওই বাড়িতে টাকাগুলো নাই রেখে থাকে, তাহলে তো গেলই। ওই টাকা খুঁজে বের করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

'গতকাল আমাদের সংগে কথা বলেছিলো সক্রেটিস,' মনে করিয়ে দিলো কিশোর।

'তা তো বলেছে!' কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ। 'বিশ্বাস করো, শুনতে একটুও ভাল্লাগেনি আমার।'

'হ্যাঁ, স্বরটাই জানি কেমন!' বললো রবিন।

'কিন্তু কথা তো বলেছে,' বললো কিশোর। 'কিভাবে বলেছে, এই মুহূর্তে আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। ও আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সূত্র খুঁজে বের করতে বলেছে। তারমানে ট্রাঙ্কে নিশ্চয় সূত্র আছে, আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'সেজন্যেই তো বললাম, ফ্লেচারের কাছে পাঠিয়ে দাও,' মুসা বললো। 'ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখুক পুলিস। তবে তার দরকারই হয়তো হবে না। ম্যাপল স্ট্রীটে গিয়ে বাড়িটাতে খুঁজলেই টাকাগুলো পেয়ে যাবে। আর পুলিসের

টাকা পাওয়া নিয়েই কথা।'

'তা ঠিক,' সায় জানালো কিশোর। 'তাহলে এখন মিসেস লারমারকে ফোন করতে হয়। বাড়িটার ডেসক্রিপশন জেনে নিয়ে পুলিসকে জানাবো।'

'তাহলে করো। চলো হেডকোয়ার্টারে যাই।'

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো ওরা।

মিসেস লারমারকে ফোন করলো কিশোর।

'বাড়িটা?' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল অবাক হয়েছে মহিলা। 'ওটা আবার বলা লাগে নাকি? ড্যানভিল স্ট্রীটে যাও না, গেলেই দেখতে পাবে।'

গিয়েছিলো, জানালো কিশোর। কি কি দেখে এসেছে, তাও বললো।

'অ্যাপার্টমেন্ট হাউস! ও, এই জন্যেই এতো টাকা দিয়ে কিনেছে লোকটা। আগে জানলে আরও বেশি দাম চাইতাম। এখন মনে হচ্ছে কমেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যাকগে, যা হবার হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের বাড়িটা ছিলো বাংলো-টাইপ, বাদামী রঙের কাঠের বেড়া। একতলা। তবে ছোট একটা চিলেকোঠা ছিলো, তাতে গোল একটা জানালা, সামনের দিকে।'

'থ্যাংক ইউ,' বললো কিশোর। 'পুলিসকে বলবো। খুঁজে বের করে ফেলবে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকালো সে। 'যতোই ভাবছি, বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে আমার, ওই বাড়িতেই আছে টাকাগুলো। এবং ট্রাঙ্কের মধ্যেই আছে কোনো সূত্র।'

'থাকলে থাকুক,' হাত নাড়লো মুসা, 'আমি আর এসবে নেই। হ্যামলিনের কি অবস্থা তো দেখলে। ট্রাঙ্কটা আর ছুঁয়েও দেখার দরকার নেই আমাদের। সোজা পাঠিয়ে দিই পুলিসের কাছে।'

'বেশ। তাহলে মিস্টার ফ্লেচারকে ফোন করে বলি যে আমরা আসছি।'

আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করলো কিশোর।

সাড়া এলো ওপাশ থেকে, 'পুলিস হেডকোয়ার্টার। লেফটেন্যান্ট বেকার বলছি।' কর্কশ, অপরিচিত কণ্ঠ।

'আমি কিশোর পাশা বলছি। চীফের সংগে কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

'চীফ নেই,' কাটা কাটা কথা। 'কালকের আগে ফিরবে না। তখন চেষ্টা করো।'

'কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী। আমরা একটা সূত্র পেয়েছি...'

'দেখো, আমি এখন খুব ব্যস্ত। বকবকের সময় নেই।'

'কিন্তু চীফ আমাকে বলেছেন...'

'কাল,' ওপাশ থেকে কেটে দেয়া হলো লাইন।

আস্তে করে রিসিভার রেখে শূন্য চোখে দুই সহকারীর দিকে তাকালো গোয়েন্দাপ্রধান।

'ব্যাটা নতুন এসেছে মনে হয়,' বললো মুসা।

'চেনে না আমাদের,' যোগ করলো রবিন।

'ওই বড়দের মতোই ব্যবহার,' দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিশোর। 'ওদের ধারণা, যেহেতু আমরা ছোট, ভালো কোনো আইডিয়া আমাদের মাথায় আসতে নেই। কিন্তু কালও তো ট্রাঙ্কটা নিয়ে যেতে পারবো না। রোববার। বন্ধ। যেতে যেতে সোমবারে। তাই আমি বলি কি, হাতের কাছেই যখন আছে সময়ও আছে প্রচুর, ট্রাঙ্কটা আরেকবার ঘাঁটতে দোষ কি?'

'আমি নেই,' দুই হাত নাড়লো মুসা। 'সক্রেটিসকে দেখলেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। কথা বললে তো আরও বেশি।'

'মেরিচাচীও দেখতে পারেন না,' রবিন বললো। 'তাঁর সংগেও ফাজলামি করেছে।'

'তা করেছে। তবুও ট্রাঙ্কটা খুলে দেখতে তো কোনো অসুবিধে নেই। কোনো জিনিস রেখে তারপর ফেরত পাঠিয়েছে কিনা কে জানে।'

ওয়ার্কশপ থেকে আবার বেরিয়ে এলো ওরা।

ছাপার মেশিনের ওপাশ থেকে ট্রাঙ্কটা বের করে আনলো।

ভেতরে আগের মতোই সাজানো আছে জিনিসগুলো। এক কোণে কাপড়ে মোড়ানো রয়েছে সক্রেটিস। লাইনিঙের ছেঁড়ার মধ্যে রয়েছে চিঠিটা।

সক্রেটিসকে তুলে কাপড়ের মোড়ক খুললো কিশোর। ছাপার মেশিনের ওপর হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডটা রেখে তার ওপর রাখলো খুলিটা। তারপর চিঠিটা বের করলো। 'দেখি আরেকবার খুলে,' আনমনে বললো।

কয়েকবার করে পড়লো তিনজনে। আগের মতোই লাগলো, অতি সাধারণ একটা চিঠি।

'নাহ্, সূত্র থাকলেও বোঝা যাচ্ছে না,' বিড়বিড় করলো কিশোর। 'আরে…রাখো রাখো! পেয়েছি!' রবিনের হাত থেকে চিঠি আর খামটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললো, 'কি মিস করেছি বুঝেছো?'

'কী!' রবিন অবাক। 'আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

'খামের স্ট্যাম্প! স্ট্যাম্পের নিচে দেখা হয়নি।'

স্ট্যাম্প দুটোর দিকে তাকালো রবিন। একটা দুই সেন্টের, আরেকটা চার সেন্ট। কিশোরের হাত থেকে খামটা আবার নিয়ে স্ট্যাম্পগুলোর ওপর আঙুল বোলালো।

'কিশোর,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ঠিকই বলেছো। একটার নিচে কি যেন আছে। উঁচু মনে হচ্ছে এই চার সেন্টেরটা।'

মুসাও আঙুল বুলিয়ে দেখে মাথা ঝোঁকালো।

একটা স্ট্যাম্পের চেয়ে আরেকটা উঁচু, পার্থক্যটা এতো সামান্য, খুব ভালোমতো খেয়াল না করলে বোঝা যায় না।

'হেডকোয়ার্টারে চলো,' রবিন বললো। 'খুলে দেখি।'

তাড়াহুড়ো করে আবার হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলো ওরা। তিন মিনিটের মাথায় কেটলির পানি ফুটতে আরম্ভ করলো। নলের মুখ দিয়ে বাষ্প বেরোচ্ছে। তার ওপর স্ট্যাম্পগুলো ধরলো কিশোর। বাষ্পে ভিজে আস্তে আস্তে নরম হয়ে এলো আঠা। খুব সাবধানে চার সেন্টের স্ট্যাম্পটা তুললো কিশোর। তুলেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'দেখো দেখো, নিচে আরেকটা।'

এক সেন্টের একটা সবুজ স্ট্যাম্প।

'আশ্চর্য!' ভ্রূকুটি করলো রবিন। 'কি মানে এর?'

'খুব সহজ।' মুসা ব্যাখ্যা দিলো, 'এর মধ্যে রহস্যের কিছু নেই। খামটা আগের, যখন ডাকের রেট কম ছিলো তখন এক সেন্টের স্ট্যাম্প লাগানো ছিল ওটাতে। কারমল যখন চিঠিটা পোস্ট করলো, রেট তখন বেড়ে গেছে। ফলে ওটার ওপরই চার সেন্টের আরেকটা লাগিয়ে দিয়েছে সে। পাশে তিন সেন্টের একটা লাগালেই যে চলতো, এটা খেয়াল করেনি। কিংবা হয়তো তিন সেন্টের স্ট্যাম্প তখন পায়নি।'

'ঠিক। কিশোর, মুসা ঠিকই বলেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' সবুজ স্ট্যাম্পটার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। তারপর খুব সাবধানে আস্তে করে তুলে আনলো ওটা। নিচে লেখা-টেখা আছে কিনা দেখার জন্যে।

'নেই,' দেখে বললো রবিন। তৃতীয় স্ট্যাম্পটাও তুললো। 'এটাতেও নেই। এবার কি বলবে, কিশোর?'

'আর যা-ই হোক, মুসার যুক্তি মানতে পারছি না। কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে।'

'কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ভাবছি।' চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, 'কারমল জানতো, এই চিঠি সেনসর হবেই। তাই, স্ট্যাম্পের সাহায্যেই মেসেজ পাঠিয়েছে। একটার ওপর আরেকটা স্ট্যাম্প এমনভাবে লাগিয়েছে, যাতে সহজে বোঝা না যায়। ও আশা করেছে, ভালোমতো খামটা পরীক্ষা করবে ডেটলার, বুঝতে পারবে। এক সেন্টের স্ট্যাম্পটার

রঙ সবুজ, তারমানে তার লুকানো টাকাগুলোর রঙও সবুজ। কারমল বোঝাতে চেয়েছে…'

'বুঝেছি!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'স্ট্যাম্প কাগজে তৈরি। টাকাও কাগজের। কাগজের ওপর কাগজ রেখে সে বোঝাতে চেয়েছে টাকাগুলো কোনো ধরনের কাগজের তলায় লুকিয়েছে। মিসেস লারমার বলেছে, ইচ্ছে করেই তাদের বাড়ি মেরামত করেছে তার ভাই। ঘরের দেয়ালের ছেঁড়া কাগজ নতুন করে লাগিয়েছে। কারমল করেছে কি, নোটগুলোকে পাশাপাশি আঠা দিয়ে লাগিয়ে একটা আস্ত কাগজ বানিয়েছে, কিংবা ছোট ছোট কয়েকটাও হতে পারে। ওগুলো দেয়ালে লাগিয়ে তার ওপর কাগজ সাঁটিয়ে দিয়েছে।'

'খাইছে!' মাথা দোলালো মুসা। 'রবিন, ঠিকই বলেছো। তাই করেছে। ঠিক না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'হ্যাঁ। একটা গল্প মনে পড়ছে। গোয়েন্দা গল্প। চোর অনেকগুলো সোনার বারকে পিটিয়ে পাতলা করে চাদর বানিয়েছে। তারপর ওই চাদর পেরেক দিয়ে কাঠের দেয়ালে লাগিয়ে তার ওপর কাগজটা সেঁটে দিয়েছে। ওই একই কাজ করেছে কারমলও। গল্পের চোর লুকিয়েছিলো সোনা, আর আমাদের চোর, টাকা।'

'কিন্তু,' মনে করিয়ে দিলো রবিন, 'মিসেস লারমার আরও একটা কথা বলেছে। মিস্টার লারমার অসুখে পড়লে তার হয়ে রেস্টুরেন্টের কাজ করে দিয়ে এসেছিল কারমল। ওই বাড়িতে টাকাগুলো লুকায়নি তো?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়লো কিশোর। 'সব চেয়ে ভালো জায়গা···আরি আরি আরি!'

'আরি আরি কি?' ভুরু নাচালো মুসা। 'এতগুলো আরি কেন?'

'কারমল বলেছে। চিঠিতে বলেছে ডেটলারকে। দেখো,' চিঠিটা দুই সহকারীর দিকে বাড়িয়ে দিলো কিশোর। 'দেখো, কি লিখেছে? "পাঁচ দিনও হতে পারে, তিন হপ্তা, কিংবা হয়তো দু'মাস।" নম্বরগুলোকে পাশাপাশি রেখে এক অঙ্কে সাজাও। কি হয়? পাঁচশো বত্রিশ!'

'মিসেস লারমারের বাড়ির নম্বর!' টেবিলে চাপড় মারলো রবিন। 'পাঁচশো বত্রিশ ড্যানভিল স্ট্রীট।'

'ঠিক,' বললো কিশোর। 'আর এই যে লিখেছে, কখনও যদি শিকাগোয় যাও, আমার মামাতো ভাই ড্যানি স্ট্রীটের সংগে দেখা করো।'

'ড্যানভিলের ডাক নাম ড্যানি হতে পারে,' বলে উঠলো মুসা। 'অনেক রাস্তারই ডাক নাম আছে।'

'কাগজের নিচে টাকা লুকানো!' রবিন বললো। 'চিঠিতে কোনোভাবে বলতে সাহস করেনি। স্ট্যাম্পের ওপর স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিয়েছে। দারুণ বুদ্ধি।'

'হ্যাঁ।' কিশোর বললো। 'ওই মামাতো ভাই আর শিকাগোর কথা লিখেছে ড্যানি স্ট্রীট থেকে নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'হুঁ। ধাঁধার সমাধান তো হলো। এখন টাকাগুলো কিভাবে বের করা যায়?'

'সমস্যাই,' রবিন বললো। 'হুট করে গিয়ে তো আর কারও ঘরে ঢুকে বলতে পারি না, আপনার দেয়ালের কাগজ ছিঁড়তে চাই।'

'না, পারি না,' কিশোর বললো। 'সেটা পুলিসের কাজ। লেফটেন্যান্ট বেকারকে বলা বেকার, চীফকে বলতে হবে। তার মানে সোমবার, চীপ যখন অফিসে থাকবেন…'

বেজে উঠলো টেলিফোন।

রিসিভার তুলে নিলো কিশোর। 'তিন গোয়েন্দা। কিশোর পাশা বলছি।'

'গুড!' কর্তৃত্বপূর্ণ একটা কণ্ঠ। 'আমি নরম্যান হল।'

'নরম্যান হল?' নামটা কিশোরের অপরিচিত।

'হ্যাঁ। চীপ ফ্রেচার নিশ্চয় আমার কথা বলেছে তোমাদেরকে। বলেনি?'

'না তো!'

'হয়তো ভুলে গেছে। চীফই আমাকে তোমাদের নম্বর দিয়েছে। ব্যাংকারস প্রোটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশনের একজন স্পেশাল এজেন্ট আমি। ট্রাঙ্কটা কিনেছো তোমরা, খবরের কাগজে একথা পড়ার পর থেকেই তোমাদের ওপর চোখ রেখেছি। আর…'

'বলুন?'

'আরও তিনজন রাখছে। দিন রাত। ক্যালিফোর্নিয়ার তিনজন ভয়ানক খুনে ডাকাত।'

তেরো

'আ-আমাদের ওপর নজর রাখছে?' কেঁপে গেল কিশোরের কণ্ঠ।

ঢোক গিললো রবিন আর মুসা।

'নিশ্চয়। চোখ রাখছে। যেখানে যাচ্ছো, পিছে পিছে যাচ্ছে। ওদের নাম ডেক, ওরফে তিন-আঙুলে, নরিস, ওরফে আলুমুখো, আর ট্যানটন, ওরফে ছুরি। ডেন কারমলের সংগেই জেল খেটেছে। ওদের ধারণা, টাকাগুলো খুঁজে বের করতে পারবে

তোমরা।'

'কিন্তু···কিন্তু আমরা তো কাউকে দেখিনি। মানে, সন্দেহজনক···'

'ওরা প্রফেশনাল। বাঘা বাঘা পুলিসকে ফাঁকি দিয়ে দেয়, আর তোমরা তো ওদের কাছে শিশু। তোমাদের ইয়ার্ডের কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া করেছে, পথের ভাটিতে। ফিল্ড গ্লাস দিয়ে সারাক্ষণ চোখ রাখছে তোমাদের ওপর। যেখানেই যাচ্ছো, পিছু নিচ্ছে।'

'তাহলে তো এখুনি পুলিসকে জানানো দরকার,' বললো কিশোর।

স্পীকারে সব কথা শুনছে রবিন আর মুসা, কিশোরের সংগে একমত হয়ে ওরাও মাথা ঝাঁকালো।

'চীফকে জানিয়েছি আমি,' বললো হল। 'কিন্তু চীফ বললো, ওদেরকে ধরা যাবে না এখন। কারও ওপর চোখ রাখা বেআইনী নয়। বেআইনী কিছু যতোক্ষণ না করছে, ধরা সম্ভব হবে না।'

'তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন, আমরা টাকাগুলো বের করতে গেলেই ওরাও পিছে যাবে। এইতো?'

'হ্যাঁ। কাজেই তোমাদের যাওয়া উচিত হবে না। কিছু জেনে থাকলে পুলিসকে গিয়ে জানাও।'

'আমরা কিছু জানি না।'

'কিছুই জানো না?'

'কিছুই জানি না, তা নয়। এই মাত্র একটা সূত্র আবিষ্কার করলাম।'

'তাই নাকি? ভেরি গুড। এখুনি গিয়ে চীফকে জানাও। আমিও ওখানে···ওহহো, চীফকে তো পাবে না। এখন মনে পড়লো, বলেছিলো আজ শহরের বাইরে যাবে।'

'হ্যাঁ, জানি। একটু আগে ফোন করেছিলাম। লেফটেন্যান্ট বেকার জানালো, চীফ নেই। লেফটেন্যান্ট তো আমাদের কথাই শুনতে রাজি না।'

'আর এখন যদি গিয়ে ওকে বলোও, বিশ্বাস করাতে পারো, তাহলে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। সব ক্রেডিট নিজে নিয়ে নেবে। পুরস্কারের লোভে।'

'পুরস্কার?'

'হ্যাঁ। অ্যাসোসিয়েশন একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। চোরাই পাঁচ লাখ ডলার যে উদ্ধার করে দিতে পারবে, তাকে দশ হাজার ডলার দেয়া হবে।'

দশ্শ হাজাআর!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। 'কিশোর, জলদি জিজ্ঞেস করো, কিভাবে পাওয়া যাবে।'

মুসার কথা শুনতে পেয়েই বোধহয় বললো হল, 'আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি।

তোমরা যা জানো, অ্যাসোসিয়েশনকে জানাও, অ্যাসোসিয়েশন তোমাদের নাম করে পুলিসকে জানাবে। তখন টাকাগুলো পুলিস খুঁজে বের করলেও পুরস্কারটা পাবে তোমরা। ঠিক আছে, আমি আসছি, তোমাদের সংগে দেখা করবো···নাহ্, সেটা বোধহয় উচিত হবে না। ডাকাতগুলো চোখ রাখছে। আমাকে চেনে ওরা, দেখলেই সন্দেহ করবে। তার চেয়ে তোমরাই বরং আমার এখানে চলে এসো। গোপনে দেখা হবে।'

'ইয়ার্ড ছেড়ে আমি যেতে পারছি না,' বললো কিশোর। 'চাচা-চাচী বাইরে গেছেন। দু'এক ঘন্টার মধ্যে ফিরবেন না।'

'হঁম্‌ম্‌,' এক মুহূর্ত নীরব রইলো হল। তারপর বললো, 'আজ সন্ধ্যায় আসতে পারবে? ইয়ার্ড বন্ধ করার পর? তোমরা তিনজনেই আসতে পারো। তবে এমনভাবে বেরোবে, যাতে ডাকাতগুলো দেখতে না পায়। ওদের চোখ এড়িয়ে কোনোভাবে বেরোতে হবে তোমাদের।'

'হয়তো পারবো। একটু পরেই রবিন আর মুসা বাড়ি যাবে, খেতে। আপনার কি মনে হয়? ডাকাতেরা ওদের পিছু নেবে?'

'মনে হয় না। ওদের চোখ তোমার ওপর। কাজেই গোপনে তোমাকেই শুধু বেরোতে হবে। পারবে?'

'পারবো,' লাল কুকুর চার-এর কথা ভাবলো কিশোর, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনোর আরেকটা গোপন পথ ওটা। 'তবে বেরোতে বেরোতে দেরি হবে। আজ শনিবার তো, সাতটার আগে বন্ধ করতে পারবো না।'

'ঠিক আছে। আটটা তাহলে?'

'আচ্ছা।'

'কোথায় দেখা হবে? ওশনভিউ পার্ক? ওখানেই থাকবো আমি। পুবের গেটের কাছে, বেঞ্চে, খবরের কাগজ পড়ার ভান করবো। গায়ে থাকবে বাদামী স্পোর্টস জ্যাকেট, মাথায় বাদামী হ্যাট। হুঁশিয়ার। পেছনে চোখ রেখো। কেউ যেন অনুসরণ করতে না পারে। ক্লিয়ার?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'যা যা বললাম, শুধু তোমরা তিনজনেই জানবে। ঘুণাক্ষরেও যেন আর কেউ কিছু না জানে।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে সন্ধ্যা আটটায় দেখা হবে। গুড-বাই।'

লাইন কেটে গেল।

'আরিব্বাপরে!' বললো মুসা। 'কিশোর, দশ হাজার ডলার দিয়ে কি কি করতে পারবো?'

'টাকাটা পাইনি আমরা এখনও,' জবাব দিলো কিশোর।

'পাইনি। কিন্তু পাবো তো। মিস্টার হল আমাদের কথা অ্যাসোসিয়েশনকে জানাবে, পুলিসকে জানাবে। এমনও হতে পারে, আমাদেরকে সংগে নিয়েই টাকা বের করতে যাবে পুলিস।'

'উঁহু না,' হাত নাড়লো রবিন। 'লেফটেন্যান্ট বেকার হলে নেবে না।'

'ইস্, মিস্টার ফ্লেচার যে কেন আজ বাইরে গেলেন,' আফসোস করলো কিশোর। 'উনি থাকলে…। আচ্ছা, মিস্টার হলের কথা তিনি আমাদেরকে…'

'কিশোর!' বোরিসের ডাক শোনা গেল। 'একজন কাস্টোমার। একশো ডলারের ভাঙতি চায়।'

'আমি যাই,' দুই সহকারীকে বললো কিশোর। 'এক কাজ করো। ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে ফেলো। সক্রেটিসকে ভরবে না, আলাদা রাখবে।'

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলো রবিন। 'হায় হায়, অনেক দেরি হয়ে গেছে! লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ছিলো, মনেই নেই।'

'ঠিক আছে, তুমিও যাও,' মুসা বললো। 'আমি একাই গোছাতে পারবো।'

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলো তিনজনে।

কিশোর আর রবিন বেরিয়ে একজন চললো অফিসের দিকে, আরেকজন সাইকেল নিয়ে লাইব্রেরিতে।

ওয়ার্কশপে রয়ে গেছে মুসা। সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে সক্রেটিসের দিকে চেয়ে বললো, 'তারপর, খুলির বাচ্চা, আছো কেমন? খবরদার, আমার সংগে কথা বলার চেষ্টা করো না। তাহলে কবর দিয়ে দেবো জঞ্জালের তলায়।'

নীরব রইলো সক্রেটিস। মুখে সেই একই হাসি।

চোদ্দ

নতুন তথ্য জেনেছে রবিন। জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে ছুটে চলেছে ওশনভিউ পার্কে, বন্ধুদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে যেন আর তর সইছে না। দেরিতে পৌঁছেছিলো লাইব্রেরিতে, তাই কাজ সেরে বেরোতেও দেরি হয়ে গেছে। ইয়ার্ডে গিয়ে এখন আর কিশোরকে পাওয়া যাবে না, মুসার বাড়িতে গিয়ে মুসাকেও না। কাজেই পার্কে মিস্টার হলের সংগে যেখানে দেখা করার কথা সেখানেই চলেছে এখন সে।

তালা লাগানোর ঝামেলা নেই তার।

কালো একটা স্টেশন ওয়াগনের কাছে ওদেরকে নিয়ে এলো হল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হলিউডের দিকে ছুটে চললো গাড়ি।

'দেয়ালের কাগজের নিচেই লুকানো আছে,' গাড়ি চালাতে চালাতে কিশোরকে বললো হল, 'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। মিসেস লারমার বলেছে আমাদেরকে, তার ভাই তাদের বাড়িটায় নুতন করে কাগজ লাগিয়েছিলো, রঙ করেছিলো। আমি শিওর, টাকাগুলো তখনই লুকিয়েছে কারমল। ডেটলারের কাছে চিঠিতে সেকথা লিখতে সাহস করেনি সে, ইঙ্গিতে শুধু ঠিকানাটা বলেছে। আর খামের ওপরে এক স্ট্যাম্পের ওপর আরেক স্ট্যাম্প লাগিয়েছে।'

'কাগজের ওপর কাগজ,' মাথা ঝাঁকালো হল। 'ভালো বুদ্ধি। ওই কাগজ ছাড়াতে যন্ত্রপাতি দরকার হবে। বাষ্প ছাড়া না ছিঁড়ে খোলা যাবে না। অসুবিধে নেই। আজ শনিবার, দোকানপাট অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকবে। বাড়িটা আগে পেয়ে নিই, তারপর যন্ত্র কিনে নিতে পারবো।'

প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে স্টেশন ওয়াগন। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, এমন একটা অঞ্চলে ঢুকে গতি কমালো হল। 'কিশোর, গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে দেখো। ম্যাপ পাবে।'

ম্যাপটা বের করে দিলো কিশোর।

ভলোমতো দেখলো হল, তারপর বললো, 'গুড। এবার সোজা যেতে হবে আমাদের। হাউসটন অ্যাভিনিয়ু ধরে কিছুদূর এগোলেই পাওয়া যাবে ম্যাপল স্ট্রীট। কতো নম্বর ব্লক বললে? পাঁচশো?'

'হয় পাঁচশো, নয়তো ছয়শো। সুপারিনটেনডেন্ট তা-ই বললো।'

'যেখানেই থাকুক, খুঁজে বের করবো। তবে দিনের আলো থাকতে থাকতেই করতে হবে। নইলে অন্ধকারে মুশকিল হয়ে যাবে।'

দ্রুত কমছে আলো।

হাউসটন অ্যাভিনিয়ুতে পৌঁছলো ওরা। বাঁয়ে মোড় নিলো হল। তিরিশ-চল্লিশটা ব্লক পেরিয়ে এসে ম্যাপল স্ট্রীটে পড়লো।

রাস্তার নাম লেখা নির্দেশক আর নেই এখন। তবু ওদের বুঝতে অসুবিধে হলো না, ঠিক জায়গায়ই এসেছে। কয়েকটা বাড়ি ইতিমধ্যেই ধসিয়ে ফেলা হয়েছে, ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের স্তূপ জমে আছে রাস্তার এখানে ওখানে। গোটা দুই বিশাল ক্রেন দেখা গেল, আর কয়েকটা বুলডোজার। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা অট্টালিকা—আশপাশের বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে—এককালে রেস্টুরেন্ট ছিলো, সেই স্বাক্ষর শরীরে বহন করছে এখনও। দানবীয় যন্ত্রের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। দেখে

মনে হয় যেন একাধিক বোমা ফেলা হয়েছিলো বাড়িটার ওপর।

'খাইছে!' বলে উঠলো মুসা। 'আমরা যেটা খুঁজছি সেটা ভাঙার মধ্যে পড়েনি তো?'

'মনে হয় না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'আমরা যেটা খুঁজছি, আরও দুটো গলির পরে হবে।'

খোয়ার একটা স্তূপের পাশ কাটালো হল। তার পরের বাড়িগুলো সব অক্ষত, এখানে পৌঁছেনি এখনও বুলডোজার। কেমন বিষণ্ণ পরিবেশ। জীবনের চিহ্ন নেই।

অথচ, মাত্র কয়েক শো' ফুট তফাতেই ব্যস্ত নগরীর চলমান জীবনযাত্রা, সে-কারণে ম্যাপল স্ট্রীটের স্থবিরতা আরও বেশি করে চোখে লাগে। সবাই চলে গেছে। আর কিছুদিন পরে বাড়িগুলোও যাবে। তার জায়গায় গড়ে উঠবে মহাব্যস্ত মহাসড়ক।

গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে পালালো একটা বেওয়ারিস হাড় জিরজিরে বেড়াল।

'নয়শো নম্বর ব্লক,' বললো হল। 'চোখ রাখো। কাছাকাছিই আছে কোথাও বাড়িটা।'

নীরব, নির্জন বাড়িগুলোর ধার দিয়ে খুব ধীরে এগোচ্ছে গাড়ি। কোনো কোনটার দরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে। যেন বোঝাতে চাইছে, বন্ধ থাক বা খোলা থাক, কিছু যায় আসে না আর এখন।

'ছয়শো নম্বর,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হল। 'দেখেছো কিছু?'

'ওই যে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো মুসা। হাত তুলে একটা বাড়ি দেখালো।

'ওই যে, আরও একটা আছে। একই রকম দেখতে,' আরেকটা বাড়ি দেখালো কিশোর। 'দুটো বাড়িরই চিলেকোঠা আছে, সামনের দিকে গোল জানালা। কোন্‌টা বুঝবো?'

'দুটো, না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো হল। 'কোন্‌টা, বুঝতে পারছো না?'

'মিসেস লারমার বলেছে, একতলা বাড়ি। ওপরে চিলেকোঠা, সামনের দিকে গোল জানালা। ব্যস।'

'এখানে দুটো বাড়ি ওরকম,' বিড়বিড় করলো হল। 'ঠিক আছে, চলো দেখা যাক। পরের ব্লকটা দেখি।'

পরের ব্লকে ওরকম আরেকটা বাড়ি পাওয়া গেল। দুই পাশে দুটো পাকা বাড়ি।

ওটার সামনে এনে গাড়ি রাখলো হল। 'গোল জানালাওয়ালা মোট তিনটা বাড়ি দেখলাম। এটা থেকেই শুরু করি।' এদিক ওদিক তাকালো। আর কোনো গাড়ি চোখে পড়লো না। 'তিন-আঙুলেরা মনে হচ্ছে আসেনি এখনও। তাড়াতাড়ি করতে হবে। নামো।'

পনেরো

দিন শেষ। অন্ধকার নামছে।

দ্রুত একবার রাস্তার দু'দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো হল। কেউ নেই। আগের মতোই নির্জন ম্যাপল স্ট্রীট।

বাড়ির সদর দরজায় ঠেলা দিলো সে। খুললো না।

'তালা দেয়া,' বললো। 'ভাঙতে হবে।'

গাড়ি থেকে ছোট একটা শাবল বের করে নিয়ে এলো। দুই পাল্লার মাঝের ফাঁকে শাবলের চ্যাপ্টা মাথাটা ঢুকিয়ে চাড় দিলো। মড়মড় করে উঠলো পুরনো কাঠ। চাপ আরও বাড়াতেই চিলতে উঠে গেল।

খুলে ফেললো দরজা।

আগে ঢুকলো হল। পেছনে তিন গোয়েন্দা।

ঘরের ভেতরে অন্ধকার। পকেট থেকে টর্চ বের করে দেয়ালে আলো ফেললো হল। ধুলোর ছড়াছড়ি। অবহেলা অযত্নে নোংরা হয়ে আছে। দেয়ালের কাগজ জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে ফিতের মতো ঝুলছে। এটা লিভিং রুম।

'এখান থেকেই শুরু করা যাক,' বললো হল। 'ছুরি আছে কারও কাছে?'

আট ফলার প্রিয় সুইচ নাইফটা বের করে দিলো কিশোর—সব সময় সংগে রাখে ওটা। ধারালো একটা ফলা খুলে আগা দিয়ে লম্বা করে কাগজের এক জায়গা কাটলো হল। কাটা জায়গাটা উল্টে দেখলো।

'এখানে নেই,' বললো সে। 'অন্য জায়গায় দেখতে হবে।'

আরেক জায়গার কাগজ একই ভাবে কাটলো সে। সেখানেও নেই। কাটলো আরও কয়েক জায়গায়। ঘরের চার দেয়ালের বিভিন্ন জায়গা কেটে দেখলো। পাওয়া গেল না।

'এঘরে নেই,' বললো হল। 'চলো, ডাইনিং রুমে দেখি।'

টর্চের আলোয় পথ দেখে খাবার ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। কিশোর বললো, 'ছুরিটা আমাকে দিন। আপনি আলো ধরুন।'

দেয়ালের এক জায়গার কাগজ কাটলো কিশোর।

কাটা জায়গাটা ধরে টান দিয়ে ওল্টালো হল।

'ওই তো!' চেঁচিয়ে বললো মুসা। 'সবুজ কি যেন।'

আলোটা কিশোরের হাতে দিয়ে ছুরিটা নিয়ে নিলো হল। 'আলো আরও কাছে

আনো।' ছুরি দিয়ে কাগজের আরও একটু কাটলো সে। সত্যি, সবুজ দেখা যাচ্ছে।

'নিচে আরেকটা কাগজ,' বললো হল। 'এর নিচে কি আছে দেখা যাক।'

নিচে আবার সেই কাঠ।

ডাইনিং রুমে পাওয়া গেল না। প্রথম বেডরুমটায় ঢুকলো ওরা। দেয়াল চিরে চিরে দেখলো। দ্বিতীয় বেডরুমেও একই অবস্থা, দেয়ালের কাগজ ফালা ফালা করেও নিচে কিছু পাওয়া গেল না। বাথরুম আর রান্নাঘরের দেয়ালে কাগজ নেই, নানারকম ছবি আঁকা।

একটা মই খুঁজে নিয়ে চিলেকোঠায় উঠলো কিশোর। এখানেও দেয়ালে কাগজ নেই। নেমে এলো।

'এ-বাড়িতে নেই,' বললো হল। উত্তেজনায় ঘামছে। 'চলো, আরেকটা দেখি।'

বেরিয়ে এলো ওরা। বাইরেও অন্ধকার। শুধু পথের দুই মাথায় দুটো লাইটপোস্টে আলো জ্বলছে। আলো নেই, কেমন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে শূন্য বাড়িগুলোকে।

প্রথম যে বাড়িদুটো দেখেছিলো, তার একটার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। এটার সদর দরজায় তালা নেই, খোলা।

ভেতরে ঢুকলো চারজনে।

দেয়ালে নতুন কাগজ। 'বোধহয় এটাই,' আশা হলো হলের। 'কিশোর, কাটো।'

কাটলো কিশোর।

উল্টে দেখলো হল।

কিছুই নেই।

এই বাড়িরও প্রতিটি ঘরের দেয়ালে যেখানেই কাগজ দেখা গেল, কেটে দেখলো ওরা। সবাই উত্তেজিত। কিছুই পেলো না এখানেও।

'আর বাকি রইলো একটা,' আশা—নিরাশায় দুলছে মন, হলের কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। 'ওটাতেই থাকবে।'

তৃতীয় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

দরজা বন্ধ। ভাঙার জন্যে তৈরি হয়েছে, হঠাৎ দরজার গায়ে আলো ফেললো কিশোর। চকমক করে উঠলো কাঠের পাল্লায় বসানো ধাতব নম্বর।

'জলদি নেভাও!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো হল। 'দেখে ফেলবে কেউ।'

'দেখলাম,' বললো কিশোর। 'মনে হচ্ছে এটাই মিসেস লারমারের বাড়ি।'

'কি দেখলে?' ফিসফিস করে বললো রবিন। এলাকাটা এতোই নীরব, জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে সে।

'হ্যাঁ, কি দেখলে?' হলও জিজ্ঞেস করলো।

'নম্বর। ছয়শো একাত্তর,' জবাব দিলো কিশোর। 'জায়গা বদলানোর পর বাড়ির নতুন নম্বর। আগে অন্য নম্বর ছিলো, তুলে ফেলা হয়েছে, দাগ দেখলাম।'

'তাই? দেখি তো আবার? জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলবে।'

টর্চের গোল আলো পড়লো আবার নম্বরের ওপর। চারজনেই দেখলো, নতুন নম্বর প্লেটের ওপরে কাঠে দাগ, রঙ করেও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যায়নি। কিংবা হয়তো তেমন চেষ্টা করেনি নতুন মালিক। বেশ স্পষ্টই দেখা যায় দাগটা।

'পাঁচশো বত্রিশ!' চেঁচাতে গিয়েও স্বর নামিয়ে ফেললো মুসা। 'পেলাম শেষ পর্যন্ত।'

'চলো, এখন ভেতরে ঢুকি,' হল বললো।

চড়মড় শব্দ করে কাঠ ভাঙলো, চিলতে উঠলো, খুলে গেল দরজা।

কে কার আগে ঢুকবে, হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিলো। তর সইছে না আর। উত্তেজনায় দ্রুত হয়ে গেছে নিঃশ্বাস। শিওর এবার পাওয়া যাবেই। এই বাড়িরই কোনো একটা দেয়ালে কাগজের তলায় লুকানো রয়েছে পাঁচ লাখ ডলার।

'আলো আরো কাছে আনো, কিশোর,' হল বললো।

অন্য দুটো বাড়ির তুলনায় ভারি করে কাগজ লাগানো এটার দেয়ালে।

এক হাতে টর্চ ধরে আরেক হাতে ছুরি দিয়ে পোঁচ লাগালো কিশোর।

কাগজের কাটা জায়গা ওল্টালো হল। কাঠ দেখা গেল, টাকা নেই।

'এক কোণা থেকে শুরু করি,' বললো সে। 'পাঁচ লাখ ডলার জোড়া লাগালে অনেক বড় চাদর হবে। ওখান থেকে কাটো। জলদি।'

একটা দেয়াল দেখা শেষ হলো।

দ্বিতীয় দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো কিশোর। দু'দিক থেকে তার গায়ের ওপর প্রায় চেপে এলো দুই সহকারী গোয়েন্দা।

পোঁচ দিতে যাবে কিশোর, এই সময় একটা শব্দ শুনে স্থির হয়ে গেল।

'কী...,' শুরু করলো বটে হল, কিন্তু বাক্যটা শেষ করতে পারলো না।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজার ভেজানো পাল্লা। ভারি জুতোর শব্দ। বড় একটা টর্চের চোখ ধাঁধানো আলো এসে পড়লো চারজনের গায়ে।

'বেশ,' গর্জে উঠলো কুৎসিত একটা কণ্ঠ, 'এবার মাথার ওপর হাত তোলো দেখি, বাপুরা।'

ষোলো

আদেশ পালন করলো চারজনেই।

তীব্র আলোয় চোখ মিটমিট করছে কিশোর। টর্চের ওপাশের লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না।

'পুলিস?' বললো হল। 'আমি নরম্যান হল। স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর...'

খরখরে হাসি থামিয়ে দিলো তাকে। 'নরম্যান হল, না? ভালো, ভালো। ছেলেগুলোকে এই কথাই বলেছো বুঝি?'

আলোর দিক থেকে চোখ ফেরালো কিশোর। বুঝতে পারলো, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করলো, 'মিস্টার হল ব্যাংকারস প্রোটেকটিভ অ্যাসোসিয়েশনের লোক নন?'

আবার খরখরে হাসি। 'ওই ব্যাটা?' বললো কুৎসিত কণ্ঠ, 'ওর আসল নাম ডিকটা সলোমন। ইউরোপের সমস্ত চোরের ওস্তাদ। কোন্ দেশের পুলিস ওকে খুঁজছে না?'

'কিন্তু অফিসিয়াল কার্ড যে দেখালো,' প্রতিবাদ করলো মুসা।

'ওরকম কার্ড ওর কাছে কয়েক ডজন আছে। জাল আইডেনটিটি কার্ড বানানো কোনো ব্যাপারই না। খুব ফাঁকি দিয়েছে তোমাদের, খারাপ লাগছে নিশ্চয়? দুঃখ করো না। বাঘা বাঘা পুলিস অফিসারকে বহুবার নাকানি-চোবানি খাইয়েছে ও।

'তারপর, মিস্টার সলোমন? ভেবেছিলে আমাদের নাকের ডগা দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। ফাঁকিটা প্রায় দিয়ে ফেলেছিলে। এই কোঁকড়াচুলো ছেলেটাই ধরিয়ে দিলো। ইয়ার্ডের ওপর চোখ রাখছিলাম। ওয়ার্কশপে ঢুকতে দেখলাম, তারপর আর বেরোনোর নামগন্ধ নেই। সন্দেহ হলো। নিশ্চয় অন্য কোনো পথে বেরিয়ে গেছে। গতকাল এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। ভাবলাম, এদিকেই এসেছে। আমার অনুমান ঠিকই হয়েছে। দরজার ওপর আলো ফেলা হলো, দেখলাম।'

'তুমি তিন-আঙুলে, না?' জিজ্ঞেস করলো নরম্যান হল, ওরফে ডিকটা সলোমন। 'শোনো, আমরা হাত মেলাতে পারি। টাকাগুলো এখনও পাওনি। পেলে...'

'চুপ!' ধমকে উঠলো টর্চধারী লোকটা। 'টাকাগুলো বের করে আমরা নিয়ে যাবো। তোমাকে ফেলে যাবো পুলিসে ধরার জন্যে। আমাদেরকে সেবার ঠকিয়েছিলে না, এবার তার শোধ নেবো। ঘোরো এখন দেয়ালের দিকে। ছেলেরা, তোমরাও।...নরিস, ট্যানটন, দড়ি বের করো। বাঁধো ওদেরকে। হারামীটাকে শক্ত

করে বাঁধবে।'

নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে কিশোরের, ডিকটা সলোমনের ফাঁকিতে পড়েছে বলে। ধড়িবাজ লোক। প্রথমেই জেনে নিয়েছে, চীফ ইয়ান ফ্লেচার শহরের বাইরে। তারপর একটা গল্প বানিয়েছে। আর গর্দভের মতো তার সেই গল্পের ফাঁদে পা দিয়েছে সে।

ওই রিপোর্টার ব্যাটাই যতো সর্বনাশের মূল! যতো রাগ ক্যাল উইলিয়ামসের ওপর গিয়ে পড়লো কিশোরের। কাগজে ফলাও করে ছেপেছে ডেটলারের ট্রাঙ্কের কথা, তিন গোয়েন্দার ছবি ছেপে দিয়েছে, নইলে এভাবে চোর-ডাকাতের চোখ পড়তো না তাদের ওপর।

কিন্তু এখন আর অনুশোচনা করে লাভ নেই।

পিঠের ওপর হাত এনে কব্জির ওপর কব্জি রেখে বাঁধা হলো। তরপর মেঝেতে বসিয়ে দুই পা এক করে হাঁটুর কাছ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পেঁচিয়ে বাঁধা হলো।

'হ্যাঁ, এইবার হয়েছে,' সলোমনের বাঁধনে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে বললো তিন-আঙুলে ডেক। খরখরে হাসি হাসলো। 'মুখ বাঁধার দরকার নেই। ইচ্ছে হলে গলা ফাটিয়ে চিল্লাও। কেউ শুনবে না। তবে মরবে না, এই কথা দিতে পারি। কাল রবিবার, এভাবেই থাকতে হবে তোমাদের। পরশু সোমবার সকালে শ্রমিকেরা কাজে আসবে। তখন জোরে জোরে চিল্লাবে, ওরা শুনতে পাবে। এসে খুলে দেবে বাঁধন। ঠিক আছে?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো সে।

অস্পষ্ট দেখা গেল, ড্রেক মোটাসোটা লোক। তার দুই সঙ্গী তার মতো মোটা নয়, আবার রোগাটেও নয়। চেহারা দেখা গেল না।

খানিক আগে কিশোররা যা করছিলো, সেই কা[illegible] মন দিলো এবার তিন আগন্তুক। দেয়ালের কাগজ চিরে চিরে দেখতে শুরু করলো।

'দেয়ালের কাগজের তলায় টাকা লুকিয়েছে, না?' বকবক করে চললো ড্রেক। 'ভালো বুদ্ধি, চমৎকার বুদ্ধি। তোমাদেরও বুদ্ধি আছে, ঠিক বুঝে ফেলেছো। যা হোক, কাজ কমিয়ে দিয়েছো আমাদের। আমরা তো কতো মাথা ঘামালাম, বুঝতেই পারিনি কিছু। কোঁকড়া-চুল ছেলেটার বুদ্ধি, না? নাম কি ওর, সলোমন?'

'কিশোর। ডেটলারের চিঠিতেই ছিলো সূত্র। চিঠিতে আর খামের ওপরে। ট্রাঙ্কের ভেতরে ছিলো ওগুলো।'

'বরাবরই সন্দেহ ছিলো আমার,' বললো ড্রেক। 'সেজন্যেই ট্রাঙ্কটা চাইছিলাম। লম্বুটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নিয়েও এলো নরিস আর ট্যানটন। কিন্তু ওদের পেছনেও লোক লেগেছিলো, খেয়াল করেনি। ট্রাঙ্কটা কেড়ে নিলো আবার। তুমি

নিয়েছিলে, সলোমন?'

'না। কে নিয়েছিলো কিছুই জানি না আমি।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করলো ড্রেক। 'কে নিলো তাহলে? এই ছেলেরা নিশ্চয় নয়।'

'না, ওরা নয়,' জবাব দিলো তার এক সহকারী। 'চার-পাঁচজন এসেছিলো। মুখে রুমাল বাঁধা। ওস্তাদ লোক। বুঝলামই না কি হতে কি হলো। শুধু দেখলাম, আমরা মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। ট্রাঙ্কটা হাওয়া।'

'কারা ওরা?' বলে নিজে নিজেই জবাব দিলো ড্রেক, 'হবে অন্য কোনো দল, আমাদের মতোই টাকাগুলোর পেছনে লেগেছে। বোঝা যাচ্ছে, ট্রাঙ্কটা হাতে পেয়েও সুবিধে করতে পারেনি। নইলে এতোক্ষণে এসে যেতো এখানে। নরিস, ট্যানটন, আরও জলদি হাত চালাও।'

মেঝেতে বসে নীরবে তাকিয়ে রইলো চার বন্দি।

দ্রুত দেয়ালের কাগজ কাটছে দু'জনে, টেনে টেনে ছিঁড়ছে।

কিশোর দেখছে, আর অবাক হয়ে ভাবছে—ট্রাঙ্কটা নরিস আর ট্যানটনের কাছ থেকে কারা ছিনিয়ে নিয়েছিলো? নিশ্চয় ওরাই আবার ট্রাঙ্কটা পাঠিয়েছে তিন গোয়েন্দার কাছে। কারা? কিছুই আন্দাজ করতে পারলো না সে।

লিভিং রুমের চার দেয়ালের সমস্ত কাগজ ছিঁড়ে ফেলা হলো। টাকা পাওয়া গেল না।

'এঘরে নেই,' ড্রেক বললো। 'সলোমন, কোন্ ঘরে আছে, জানলে বলো। তাহলে ছেড়ে দেবো।'

'জানলে কি আর অতো কাটাকাটি করতাম নাকি?' জবাব দিলো সলোমন। 'প্রথমেই তো গিয়ে কেটে বের করে নিতাম। তবে, এক কাজ করতে পারো। আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো।'

'না, সেটি হচ্ছে না। টাকাগুলো পেলেই কিছু একটা করে বসবে। আর তোমার ফাঁকিতে পড়ছি না, একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। ভেজা সাবানের মতো পিচ্ছিল তুমি, মিস্টার ডিকটা সলোমন।' সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললো ড্রেক, 'এই চলো, অন্য ঘরে যাই।'

বন্দিদেরকে অন্ধকারে ফেলে রেখে বেডরুমে গিয়ে ঢুকলো ওরা। কাগজ কাটা ছেঁড়ার আওয়াজ শুরু হলো।

'সরি,' নিচুকণ্ঠে বললো সলোমন। 'তোমাদের এ-অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। বিশ্বাস করো, চালাকি করি বটে, খুনখারাপিতে আমি কখনোই যাই না। গায়ের জোর খাটানোর চেয়ে মগজ খাটানোই আমার বেশি পছন্দ।'

'দোষ আমারও আছে,' গম্ভীর শোনালো কিশোরের কণ্ঠ। 'আমি আপনাকে সন্দেহ করলাম না কেন?'

চুপ হয়ে গেল ওরা। কাগজ ছেঁড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে গাল দিয়ে উঠছে তিন ডাকাতের কেউ একজন, টাকা না পাওয়ার নিরাশায়।

তারপর, আবার সামনের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। এবার আর ঝটকা দিয়ে নয়, খুব সাবধানে আস্তে আস্তে খোলা হচ্ছে।

খোলা দরজায় একটা ছায়ামূর্তি আবছাভাবে দেখা গেল, একজন মানুষ।

'কে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সলোমন।

'চুপ!' ফিসফিস করে জবাব এলো। 'তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি। চুপ করে থাকো।'

আরেকজন ঢুকলো, আরও একজন। তারপর আরও কয়েকজন। এতটুকু শব্দ করলো না কেউ।

'সাবধান!' প্রথম লোকটার কণ্ঠ। 'দেয়াল ঘেঁষে থাকবে,' নিজের লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে। 'ব্যাটারা দরজা দিয়ে বেরোনোর সংগে সংগে মাথায় ছালা পড়িয়ে দেবে। ছুরি-টুরি বাদ। রক্তারক্তি যেন না হয়।'

খুবই অবাক হয়েছে তিন গোয়েন্দা। হতাশা দূর হয়েছে অনেকখানি। সত্যি যদি ওদেরকে বাঁচাতে এসে থাকে ওরা, তাহলে সোমবার পর্যন্ত আর বেকায়দা অবস্থায় বসে থাকতে হবে না এখানে। কিন্তু লোকগুলো কে? পুলিস নয়, এটা ঠিক। সত্যি কি বন্ধু ওরা? নাকি ওরাও আরেকটা খারাপ দল, যারা টাকাগুলো চায়?

ভেতরের ঘর থেকে ঝাঁঝালো কণ্ঠ শোনা গেল। ভীষণ বিরক্ত। বোঝা গেল, টাকা খুঁজে পায়নি। লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে আসছে ওদের পায়ের শব্দ।

দরজায় এসে দাঁড়ালো তিন-আঙুলে। বন্দিদের ওপর আলো ফেলে কড়া গলায় বললো, 'ফাঁকি দিয়েছো। দেয়ালের কাগজ কেটে রেখে, আমাদের দেখিয়ে ফাঁকি দিয়েছো। বাঁচতে চাইলে সত্যি কথা বলো। কোথায় আছে টাকা?'

সতেরো

কয়েকটা ছায়ামূর্তি একসংগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ড্রেকের ওপর। একটানে তাকে দরজার কাছ থেকে সরিয়ে আনলো। আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি গিয়ে ধরলো নরিস আর ট্যানটনকে। আক্রমণ আশা করেনি ওরা, তাই সহজেই ধরা পড়ে গেল।

হাত থেকে টর্চ ছেড়ে দিয়েছে ড্রেক। ঝাড়া দিয়ে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে।

মাটিতে পড়েও টর্চটা নেভেনি। যদিও অন্যদিকে আলো দিচ্ছে, লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। আগের বন্দিরা বসে বসে দেখলো, তিন-আঙুলের মাথায় ছালা পরিয়ে দেয়া হলো। বেশি ধস্তাধস্তি করছে। ল্যাঙ মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো একজন। উপুড় করে চেপে ধরলো কয়েকজনে।

'জলদি ব্যাটাদের বাঁধো,' আদেশ দিলো সেই প্রথম লোকটা।

ধরা কি আর দিতে চায়? আরও কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হলো। অবশেষে হার মানতে বাধ্য হলো তিন ডাকাত।

চেঁচিয়ে গালাগাল শুরু করলো তিন-আঙুলে। ছালা ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওর মুখে। তার ওপর দড়ি পেঁচিয়ে কথা বন্ধ করা হলো ওর। হাত-পা কষে বেঁধে মেঝের ওপর ফেলে রাখা হলো তিন ডাকাতকে।

'ভেরি গুড,' বললো প্রথম লোকটা। 'তোমরা বাইরে যাও। ছেলেগুলোর দড়ি খুলে দিয়ে আসছি আমি।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তার দলের সবাই। টর্চটা তুলে ছেলেদের ওপর ফেললো সে। 'কপাল ভালো তোমাদের। ধরার সময় ওপরে পড়েনি কেউ। তাহলে ভর্তা হয়ে যেতে।'

'আরেকটু হলেই আমার ওপর পড়তো ড্রেক,' বললো কিশোর।

'হুঁ,' শব্দ করে হাসলো লোকটা। বড় এক ছুরি বের করে এগিয়ে এলো। কাছে এসে বসলো। দেখা গেল লোকটার পুরু গোঁফ।

চিনে ফেললো তাকে কিশোর। 'আপনি!' এই লোকই সেদিন জিপসিদের বাড়িতে দরজা খুলে দিয়েছিলো, পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো জিপসি শেরিনার ঘরে।

হাসলো আবার লোকটা। 'হ্যাঁ, আমি। টাকিনো।' কিশোরের বাঁধন কাটতে শুরু করলো।

'কিন্তু···কিন্তু এখানে এলেন কিভাবে?' হাতের কব্জি ডলতে ডলতে বললো কিশোর।

'পরে,' জবাব দিলো লোকটা। 'এখন সময় নেই।···আরি, বড়টা গেল কোথায়?'

এতোক্ষণে খেয়াল হলো তিন গোয়েন্দার। পাশে তাকালো। ডিকটা সলোমনকে দেখতে পেলো না। দুটো কাটা দড়ি পড়ে আছে।

'পালিয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'সলোমন পালিয়েছে! নিশ্চয় ছুরি বা ব্লেড কিছু ছিলো ওর কাছে। গোলমালের সময় দড়ি কেটে পালিয়েছে।'

'ওকে আর ধরা যাবে না,' বললো টাকিনো। 'যাআক, তিনটাকে তো পেলাম।

ওদেরকেই পুলিসে দেবো।' রবিন আর মুসারও বাঁধন কেটে দিয়ে বললো, 'এখন বাইরে এসো তো। শেরিনা তোমাদের সংগে কথা বলবে।'

শেরিনা! জিপসি মহিলা! টাকিনোর পিছু পিছু বেরিয়ে এলো তিন গোয়েন্দা। মোড়ের কাছে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে পুরনো গাড়ি। পেছনের দুটোতে গাদাগাদি করে লোক বসেছে। সামনের গাড়িটাতে বসে আছে মহিলা।

শেরিনা-ই। জিপসিদের পোশাক পরেনি, বোধহয় লোকের চোখ যাতে না পরে সেজন্যে।

'ছেলেরা ভালোই আছে, শেরিনা,' টাকিনো বললো। 'চোট-টোট লাগেনি। তিনটে শয়তানকে বেঁধে ফেলে এসেছি। একটা পালিয়েছে।'

'পালাক,' শান্তকণ্ঠে বললো শেরিনা। 'এই, তোমরা গাড়িতে ওঠো,' ছেলেদের বললো। 'কথা আছে।'

এক সীটে চারজন, ঠাসাঠাসি করে বসতে হলো। টাকিনো দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে, পাহারা দিচ্ছে।

'তারপর, কিশোর পাশা, আবার দেখা হলো আমাদের,' বললো শেরিনা। 'কাচের বলে দেখতে পেয়েছি তোমাদের। তাই তাড়াহুড়ো করে ছুটে এলাম।'

'আসলে, আমাদের পিছু নিয়েছিলেন, না?' কাচের বলের কথা বিশ্বাস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলো শেরিনা। 'তুমি আমার সংগে দেখা করে যাওয়ার পর থেকেই তোমাদের ওপর চোখ রাখা হয়েছিলো। কাচের বলে দেখলাম বিপদ, তাই তোমাদেরকে বিপদমুক্ত রাখার জন্যে ওদেরকে লাগিয়েছিলাম। তোমাদেরকে যারা অনুসরণ করলো, তাদেরকে অনুসরণ করলো টাকিনো আর তার লোকেরা। আজ রাতেও ওই একই ব্যাপার হয়েছে। একটা গাড়ি নিয়ে পিছু নিয়েছিলো টাকিনো। তোমরা এখানে এসেছো, ফোনে জানালো আমাকে। দুই গাড়ি লোক নিয়ে ছুটে চলে এলাম। এখন আসল কথায় আসা যাক। টাকাগুলো পেয়েছো?'

'না,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'নেই এখানে। অথচ আমি শিওর ছিলাম, এখানেই আছে। চিঠিতে তো সেটাই ইঙ্গিত করা আছে।'

'চিঠিতে সূত্র আছে, এটা ডেটলার বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু ধাঁধাটার সমাধান করতে পারেনি,' বললো শেরিনা।

'ডেটলারকে চেনেন নাকি?'

'সম্পর্ক আছে,' ঘুরিয়ে বললো শেরিনা। 'ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমি। পয়লা দিন দেখেই বুঝেছি তুমি চালাক ছেলে। ধাঁধার সমাধান করতে পারবে।

টাকাগুলো কোথায় কোথায় খুঁজেছো?'

'দেয়ালের কাগজের তলায়। ওখানে থাকতে পারে, কেউ ভাববে না। অনেক খুঁজলাম, পাওয়া গেল না।'

'আর কোথায় থাকতে পারে?'

'চিঠিতে খোলাখুলি বলতে পারেনি কারমল। ইঙ্গিতে বলেছে। সেই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেই...'

'দেয়ালের কাগজের তলায় আছে, এটা মনে হয়েছিলো কেন?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে শেরিনা। 'বলো, তাড়াতাড়ি করো।'

'খামের ওপরের স্ট্যাম্প লাগানো দেখে,' রবিন জানালো। 'পাশাপাশি দুটো স্ট্যাম্প, একটা দুই সেন্টের, একটা চার। চার সেন্টের স্ট্যাম্পটার তলায় আবার সবুজ একটা এক সেন্টের...'

'রবিন!' বলে উঠলো কিশোর।

'কী! কি হয়েছে?'

'শেষ কথাটা কি বললে?'

'বললাম চার সেন্টের...'

'দাঁড়াও! সূত্রটা এখানেই।'

'কোথায় সূত্র?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'মিস শেরিনা,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললো কিশোর, 'কারমলের উচ্চারণে একটা খুঁত ছিলো। "এল" অক্ষরটা বলতে পারতো না।'

'তাতে কি?' বুঝতে পারছে না শেরিনা।

'তাতে? "ফ্লোর" কে কি উচ্চারণ করতো সে? ফোর। তার মানে ফোর সেন্টের স্ট্যাম্প...'

'ফ্লোরের নিচে আছে টাকাগুলো!' চেঁচিয়ে উঠলো রবিন। 'মেঝের তলায়। কারমলের উচ্চারণে ভুল আছে জানতো ডেটলার। বন্ধু বুঝতে পারবে আশা করেই এই ফন্দিটা করেছিলো কারমল।'

'কিন্তু বন্ধু বুঝতে পারেনি। আমরাও ভুল করেছি। স্ট্যাম্পের ওপরে স্ট্যাম্প দেখে ভেবেছি দেয়ালের কাগজের তলায় আছে। উচ্চারণের দোষের কথাটা একবারও ভাবিনি। আরও একটা ব্যাপার বোঝা উচিত ছিলো আমার, টাকায় আঠা লাগালে সেই আঠা ছাড়ানোও কম ঝামেলা নয়। তারপর, কাগজের তলায় সেঁটে রাখলে নষ্ট না করে খুলে আনা আরও কঠিন, প্রায় অসম্ভব। ওরকম একটা কাজ কেন করতে যাবে কারমলের মতো বুদ্ধিমান মানুষ?'

'টাকিনো,' ডাকলো শেরিনা। 'ও-গাড়ি থেকে শাবল বের করে আনো। জলদি।'

খানিক আগে যেখানে বন্দি হয়েছিলো, সেখানে আবার এসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা। সংগে টাকিনো আর শেরিনা।

ভেবে দেখলো কিশোর, কারমল হলে সে কোন্ ঘরের মেঝেতে টাকাগুলো লুকাতো? লিভিং রুমে নিশ্চয় নয়। তার বোন কিংবা দুলাভাইয়ের বেডরুমে তো নয়ই। হয় গেস্টরুম, যেখানে কারমল ঘুমাতো, নয়তো চিলেকোঠায়।

গেস্টরুমের সম্ভাবনাটা বাদ দিয়ে দেয়া যায়। কারণ, বাড়িটা সরানো হয়েছে। টাকাগুলো ওখানে থাকলে বাড়ি সরানোর সময়ই বেরিয়ে পড়তো। বেরিয়েছে কিনা জানার উপায় নেই, টাকাগুলো পেয়ে যদি কথাটা গোপন রেখে থাকে নতুন বাড়িওয়ালা? দেখার জায়গা এখন একটাই, চিলেকোঠার মেঝেতে।

দশ মিনিট চেষ্টা করেই কোণের একটা তক্তা তুলে ফেললো টাকিনো। দুই থাক তক্তা দিয়ে তৈরি মেঝেটা। পাশের আরেকটা তক্তা সরিয়েই স্থির হয়ে গেল সে।

টর্চের আলোয় দেখা গেল সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা সবুজ নোটের পাতলা অসংখ্য বাণ্ডিল। পলিথিনে পেঁচানো।

'ফোর, মানে ফ্লোরের নিচে!' বিড়বিড় করলো মুসা। 'কি বুদ্ধি! সবুজ স্ট্যাম্পের ওপরে চার সেন্টের স্ট্যাম্প···নাহ্, লোকটা জিনিয়াস ছিলো!'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'তোমরাও কম জিনিয়াস নও,' শেরিনা বললো। 'কারমলের সংগে এতো ঘনিষ্ঠতা থাকার পরেও ডেটলার যা বুঝতে পারেনি···যা হোক, অবশেষে পাওয়া তো গেল। কয়েকটা ডাকাতও ধরা পড়লো। পুকুরে পড়া ব্যাঙেরাও নিরাপদে উঠে এলো পানি থেকে।' হাসলো মহিলা।

'আপনি! আপনি আমাদের হুঁশিয়ার করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হ্যাঁ, আমিই লোক পাঠিয়েছিলাম তোমাদের ইয়ার্ডে।··· এখানকার কাজ শেষ। চলো যাই। পুলিসকে ফোন করতে হবে। টাকাগুলো এসে নিয়ে যাবে, ডাকাতগুলোকেও।'

'এক মিনিট, মিস শেরিনা,' হাত তুললো কিশোর। 'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যান। ট্রাঙ্কটা আমাদের কাছে ফেরত গেল কিভাবে? আর খুলিটা কি সত্যি কথা বলে···'

'পরে, পরে। দু'চার দিন পর সেই পুরনো-ঠিকানায় আবার দেখা করো আমার সংগে। ওই বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি আবার আমরা। পুলিসের ভয়ে চলে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব তো অন্তত দেবেন? ডেটলার কোথায়?'

'মারা গেছে, না?' মুসা বললো।

'আমি তা বলিনি,' শেরিনা বললো। 'বলেছি, মানুষের দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে সে। তার ভয়ের দিন শেষ হয়েছে। আবার হয়তো ফিরে আসবে মানুষের দুনিয়ায়।'

বাইরে বেরোলো পাঁচজনে।

গাড়িতে গিয়ে উঠলো টাকিনো।

শেরিনা বললো, 'আশা করি, বাস ধরে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।'

'পারবো,' জবাব দিলো কিশোর।

জিপসি মহিলাও গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

চলে গেল তিনটে গাড়ি।

'হফ্ফ!' গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়লো মুসা। 'টাকাগুলো পেলাম শেষ পর্যন্ত।'

'শেরিনা সাহায্য না করলে পারতাম না,' কিশোর বললো। 'ঠিক চার দিন পর আবার যাবো ওর বাড়িতে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতে হবে।'

আ৺ারো

সাত দিন পর।

বিখ্যাত পরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকলো তিন গোয়েন্দা।

বিশাল ডেস্কের ও৺াশে বসে আছেন পরিচালক। মুখ তুললেন। 'বসো। হাতের কাজটা সেরে নিই, তারপর শুনবো।'

খসখস করে কি যেন লিখে সামনের ফাইলটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখলেন তিনি। হাত বাড়ালেন রবিনের দিকে। 'দেখি, দাও।'

নতুন কেসের রিপোর্ট লেখা ফাইলটা ঠেলে দিলো রবিন।

অনেকক্ষণ একটানা নীরবতা। পুরো ফাইল পড়ে শেষ করে আবার মুখ তুললেন পরিচালক। 'ভালো দেখিয়েছো। এতো দিন চেষ্টা করে পুলিস যা পারেনি, তোমরা...'

'আরও আগেই পারা উচিত ছিলো, স্যার,' বললো কিশোর। 'দেয়ালে ওয়াল পেপারের নিচে টাকা লুকানো আছে, এটা ভেবেই ভুল করেছি। ভাগ্য ভালো...'

'ভাগ্য তাদেরই ভালো হয়, যারা সদা-সতর্ক থাকে,' একটা প্রবাদ বললেন পরিচালক। 'ভুল করো আর যা-ই করো, শেষে তো ঠিক করেছো। টাকাগুলো বের করে ছেড়েছো।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, স্যার।'

'তবে গেছো একেবারে শেষ সময়ে। আর দু'দিন দেরি করলেই যেতো এতোগুলো টাকা, মাটিতে মিশিয়ে দিতো বুলডোজার। তো, পুরস্কার কি পেয়েছো?'

মাথা নাড়লো কিশোর।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মুসা।

'না, স্যার,' রবিন বললো। 'আসলে কোনো পুরস্কারই ঘোষণা করা হয়নি, ডিকট্যা সলোমন মিছে কথা বলেছিলো। তবে, ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট খুব প্রশংসা করে একটা চিঠি দিয়েছেন আমাদেরকে। বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, তাঁকে দিয়ে সাহায্য হবে এমন কোনো অসুবিধেয় পড়লেই যেন যাই তাঁর কাছে। সব চেয়ে বড় পুরস্কার পাবো বোধহয় চীফ ইয়ান ফ্লেচারের কাছ থেকে। জুনিয়র ডিটেকটিভ হিসেবে আমাদেরকে পুলিস ফোর্সে নিয়ে নেয়ার সুপারিশ করেছেন তিনি তাঁর বসকে।'

'ভেরি গুড। টাকার চেয়ে এগুলো অনেক বড় পুরস্কার। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। প্রথম প্রশ্ন, ডেটলারের কি হয়েছিলো?'

হাসলো ছেলেরা। জানতো, এই প্রশ্নটা করবেনই তিনি।

কিশোর বললো, 'ডেন কারমলের কাছ থেকে চিঠি পেলো ডেটলার। জেলে থাকতেই তাকে টাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলো কারমল। বলেছিলো, পরে চিঠিতে জানাবে। চিঠি পেলো ডেটলার, কিন্তু ধাঁধার সমাধান করতে পারলো না। চিঠিটা ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রাখলো সে।

'একদিন বাইরে থেকে হোটেলে ফিরছে ডেটলার। ক্লার্ক তাকে ডেকে বললো, কয়েকজন লোক দেখা করতে এসেছিলো। তাদের চেহারার বর্ণনাও দিলো। তিন-আঙুলেকে আগে থেকেই চেনে ডেটলার, ভয় পেয়ে গেল। ড্রেককে দিয়ে সবই সম্ভব। টাকার জন্যে নিজের মায়ের পিঠে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করবে না। পুলিসের কাছে যাওয়ার কথা ভাবলো ডেটলার। কিন্তু পুলিস যদি তার কথা বিশ্বাস না করে? চিঠির রহস্যের তো সমাধান করতে পারেনি সে। দ্বিধায় পড়ে পুলিসের কাছেও গেল না।

'ক্লার্কের ওখান থেকে আর নিজের ঘরে যায়নি ডেটলার। সোজা বেরিয়ে গিয়েছিলো। তার সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে গিয়েছিলো ওই হোটেলে। সেগুলো পরে নীলামে বিক্রি করে দিয়ে বিলের টাকা উসুল করে নেয় হোটেলের মালিক।'

'তাহলে ডেটলার মরেনি?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন পরিচালক। 'কিন্তু শেরিনা যে বললো মানুষের দুনিয়া থেকে চলে গেছে সে.'

'তা-ই করেছিলো,' হাসলো কিশোর। 'এমনভাবে লুকিয়ে ছিলো যাতে তিন-আঙুলে আর তার দোসররা খুঁজে না পায়। উইগ পরে, মেকাপ করে মেয়েমানুষ সেজেছিলো। পুরুষ মানুষের দুনিয়া থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো।'

'ও, এই ব্যাপার,' বললেন পরিচালক। 'জিপসি শেরিনাই তাহলে ডেটলার!'

রবিন আর মুসা হাসলো।

'হ্যাঁ, স্যার,' কিশোর বললো। 'জিপসিরা ডেটলারের পুরনো বন্ধু। শুধু বন্ধু না, আত্মীয়ও। ডেটলারের মা ছিলো জিপসি। কাজেই, হোটেল থেকে সোজা গিয়ে ওদের ওখানে উঠলো সে, লুকিয়ে রইলো।'

পরিচালকের মুখেও হাসি ফুটলো। 'তিন-আঙুলে নিশ্চয়, কল্পনাও করেনি রাতারাতি জিপসি মহিলা হয়ে যাবে যাদুকর। শেরিনা কি ডেটলার হয়েছে আবার?'

'হ্যাঁ। তিন-আঙুলে আর তার দুই সঙ্গীকে ধরে পুলিসে জেলে ঢোকানোর পর।'

'তোমরা ট্রাঙ্কটা কেনার পর এক বৃদ্ধা মহিলা তোমাদের কাছ থেকে ওটা নিতে চেয়েছিলো। তাহলে কি...'

'হ্যাঁ, স্যার। ডেটলারই। বৃদ্ধা সেজে গিয়েছিলো। খোঁজ খবর রেখেছিলো। যেই শুনলো তার ট্রাঙ্কটা নীলামে উঠছে, ছুটে গিয়েছিলো। তবে দেরি করে ফেলেছিলো কিছুটা।'

'তাতে বরং লাভই হয়েছে ওর, তোমাদের সাহায্য পেয়েছে। আচ্ছা রিপোর্টারকে দেখে পালিয়েছিলো কেন? বিজ্ঞাপনের ভয়ে?'

'হ্যাঁ। তার ছবি যদি ছাপা হয়, আর কোনোভাবে চিনে ফেলে তিন-আঙুলে...যদিও ভয়টা ছিলো অমূলক। বৃদ্ধার ছবি দেখে তাকে ডেটলার বলে কোনোদিনই চিনতে পারতো না ড্রেক। খবরের কাগজে সংবাদটা পড়ে ট্রাঙ্কটা চুরি করতে এলো ওর দুই সঙ্গী, ইয়ার্ডে। পারলো না। তারপর হ্যামলিনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো। কিন্তু রাখতে পারলো না। জিপসিরা পেছনেই ছিলো। ওরা আবার ছিনিয়ে নিলো। চোরের ওপর বাটপারি।'

'তারপর ডেটলার তোমাদের নামে পাঠিয়ে দিলো,' বললেন পরিচালক। নিশ্চয় কোনোভাবে জেনেছিলো, তোমরা ভালো গোয়েন্দা। এরকম অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করেছো। চিঠি-রহস্যের সমাধানও নিশ্চয় করতে পারবে। ভুল করেনি সে। তার আইডিয়া ঠিকই ছিলো।' আনমনে টেবিলে আঙুল দিয়ে টাট্টু বাজালেন একবার পরিচালক। 'এখন আসল প্রশ্নটা। সক্রেটিস। কিভাবে কথা বলানো হয় ওকে দিয়ে?'

'ডেটলার খুব ভালো ভেনট্রিলোকুইস্ট। শুরুতে, ভেনট্রিলোকুইজমের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নিতো। পরে, লোকের সন্দেহ দেখা দিলো। নতুন কিছুর চিন্তাভাবনা করতে লাগলো যাদুকর। শেষে খুব ছোট একটা ওয়্যারলেস সেট কিনলো, আজকাল তো ওসবের অভাব নেই...'

'এবং ওটা বসিয়ে নিলো খুলির ভেতরে?'

'না, স্যার, খুলির ভেতরে নয়। চালাকিটা করেছেই ওখানে। ওটাকে ভরেছে হাতির দাঁতের স্ট্যাণ্ডের ভেতরে। লোকে চ্যালেঞ্জ করলে খুলিটা তাদের হাতে তুলে

দিতো। কিছুই পাওয়া যেতো না ওটার ভেতর। কেউ ভাবেইনি চালাকিটা করা হয়েছে স্ট্যাণ্ডের মধ্যে...'

'তুমিও ভাবোনি।'

'না, আমিও ভাবিনি। ডেটলার বলার পর বুঝলাম। ট্রান্সমিটারটা ভয়েস-অপারেটেড। তারমানে, আমরা যখন ট্রাঙ্ক থেকে বের করে সক্রেটিসকে স্ট্যাণ্ডে বসালাম, যা যা কথা বলেছিলাম, সব ট্রান্সমিট হয়ে যাচ্ছিলো। ওটার রেঞ্জ পাঁচশো গজ।

'ইয়ার্ডের কাছেই মহিলা সেজে গাড়িতে বসেছিলো ডেটলার। আমরা যা বলছিলাম, রিসিভারের সাহায্যে সব শুনতে পাচ্ছিলো। হাঁচিটা ইচ্ছে করে দেয়নি, হঠাৎ এসে গিয়েছিলো।

'রাত্রে, গাড়িতে বসেই কথা বলেছে। আমার ঘরে আমার কাছে মেসেজ ট্রান্সমিট করেছে। চোখ রাখছিলো। যখন দেখলো আমি আলো নিভিয়ে দিয়েছি, অন্ধকারে শুরু করলো তার ম্যাজিক। আমি তো ভাবলাম, সক্রেটিসই কথা বলেছে।

'পরদিন, চাচী আমার ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিলো। জানালা দিয়ে মুখ বের করেছিলো একবার, সেটা দেখে ফেলেছিলো ডেটলার। চাচীর সংগে রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারেনি।'

'তোমার চাচী আবার শোনেননি তো সেকথা?'

'মাথা খারাপ। তাকে কি আর বলি? তাহলে আরেকবার গায়েব হতে হবে ডেটলারকে। ঝাঁটা হাতে গিয়ে তার বাড়িতে উঠবে চাচী।'

হাসলেন পরিচালক। 'যাক, আরেকটা জটিল রহস্যের সমাধান করলে। দেখি, গল্পটা দিয়ে টেলিভিশনের জন্যে একটা ছবি বানানো যায় কিনা।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তো, এরপর কি করবে? আর কোনো কেস আছে হাতে?'

'আপাতত নেই, স্যার। চোখকান খোলা রাখবো। পেয়ে যাবো কিছু না কিছু। তেমন কিছুর খোঁজ পেলে আপনিও জানাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

বিদায় নিয়ে উঠলো ছেলেরা। এগোলো দরজার দিকে।

পেছন থেকে তাকিয়ে রইলেন পরিচালক। ভাবছেন, ইস্, একলাফে যদি অনেকগুলো বছর কমে যেতো তাঁর বয়েস! আবার কিশোর হয়ে যেতেন, মিশে যেতে পারতেন ওদের দলে! কিন্তু তা তো আর হবার নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনে নিলেন আরেকটা জরুরী ফাইল।

—ঃশেষঃ—